

জ্যোত্তর মাসকারেণহাস

প্রণীত

ত্রেতে অব বাংলাদেশ

দ্বা মিষ্টিপ অব বাংলাদেশ

● জ্যোত্তর মাসকারেণহাস ক্লি



প্রকাশক

মোঃ সিরাজুল্লাহ ইসলাম

পপুলার পাবলিশার্স

২০ প্যারাডিস রোড (বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০, ফোন : ৯১১৫৯২১

প্রথম বাংলা সংক্রণ : জন, ১৯৮৯

দ্বিতীয় সংক্রণ : জানুয়ারি, ১৯৯০

তৃতীয় সংক্রণ : সাধীনতার রাজত জয়ত্বী, ১৯৯৬

পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০০২

চতুর্থ সংক্রণ : ভাষা ও শহীদ দিবস, ২০০৫

পঞ্চম সংক্রণ : জুলাই, ২০১০

এন্ট্রান্স

প্রকাশক

প্রচ্ছদ

কাজী হাসান হাবিব

বর্ণ বিন্যাস

কসমোপল কম্পিউটারস, ৮ হাটিখোলা রোড (২য় তলা), ঢাকা-১২০৩

**মুদ্রণে : ডেট প্রিন্টার্স**

১০ শুক্লাল দাস লেন, কাগজীটোলা

(মুজিবনগর) ঢাকা-১১০০

ফোনাইল : ০১৭১২-০৯০৮০৮

পরিবেশক

পরমা, হাঙ্গানী পাবলিশার্স

গমতাজ প্লাজা, বাড়ি নং— ৭, সড়ক নং— ৪

ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫. ফোন : ৯৬৬১১৪১-৩

**মূল্য : ১৪৫.০০ টাকা**

---

The Rape of Bangladesh. (A Bengali translation of Anthony Mascarenhas's The Rape of Bangladesh) by R. N. Trivedi (Ranatri), Former PRO, Government of Bangladesh, Mujibnagar. Published by Md. Serajul Islam, Popular Publishers, 20 Pyaridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100. Printed by Hakkani Printing & Packaging, 10, Suklat das Lane, Dhaka-100. 5th Edition : July 2010 Price : 145.00 Taka

**ISBN : 984-8548-06-9**

# দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ

## THE RAPE OF BANGLADESH

জনেক বীর মুক্তিযোদ্ধাকে  
ওভেচ্ছান্তে  
ভবদীয়  
টনী মাসকারেণহাস  
লডন, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

To : A Gallant F. F.  
With all good wishes  
Sincerely  
Tony Mascarenhas  
London. 17-9-85

### বক্তব্য

অ্যাঞ্চনী মাসকারেণহাসের একটি 'দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ' মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তাঁর সাংবাদিক জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা। এ অযূল একটি দিয়েই লেখক বিখ্য বিবেকের কাছে সত্য ও মানবতার জয়গান, সে সঙ্গে পাকিস্তান উপনিবেশিক খাসনের নিষ্পেষণ, শোষণ ও বর্ধনার ইতিহাসকে মৃত্ত করে রেখেছেন।

এই গ্রন্থে উৎপাদিত অনেক তথ্যের সঙ্গে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। তবুও সে সময়ের মাপকাঠিতে তাঁর সাহসিকতা ও অকপট প্রতিবেদনের জন্য প্রতিটি বাস্তালী হৃদয়ে তিনি উজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

বইটি অক্টোবর ১৯৭১-এ প্রকাশিত হয় এবং বইটির শেষ পংক্তিতে তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন, "আমরা সবেয়াত্র একটি নতুন অক্কারের রাজ্য প্রবেশ করেছি। অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ পথের শেষ প্রান্তে যেখানে আলোর রাজ্যের ওরা, সেখানে পৌছতে আমাদের দীর্ঘ সময় লাগবে।" সময় লেগেছে ঠিকই। যাত্র দেড় মাস পর ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধারা রক্তের সাগর পাড়ি দিয়ে স্বাধীনতার রক্ষিম সূর্যকে ছিনিয়ে আনেন। ইতিহাস রোম্হনে স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের একটি অধ্যায় জ্ঞানের সুযোগ এনে দেবে ভেবে সহজ ও সরল বাংলায় 'দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ' পাঠকদের হাতে অর্পণ করলাম। স্বাধীনতার রজত জয়ত্বাতে বইটির তৃতীয় সংস্করণ এবং ভাষা ও শহীদ দিবসে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই।

জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা-১১০০  
২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ইং

ধন্যবাদাত্তে  
রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরাণী (রনাত্তি)

## মুখ্যবন্ধ

১৪ই এপ্রিল ১৯৭১। পাকিস্তান সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের আমত্রণে পাকিস্তানী ক'জন সাংবাদিক ও আলোকচিত্র শিল্পীসহ আমিও ঢাকায় গিয়েছিলাম। পূর্ব-বাংলা 'স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে এ বিষয়ে সংবাদ সঞ্চাহ ও প্রচার করা ছিল আমাদের কাজ বা এ্যাসাইনমেন্ট।' ঢাকার রাস্তাঘাট জনশূন্য, বিশাল এলাকা জুড়ে আগনে পেড়ানোর চিহ্ন, দোকানপাট বৰু, গোলার গর্ডের চিহ্ন, বুলেটের দাগ, ঘন কালো ধূয়ার কুকুলী তখনও উপরে উঠছে, বাতাস ভারাক্রান্ত। যাহোক, এসবই ধ্বনিসের ঘটনা আপনা-আপনিই কথা বলছে, যে ঢাকা নগরীকে সজীব ও বন্ধ-বাসস্লোর জন্যে এতদিন জেনে এসেছি এবং ভাসবেসেছিলাম, সে ঢাকা যেন আজ করুণ হাস্যকর অনুকরণের নগরী। আমার অনেক বন্ধুকে আমি খুঁজে পেলাম না। কেউ চিরকালের মত হারিয়ে গেছেন। অন্যেরা, আমাকে যা বলা হয়েছে 'পালিয়ে গেছেন।' অনেক বিপদের মধ্যে ঝোঝাখুঁজি করে একজনকে পেলাম। তিনি নিরাবেগ কঢ়ে বললেন, 'কেন এসেছেন?' আমি বিড়বিড় করে একটা ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করছিলাম, তিনি মতব্য সংক্ষিপ্ত করে বললেন, 'যে পাকিস্তানকে আপনি ও আমি জেনেছি তার কোন অস্তিত্ব নেই। সেভাবেই আমাদের মেনে নেয়া ভাল।' তারপর তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন।

তার পরের দশ দিন ঘোলতয় পাকিস্তান আর্মি ডিভিশনের সদর দফতর কুমিল্লায় এবং পূর্ব-বাংলার অন্যান্য স্থানে সফর করেছি। তখন আমি অবস্থিতির অবস্থায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর নারকীয় গণহত্যা সংঘটনের গা কাঁপানো রূপ দেখেছি। যদিও আমার সহকর্মীরা পরবর্তীকালে অঙ্গীকার করেছেন, তবু আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে বলতে পারি, আমরা যা দেখেছি তাতে আমরা সকলেই শিউরে উঠেছিলাম। আমিই শুধু এটা মেনে নিতে পারিনি। পূর্ব-বাংলায় আমি যা দেখেছি, হিটলার বা নাসীদের অমানবিক অত্যাচারের কথা যা পড়েছি, তার চেয়েও ভয়াবহ মনে হয়েছে, আর সেই অত্যাচার আমার দেশের লোকের উপরে ঘটছে। আমি জানতাম, পূর্ব-বাংলার এ দুর্বিষহ যত্নার কথা আমাকে বিশ্ববাসীর কাছে বলতেই হবে। তা'না হলে সারা জীবন এ মানসিক যত্নার বোৰা অপনাধীন যত আমাকে বইতে হবে।

এই দৃঢ় চেতনা নিয়ে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমি লন্ডনে পৌছলাম এবং 'সানডে টাইমসের' কাছে এ খবর জমা দিলাম। এতে আমার কিছু ভয় বা চাক্ষল্যের সৃষ্টি হয়নি, তা নয়। বহু বছর সাংবাদিকতা করেও আমি জানতাম না যে আমার মত একজন বহিরাগত, বিশ্বের বৃহত্তম সংবাদ নিয়ে অনিচ্ছ্যতার মধ্যে ফ্লিট-স্ট্রীটের দরজায় কড়া নাড়তে পারে। 'সানডে টাইমস'-এ তা'হল না। টমসন হাউজে অথব প্রবেশের চাহিশ গিনিটের মধ্যে তাঁরা আমার কথা শুনলেন, এহণ করলেন। আমি পাকিস্তানে ফিরে আমার স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে আসার জন্যে তৈরি হলাম।

একটি বিরাট সংবাদপত্রের মহান সম্পাদক হ্যারল্ড ইভানস এবং 'সানডে টাইমস'- এর বৈদেশিক বিভাগের অন্যান্য সাংবাদিক যেমন- ফ্রাঙ্কগিলম, নিকোলাস ক্যারল, ডোনাল্ড ম্যাককর্মিক এবং গডফ্রে ইজসেনের সাংবাদিকসূলভ অনুভূতি এবং যোগ্যতা সম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণার কথা ভাষায় প্রকাশ করা দুর্ভাগ্য। ১৩ই জুন ১৯৭১ তারিখে 'সানডে টাইমস' পাকিস্তানের গণহত্যার সকল ঘটনা প্রকাশের পর বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে।

এই বইটি, এই প্রতিবেদনেরই যুক্তিসংগত অনুসিদ্ধান্ত। বাংলাদেশের নাটকীয় ঘটনা বলতে গিয়ে আমি পুরুষানুপুরুষরূপে সকল নৃশংসতার বিশদ আলোচনা করিনি। কতিপয় ভুল ধারণা সংশোধনের জন্যে সেগুলো উত্থাপন করেছি, কেননা সেগুলো সকলের কাছেই সুবিদিত। আমি আন্তর্জাতিক শক্তিসমূহ এবং এই অঞ্চলে তাদের স্বার্থের কথা মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করিনি, কারণ ব্যক্তিগতভাবে এই এলাকা সফরের পরেই তা করতে চাই। আমি যা'করতে সচেষ্ট হয়েছি তাইল এ ভয়াবহ ঘটনাগুলোর যে রাজনৈতিক পটভূমি রয়েছে তার একটি রূপরেখা তুলে ধরা এবং আমাদের প্রজন্মের সম্ভবত: মানবজাতির সবচেয়ে' বিয়োগান্ত ঘটনার প্রধান চরিত্রগুলোর অভিসন্ধির ব্যাখ্যা দেয়া। আমি এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই করেছি।

আমি এই ঘটনাগুলো সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানি, কেননা আমি আমার জীবনের মূল্যবান সময়টা এন্দের সঙ্গেই কাটিয়েছি। এসবের জন্যে তাঁদের কাছ থেকে আমাকে অনেক নিন্দা ও দুর্নাম সইতে হয়েছে। যাঁরা আমার কাছে একদিন খুব কাছের মানুষ ছিলেন এবং করাচী, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডিতে আমি যাঁদের কাছে পরিচিত ছিলাম, তাঁদের সকলেই আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলেছে ও বিশ্বী গালি দিয়েছে।

আমি আমার শেষ বিচারের ভার ইঁশুরের হাতে ছেড়ে দিয়েছি। আমি যা করেছি যতটুকুই আমার দ্বারা করা সম্ভব ছিল।

পরিশেষে, আমি ব্যক্তিগতভাবে গডফ্রে ইজসন এবং আলম্যায়ারের ডি'স্যুজাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, যাঁরা তাঁদের নিজেদের অনুকরণীয় পদ্ধতি দেখিয়ে আমার নতুন পরিবেশের জীবনকে সহনীয় করতে সহায়তা করেছেন। আরও ধন্যবাদ জানাই আমার ত্রুটী যুভন ও বাচ্চাদের যারা দুর্দিনে আমার সঙ্গে থেকে সব মানিয়ে নিয়েছে।

## প্রকাশকের বক্তব্য

১৯৮৫ সালে বিলেতে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে থাকাকালীন সময়ে অ্যাহুনী  
মাসকারেণহাসের সঙ্গে পরিচিত হই। পরবর্তীকালে তাঁর লেখা সব গ্রন্থগুলোর বিপণন  
ও বিতরণের জন্য বাংলাদেশে আমার সঙ্গে তিনি চুক্তিবদ্ধ হন, এবং বঙ্গানুবাদ, বিপণন  
ও বিতরণের একক দায়িত্ব আমাকে প্রদান করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র  
করে তাঁর এ 'দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ' গ্রন্থটি ১৯৭১ সালে প্রকাশিত। মুক্তিযুদ্ধ  
চলাকালীন তাঁর সাংবাদিক জীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা। ইতিহাস রোমছনে স্বাধীনতা-উত্তর  
প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের একটি অধ্যায় জানার সুযোগ এনে দেবে ভেবে সহজ ও  
সরল বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ত্বিবেদী (রনাত্রি) অনুদিত 'দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ' চতুর্থ  
সংস্করণ পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম।

চাকা

মিরাজুল ইসলাম

২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ইং

## সূচিপত্র

দুর্বিপাকের পূর্ববন্দ	১৫
হেতুর যৌক্তিকতা	২৭
দম্পের মূল হেতু	৩৩
আর্থনীতিক হেতু	৩৯
চরম বিশ্বাসঘাতকতা	৪৪
এক 'নব সৃচনা'	৫১
নির্বাচন-পূর্ব টালবাহানা	৫৯
নির্বাচনোভর অহসন	৭৫
সামরিক বাহিনীর অভিযান	৯৪
অবিস্মরণীয় পঁচিশ দিন	১০১
গণহত্যা	১২০
গোয়েবলসের পুনরাবৰ্ত্তাব	১২৯
কেন আশি লাখ লোক মারা যাবে	১৪৫
পরিশিষ্ট	১৪৯

## ছবি-শিরোনাম

১. বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
২. “এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম  
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম” — জয় বাংলা।  
— শেখ মুজিবুর রহমান (৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ)
৩. যে বিভীষিকা ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সে দেখেছে তা'তে স্মৃতির কুহরে  
তোলপাড় করা আতঙ্ক তাকে তাড়া করে ফিরছে— এই শরণার্থী সকলের  
কাছে প্রাণভিক্ষা করছে—স্ফুর কর বিধাতা।
৪. মুক্তিবাহিনীর পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি।
৫. নবজাত শিশু কোলে লুটেরার হাত থেকে পরিত্রাণের পর প্রথম নিরাপদ  
নিদ্রা।
৬. আগরতলা শরণার্থী শিবির : ‘খাদ্যের সন্ধানে ত্রন্দনরত বাস্তুহারা শিশু’  
— সন্তান মোর মা’র।
৭. ইয়াহিয়ার শক্রতার শিকারদের গণকবর।  
— মহাকালের সাক্ষা
৮. পাকবাহিনী এ মহিলার স্বামীকে হত্যা করেছে। ত্রন্দনরত দেবৱ ও বিধবা।  
— ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য স্মৃতিপটে জাগরুক।
৯. একজন মুক্তিযোদ্ধা।
১০. পাকবাহিনীর হত্যাকান্ডের দৃশ্যাবলী।
১১. পাক হানাদার বাহিনীর বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত দালান কোঠা।
১২. রাজাকার, আলবদর বাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকান্ডের দৃশ্য।
১৩. ১৯৭১-এর গণহত্যা।
১৪. ইয়াহিয়ার ঝাড়ের চোখ।
১৫. ৯ মাস যুদ্ধের সময় শাখারী বাজার এলাকার নিত্য দিনের দৃশ্য।
১৬. পাক হানাদার বাহিনীর ধ্বংসলীলা।

## দুর্বিপাকের পূর্বরঞ্জ

২৫শে মার্চ বৃহস্পতিবার। বিকেল প্রায় পাঁচটা। ১৯৭১ সাল। ঢাকা বিমান বন্দরের রাস্তায় বাবলা ও অশ্বথ গাছের বিকেলের ছায়া দীর্ঘতর হতে শুরু করেছে। সে সময়েই নম্বরবিহীন কালো মার্সিডিস গাড়ী প্রেসিডেন্টের নিশান উড়িয়ে সেনাবাহিনীর গার্ডের কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে বরফিস্টাইলের ডিআইপি টারমিনাল ভবনের বিপরীতে শান শওকতসহ এসে দাঁড়াল।

বিশ গজ দূরে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক এয়ারলাইপের একটি বিশেষ ফ্লাইট, আকাশ পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। এই সাদা ও সবুজ বর্ণের বোয়িংটিতে পৃষ্ঠ জ্বালানী নেয়া হয়েছে। যাত্রাপথ ছ'হাজার মাইল। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র বুক ধরে শ্রীলংকায় উত্তরণ করে, তারপর পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবেশ পথ করাটা। বাছাই করা বৈমানিক শক্ত হাতে বিমানের প্রবেশ পথে স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাদের জন্য অনুগ্রহীত এই অনুষ্ঠানে- সকলকেই অস্বাভাবিক বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। যে ক'জন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার প্রেসিডেন্টকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন, তাদের গাড়ীর্যে ছিল দুর্চিত্তার স্পষ্ট ছাপ। চারিদিকে দুর্চিত্তার তড়িৎ-চাবুক বলসে উঠেছিল। মৌসুমী কংক্ষবাতাস ও গুমোট আবহাওয়া তাতে আরো তৈরি উভেজনায় প্রকাশ পেয়েছে। পাশে দাঁড়ানো এক অনুগ্রহীত ঝোঁজালো কঠে বলেই উঠলো, ‘এটাকে ছুরি চালিয়ে টুকরো টুকরো করতে পারেন।’

সেই ভয়াল দিনে ঢাকা বিমান বন্দরকে ইউরোপীয় মিত্রবাহিনীর একটি সুরক্ষিত আগুয়ান বিমান ঘাঁটির মতো দেখাচ্ছিল। পর্যটন বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সাড়ে সাত কোটি বাসালী অধ্যুষিত প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা নগরী। কিন্তু জনতার দৃষ্টির বাইরে আজ বিমান ঘাঁটি। কোন বাসালীর মুখ দেখা যায়নি, পক্ষতরে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি সর্বত্র। সমস্ত বিমান বন্দরটি ওরা ছেয়ে রেখেছে। বিমান বন্দরের চারপাশের চতুরে সামরিক সেন্ট্রিগুলো বন্দুকের নল উচিয়ে দর্শকদের হাটিয়ে দিয়েছে। প্রান্তের পীচালা পথে ইত্তেক: বালির বস্তার আন্তর্নায় চোয়াল আঁটা জোয়ানগুলো যুদ্ধের পোশাকে মেশিনগান তাক করে রয়েছে। পিছনে বিমান বিখ্রংসী বাহিনীর কামানের ত্রুণুলো বিশেষ পেশাদারী ভঙ্গীতে বসে রয়েছে।

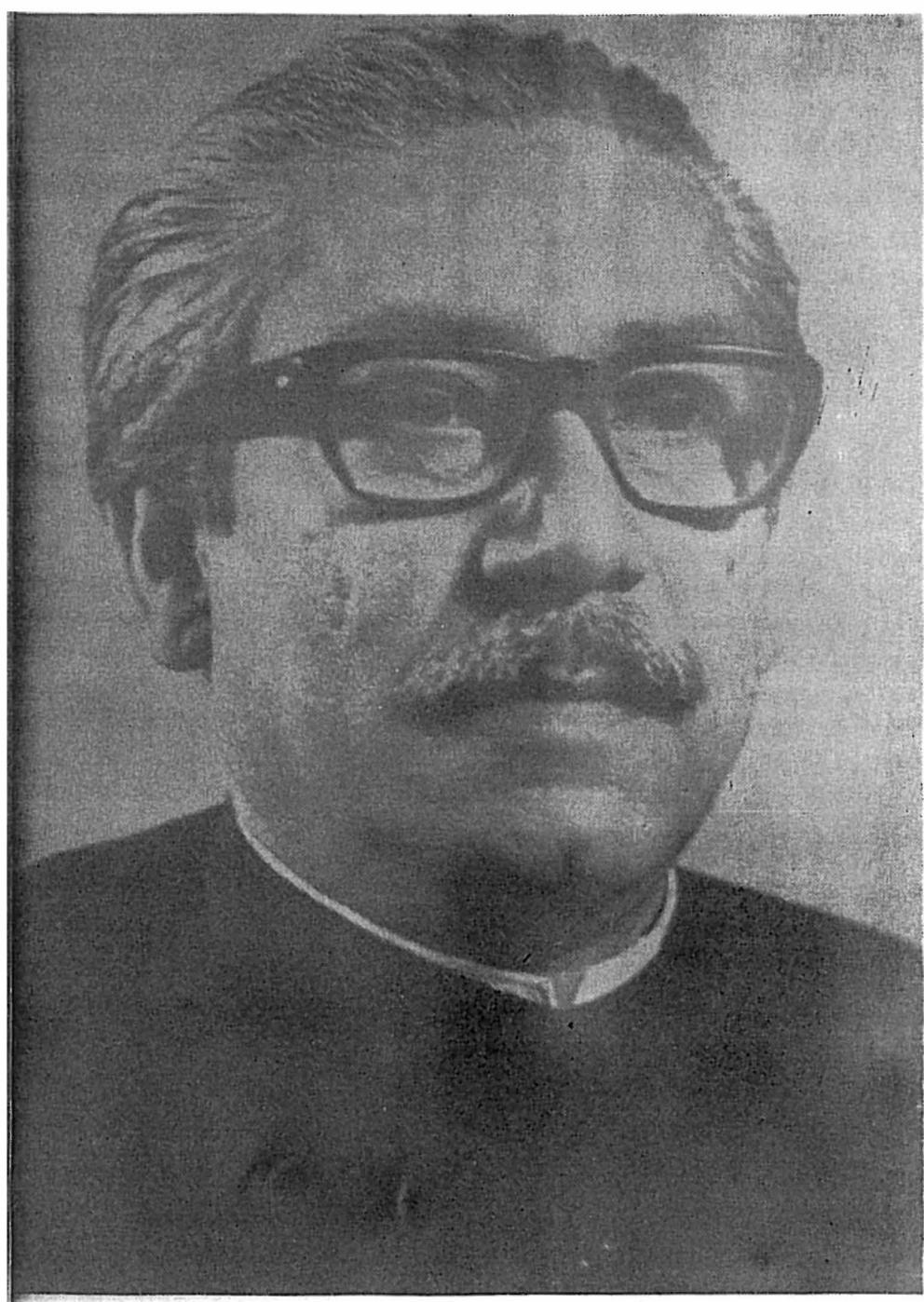
মনে হচ্ছিল পঞ্চম পাকিস্তানী সৈনিকগুলো যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। সেদিনের বিমান বন্দরে অনুপ্রবেশকারী ছিল না, শুধু বিকেলের পড়ত বেলায় একমাত্র বাঁক বাঁক বাদামী ও সোনালী ডাঁশ মাছি অলসভাবে উড়তে দেখা গিয়েছিল।

বিমান বন্দরের উৎকঠাপূর্ণ আবহাওয়া, ক্রমান্বয়ে লাউঞ্জ থেকে হলঘরেও সংক্রমিত হয়ে গেল। ভবনের অভ্যন্তরে দু'হাজার নারী-পুরুষ, শিশু— যাদের বেশীর ভাগই ছিল যেমন সম্প্রদায়ভুক্ত অন্যান্যরা পাঠান। আসন্ন বিপদের ভয়ে বাসায় পরা পোশাকেই পালাচ্ছে। অনেকেই অবিস্মিতভাবে রাত কাটাচ্ছে এখানে। বিছানাপত্র ও মানবদেহের অবস্থার অবিস্মিততার বেশ নোংরা হয়েছে বিমান বন্দর। একটা অশ্বস্তিতে তারা রয়েছে, তা বেশ বোৰা যাচ্ছে। আতংক ছাড়াও খাদ্য ও পানীয় জলের সরবরাহ ছিল অপ্রতুল।

প্রেসিডেন্টের আগমনের আগে হলের মধ্যে কান ঝাজালো হৈ তৈ চলছিল। হাত ভর্তি টাকা নিয়ে অসং্ঘত বিমান অফিসারদের সঙ্গে দরবকৰাকষি, ঘৃষ দিয়ে বিমানের আসনের পারামিট বাগানের বাস্তু নিয়ে লোকগুলো বাস্ত হয়ে উঠেছিল। তবে তাদের প্রচেষ্টা বিফল হয়নি। এখন উচ্চ কঠে ফিসফিস আওয়াজ। বিমানের বেশ ক'জন কয়ী জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা সহকর্মীর সঙ্গে যোগ দিল। বাইরে তাকিয়ে দেখলেন— প্রেসিডেন্টের বিদায় যাত্রা। যারা সেদিন প্রেসিডেন্টের বিদায় যাত্রা দেখেছেন তারা সেই বিদায়ী-লগ্নকে কখনো ভুলবেন না। অন্য আর সবদিক থেকে এ লগ্নটি ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসের মোড় ফেরার লগ্ন। দশ দিন আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় এসেছিলেন ফুরফুরে হালকা মেজাজ নিয়ে, এখন সেখানে গভীর হতাশা। মেজাজে মলিনতার কালো ছায়া, সে ছায়া সর্বত্র, সকলের মুখে সংক্রমিত হয়েছে।

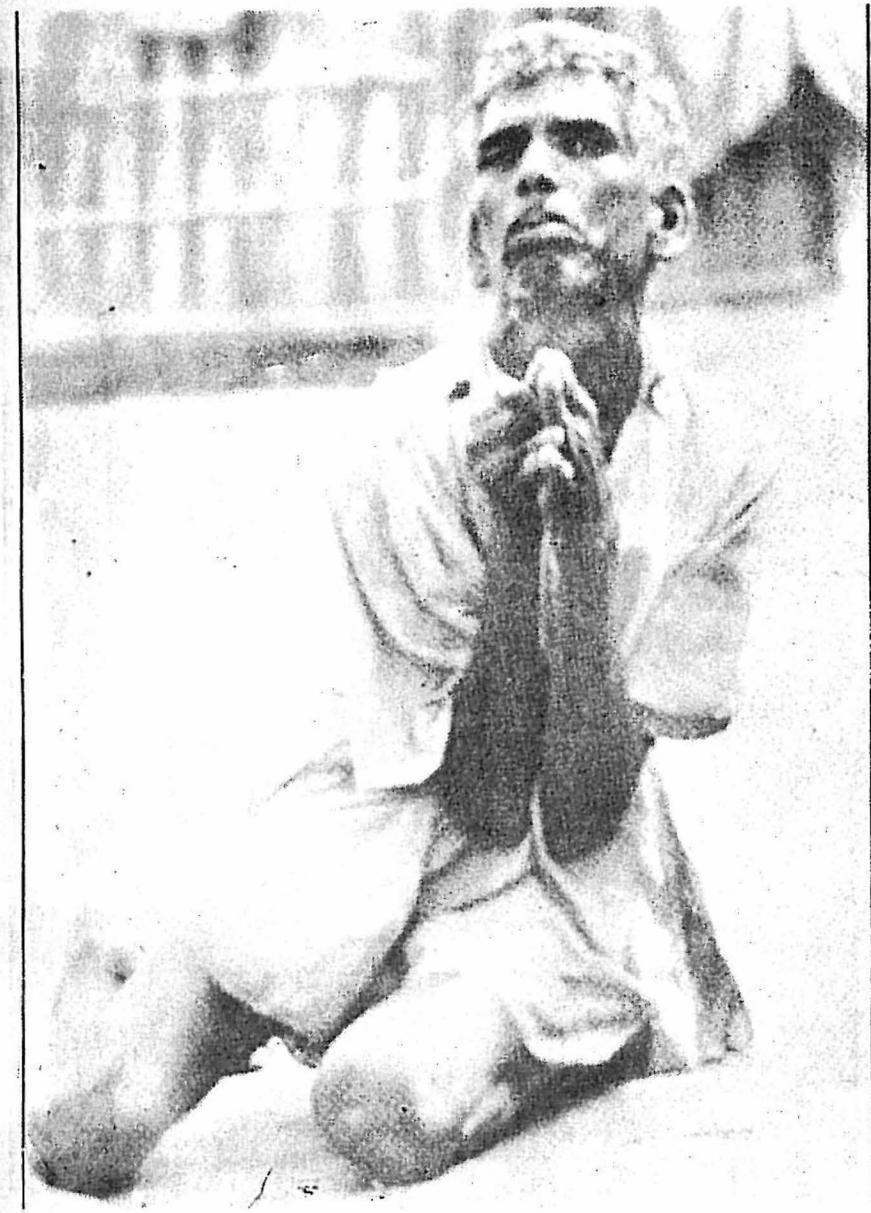
আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আজ আর অফিসারদের সময় নষ্ট করতে চাননি। তারা তো এখন যুদ্ধের ময়দানে। সত্যিকার অর্থে, সামরিক কায়দায় তিনি বিদায় অভিবাদন সংক্ষিপ্ত করলেন। তাছাড়া এক মাইল দূরে ইস্টার্ণ কমান্ড হেডকোয়ার্টারের কলফারেস রয়ে আট ঘন্টার দীর্ঘ বির্বতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আলোচনা শেষ করে এসেছেন। সেজন্য সামরিক শুভেচ্ছা বিনিময় হ'ল সীমিত ক'জনের সংগে। দু'জন উর্ধ্বতন সামরিক কর্ণধারের সঙ্গে একটু ফিসফিস; নীচু স্বরে কথা হল। ফ্যাশান দুর্বল সামরিক সালাম বিনিময় হল। এবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে বিমানের প্রবেশ পথে উঠলেন এবং নির্দিষ্ট আসনে বসলেন।

উড়ীয়মান বিমানে পি আই এর আভিথেয়তার সুনাম রয়েছে। আর সেদিনের বিমানের আয়োজন ছিল অতুলনীয়। বিমানের দরজা বন্ধ হতে না হতেই একজন বিমানবালা বিমান উড়বার রীতি উপেক্ষা করে কচ ও সোডাসহ প্লাস সাজিয়ে





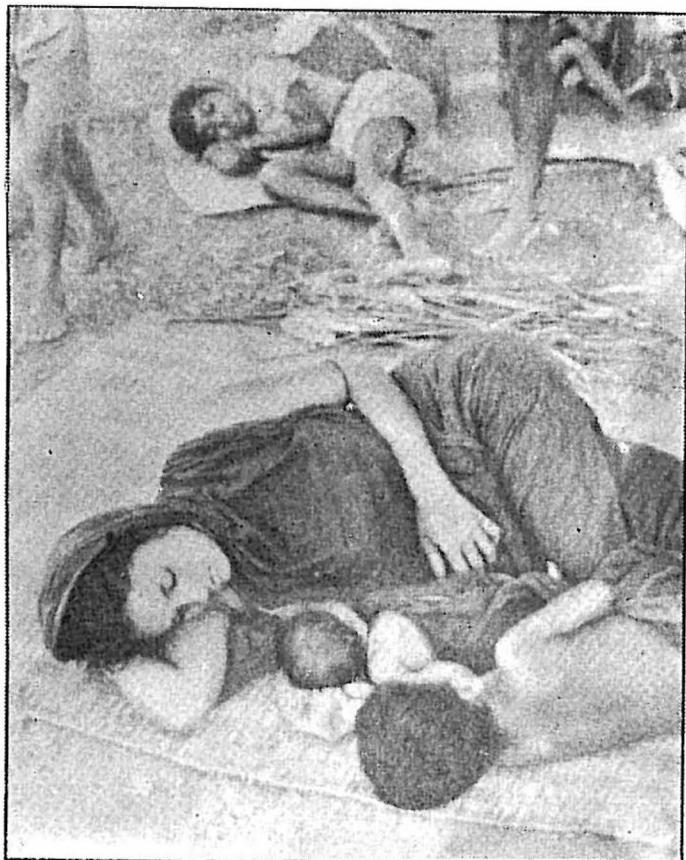
“এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম  
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম” জয় বাংলা’।  
—শেখ মুজিবুর রহমান



যে বিভীষিকা ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সে দেখেছে তাঁতে শৃতির কুহরে তোলপার  
করা আতঙ্ক তাকে তাড়া করে ফিরাছে—এই শরণার্থী সকলের কাছে প্রাণভিক্ষা  
করাচ—ফল্যা কর রিধানা।



মুক্তি বাহিনীর পাস্টা আক্রমণের প্রস্তুতি



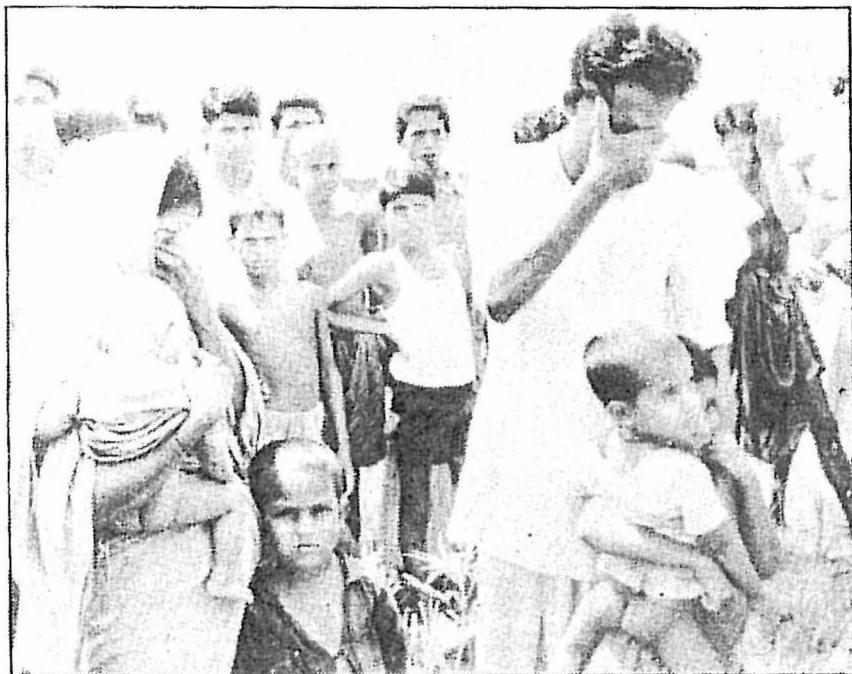
নবজাত শিখকোলে লুটেরার হাত থেকে পরিত্রাণের পর প্রথম নিরাপদ নিম্না ।



আগরতলা শরণার্থী শিবিরে : ‘খাদ্যের সঞ্চালন ক্রমনৰত বাস্তুহারা শিশু—,  
‘সন্তান মোর মা’র।’



ইয়াহিয়ার শক্তির শিকারদের গণকবর  
—মহাকালের সাক্ষী।



পাকবাহিনী এ মহিলার স্বামীকে হত্যা করেছে। ক্রন্দনবত দেবর ও বিধবা।  
ড্যাবহ বীভৎস দৃশ্য স্মৃতিপটে জাগক্রিক।

মান্যবর মেহমানের দিকে এগিয়ে গেলো। ফেনায়িত গ্লাস ওচে স্পর্শ করলেন মেহমান। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে তিনি অনুরূপ গ্লাস গ্রহণ করতে থাকলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভয়াবহ আসন্ন পরীক্ষা উভীর্ণ হ'তে এ ধরনের প্রত্যক্ষ স্বাভাবিক। তিনি তো হাতের ঘুঁটি চেলে এসেছেন। সিজার ততক্ষণে রাইবিকন অতিক্রম করছেন। দু'বছর আগে এমনি দিনে স্যাম্প্যান শরাবে তাঁকে প্রস্তুত রেখেছিল।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ। পাকিস্তানের বিধিলিপিতে আরো একটি দিনের সংযোজন। এদিনটি জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের সর্বাধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হবার উৎসবের দিন। বয়োবৃন্দ অসুস্থ ফিন্ড মার্শাল আইয়ুব খান অনিষ্টচ্যাতায় ধ্বংসের মুখে। তাঁর দশ বছরের 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র' গণতন্ত্রের স্নাতকোত্তর হলে; তাঁকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। সে সময়টা ছিল সরকারী অস্বাভাবিক ও বড় বড় রচনাশৈলী ব্যবস্থার সৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের শাসন। তখনকার মতো এই পরিস্থিতিই ছিল দেশের ইতিহাসে জানামতে সংকটজনক ঘটনা। অনন্যোপায় হয়ে আইয়ুব খান ক্ষমতার উৎস ও বিচারের শেষ আশ্রয়স্থল সামরিক বাহিনীর কাছে আবেদন জানালেন। সেনাবাহিনী যদিও এই ক্ষমতা সুসংহত করার বিষয়ে অবগত, তবু আইয়ুবের ব্যর্থতায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। সূতরাং বয়োবৃন্দ ফিন্ড মার্শাল আইয়ুব অপসারিত হলেন। প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতার আসনে এসে বসলেন। পাকিস্তানের সামরিক শৃংখলে নতুন কড়া দৃঢ়ভাবে সংযোজিত হল।

যে সব মৌলিক সমস্যা জাতীয় ঐক্যে চিঠি ধরিয়েছিল, এই নতুন সামরিক শাসনের অধ্যায়ে সে সবের কোন সমাধান দিতে সমর্থ হ্যানি। তবে উক্তেজনা প্রশংসনে তা সামরিক সহায়তা করেছিল। সেই সংকটকালে জেনারেল ইয়াহিয়া বেশ সাহস ও দৃঢ়তর পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর সামরিক দণ্ডের তরাঙাঘাতে এতটুকু ভাবা গিয়েছিল যে, তিনি বিশুরু খরস্ত্রোতকে সে সময়ের জন্য হলেও অনুকূলে আনতে পেরেছিলেন।

যা হোক, খেলার নামে ক্ষমতার রাজনীতির অবস্থিতি রয়েই গেল। তেইশ বছরের শোষণ ও হতাশা জনতাকে আরো গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের আন্দোলনে সোচ্চার করে ভুলেছিল। অন্যদিকে সামরিক বাহিনী যদিও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে বিবেচিত হয়, তবু বিগত বার বছর তারা যে ক্ষমতার অঙ্গীকার ও সিদ্ধান্ত নেবার যে অধিকার উপভোগ করে এসেছে তা ছাড়তে সত্যিকার অর্থে কোন ইচ্ছে তাদের নেই। অতএব নতুনভাবে সমস্যা গোজিয়ে উঠতে থাকে। দু'বছর রাজনীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবার পর চাকা ঘূর্ণন শেষ হল। রাজনৈতিক অগ্রুদগার পুনর্জাগরিত হল। তবে এবারের ভুল সংশোধনের বাইরে চলে গেল।

এমন বেদনাঘন পরিস্থিতিতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ত্রিশ হাজার ফুট

উর্ধ্বাকাশের উড়তিগথে তার দ্বিতীয় ক্ষমতা দখলের অভিষেক উদয়াপনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এই নিরানন্দ নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতায় স্যাক্সেন শরাবের চেয়ে ছইক্ষি তাঁকে আঘানিমগু করলো। গত পাঁচ সপ্তাহে তিনি যে চাতুরীপূর্ণ খেলা খেলেছেন, সেজন্য তিনি মনে মনে অবিশ্য সাম্ভুনা পেয়ে থাকবেন। তিনি ঘৃণা করেন রাজনীতিবিদদের অথচ তাঁদের সঙ্গে বিরামহীন রাজনীতির প্রসঙ্গ নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বৈঠক করে চলেছেন। তিনি জানতেন, বৈঠকের ব্যর্থতা কোন ঘটনাই নয়, কেননা এ সব বৈঠক সাফল্যের জন্য অনুষ্ঠিত হয়নি। সামরিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এসবের প্রয়োজন ছিল। সর্বাঙ্গিক সামরিক আঘাত হানার জন্যেই এই কালক্ষেপণের প্রয়োজন ছিল। এখন সেই চরম সিদ্ধান্ত নেয়ার চরম দায়িত্ব তাঁরই হাতে অপিত।

ঘটনাটি শ্মরণ করে জনেক উর্ধ্বতন বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা বললেন, ইয়াহিয়া ভারতীয় বিমান বাহিনী দ্বারা বাধাওঁ বা ভারতে অবতরণ করার ঝুঁকি নিতে চাননি। সেটা হতো মারাঞ্জক। সুতরাং প্রেসিডেন্টের করাচী নিরাপদ পৌঁছাবার পরই পূর্বাঞ্চলে পরই পূর্বাঞ্চলে সামরিক এ্যাকশান নেবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

প্রেসিডেন্টের বিমান করাচী বিমান বন্দরে অবতরণের সংবাদ বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষের মহাপরিচালক ঢাকায় বেতারযোগে 'ফ্ল্যাস' সংবাদ পাঠালেন। ক্ষণকাল পরেই ইটার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারস্ থেকে ফরমান পাঠানো হ'ল 'SORT THEM OUT' বাছাই কর-ব্যতম কর বাংলাদের।' ঢাকা ও চট্টগ্রামের সামরিক বাহিনী, ট্যাঙ্ক ও ট্রাকসহ অভিযানে নেমে পড়লো। ধৰ্মসের তোপ গর্জে উঠলো। বাংলাদেশ নির্ধনযজ্ঞ শুরু হ'ল। গণহত্যা শুরু হ'ল।

## হেতুর ঘোষিকতা

‘পূর্ব পাকিস্তানের এত্যেকটি ন্যায়সম্মত দাবীর সামান্যটুকু পর্যন্ত তোমাদের নিকট  
থেকে অর্জন করতে হলে আমাদের বারবার প্রচুর ত্যাগ শীকার করতে হয়েছে  
এবং চরম মূল্য দিতে হয়েছে। এ যেন একটি বিদেশী শাসকবর্গের নিকট থেকে  
অধিকারের কর্মণা মাত্র ছিলিয়ে আন। এজন্য কখনো কি তোমাদের মুখ লজ্জায়  
নত হয়েছে? না হয় নি।’

শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের বাঁচার অধিকার, ঢাকা ফেডুন্ডারী, ১৯৬৬।’

শেখ মুজিবুর রহমানের বিখ্যাত ছয় দফা ঘোষণায় পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে  
বিরাজমান ২৪ বছরের উপনিবেশিক সম্পর্কের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তাঁর অগ্নিক্ষেপ  
বক্তব্যে উপস্থাপন করেছেন। মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এক বছর পর অর্থাৎ  
১৯৪৮ থেকে উপনিবেশিক ব্যবহার চলে আসছিল। তখন শেখ মুজিব ছিলেন  
অপরিচিত একজন ছাত্র। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের বর্বর পশ্চিম  
পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অত্যাচারই পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতাকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা  
করলো।

সে দৃঢ়থের কাহিনী বর্ণনা করতে কয়েক খণ্ড হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আমার সে  
প্রচেষ্টা নেবারও উদ্যোগ নেই। আমার কাহিনী শুধু সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পাকিস্তানে  
অসার জাজনেতিক ক্রিয়াকান্ডের প্রতিবেদন, যা ক্রমাবয়ে বিভীষিকাময় গণহত্যার  
পথে এগিয়ে যায়। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বিশ্ববাসীর কাছে ১৩ জ্ঞনের ‘দি সানডে  
টাইমস’ পত্রিকার মাধ্যমে সে ঘটনা তুলে ধরবার। এখানে যদি আমি পুরনো ঘটনার  
বর্ণনা দিয়ে থাকি তবে সেটা শুধু প্রাসঙ্গিক কারণে। সে ঘটনা অনেকেই জানেন না,  
কিংবা জেনে থাকলেও ভুলে গেছেন। নেহাঁ প্রয়োজনের ভাগিদেই সার-সংক্ষেপের  
উদ্ভৃতি দিয়েছি।

পূর্বে পাকিস্তানের বর্ণনা দিতে আমি ইচ্ছে করেই ইসলামাবাদ সরকারের প্রচলিত  
সংজ্ঞা ‘ইসলামিক রাষ্ট্র’ বা আদর্শিক রাষ্ট্র-এর পরিবর্তে ‘মুসলিম রাষ্ট্র’ শব্দটি ব্যবহার  
করেছি। ইসলামের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ নেই। বরং পাকিস্তানের দৈনিক  
পত্রিকাগুলোসহ আমি যে পত্রিকায় কাজ করেছি তাতে প্রতিদিন পবিত্র কোরানের

বাণী প্রকাশিত হত। আমি এসব বাণী পাঠে আনন্দ ও সান্ত্বনা পেয়েছি। গত তেইশ বছরের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ইসলামাবাদ সরকারের উন্নত সংজ্ঞার চেয়ে আগাম দেয়া সংজ্ঞার প্রতি আমি বিশ্বস্ত এবং পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে ছয় কোটি মুসলমানেরও এ মতই পোষণ করেন।

পাকিস্তানের সভিকার অর্থে একটি আদর্শিক ভিত্তি রাখেছে কিন্তু আদর্শিক রাষ্ট্র হিসেবে যা সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে তা হয়ে ওঠেনি। স্বীকার করতে হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকেরই উক্তি 'আমি প্রথমে মুসলমান, পরে পাকিস্তানী।' কিন্তু আমি দেখেছি এসব উক্তি শুধু সুবিধা আদায়ের আবেগ বস্তনিষ্ঠাহীন ব্যক্তির আদর্শিক আর্তি উপশেরের অবলম্বন মাত্র। 'ইসলামী ও পাকিস্তানী মতাদর্শ' অনুশীলন এ দুটির মাঝে শূন্যতা পূরণের ব্যর্থ প্রয়াস রয়েছে। জাতীয় সত্তা অঙ্গীকারের ঐ দুটো ব্যাপারেই কাজ করেছে। প্রথমত, পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বেদনাদায়ক আর্থগীতিক অসাম্যের পটভূমিতে ধর্মের পিছু হটা। দ্বিতীয়ত, পূর্বাঞ্চলের অমুসলিম জনগোষ্ঠী বিশেষত দেড় কোটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি মানসিকভাবে প্রত্যাখান এবং তাদেরকে অনিভুরযোগ্য ও অপাওড়েয়ে বিদেশীর ন্যায় ব্যবহার করা। পূর্ব বাংলায় বর্তমানে যে হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করার নৃশংস নিধনযজ্ঞের উৎস-সূত্র, সেই পাকিস্তানী ইসলামী অঙ্গত্বের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে।

পাকিস্তানের স্থপতি কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দেশের জনগণের মধ্যে জাতিসন্তোষে জাগরণে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের প্রাথমিক ঘোষণায় তিনি জনগণকে বলেছিলেন যে, মুসলিম, হিন্দু, খৃষ্টান এবং পার্শ্ব পরিচয় ভুলে শুধু 'পাকিস্তানী' পরিচয়ে তাদের ভাবতে হবে। এ কারণ সুবিদিত। উপমহাদেশের ভাগাভাগিতে ৪ কোটি মুসলমানকে, পাকিস্তানের জনসংখ্যার অর্ধেকাংশের সমান ভারতে রেখেই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলের অংশে পেয়েছে দেড়কোটি হিন্দুকে। সাম্প্রদায়িক রক্তক্ষয়ী হানাহানির মাধ্যমে ভারত উপ-মহাদেশ ভাগাভাগি হলে এ অবস্থাতে দুর্বিধর দুর্যোগ আরো তীব্র হয়ে উঠলো। আমরা আগে মুসলমান পরে পাকিস্তানী এ ধারণা পোষণ করার জন্য উভয় দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের পদমর্যাদা ও অবস্থা খর্ব হ'ল।

জিন্না সাহেব দীর্ঘদিন বাঁচেননি। তাঁর আদর্শানুসারীগণ তাঁর বিজ্ঞ দর্শনকে পাশ কাটিয়ে গেল। ক্ষমতা লাভের উচ্চাকাঞ্চকায় প্ররোচিত হয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জনগণের মনে স্থায়ী সাম্প্রদায়িক বিবাদে স্থান নিল।

স্পেন, পূর্তগাল এবং আইরীশ জনগণ যেমন ধর্মবিশ্বাসে ক্যাথলিক রাষ্ট্র, পাকিস্তানও অনুরূপভাবে একটি মুসলিম রাষ্ট্র। ব্রিটেন তেমনি প্রোটেস্ট্যান্ট। আজ পর্যন্ত পাকিস্তানী লিখিত সংবিধানে (ইসলামের প্রতি বুলি কপচানো ছাড়া) অথবা

দেশের আইন কানুনে কিংবা প্রশাসনিক কাঠামোতে বা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ইসলামী আদর্শিক অনুশাসনের কোন স্থায়ী রূপ প্রকাশ পায় নি। যদি এর বিপরীত সত্য না হবে, তবে কেন ভারত থেকে মুসলমানদের পাকিস্তানে আগমনের ব্যাপারটি বাধা দেয়া হয় (কেননা, পাকিস্তান, সেতো ভারতীয় মুসলমানদের আবাসভূমি হিসেবে জন্ম নিয়েছিল)। তাহ'লে পশ্চিম পাকিস্তানী মুসলিম সামরিক বাহিনীর পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের উপর নারকীয় অত্যাচারের ঘটনা বিশ্ববাসীকে প্রত্যক্ষ করতে হ'ত না।

এ প্রসংগে খুব বেশী দিনের কথা নয় জর্ডানে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদ্বৰ্তের বিবৃতির কথা স্মরণ আমি করছি। জর্ডানের সেনাবাহিনী এবং প্যালেষ্টাইনের মুক্তিযোদ্ধাদের সংঘর্ষের সময় পাকিস্তানী সামরিক ইউনিটের (বিগান বিশ্ববৰ্ষী বাহিনী) ভূমিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রদ্বৰ্ত বললেন : “আমি আপনাদের ওয়াদা দিচ্ছি পাকিস্তানী বাহিনী কোথাও মুসলমানের বিরুদ্ধে একটি গুলি ছুড়বার দায়ে দোষী হবে না।” এ বিবৃতিটির উকূল ও প্রচারে আধান্য পেয়েছিল। এ বিবৃতি দু’বছর আগের। আমি ভেবে বিশ্বিত হচ্ছি, বর্তমানে পূর্ব বাংলায় যে নারকীয় ঘটনা ঘটছে সেগুলো গলাধংকরণ করতে ঐ রাষ্ট্রদ্বৰ্তের কিনা মানসিক কসরৎ করতে হচ্ছে।

যখন ১৯৪৭ সনের আগস্ট মাসে পাকিস্তান আজাদ রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হলো, সেই জনালগ্ন থেকেই কোন্দলের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা। সেকালের বৃত্তিশাসিত ভারত সামাজিক মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির ঐতিহাসিক আন্দোলন, মুসলমানরা হিন্দুদের আধিপত্য আশংকা করেছিলেন, ওটা তাবা অযৌক্তিক ছিল না। উপমহাদেশ ভাগভাগির উদ্দেশ্য সাধনে ঐ ভাবনা যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে। কিন্তু এ চেতনাই দুটি ভৌগোলিক স্বতন্ত্র আর্থ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচিত ও বেদনাঘন সীমানা রোয়েদাদ দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ রাজ্যের সমাপ্তি হলো এবং পাকিস্তানের জন্ম হল। শুধু এক হাজার মাইল দূরত্ব বিস্তৃত ভারতীয় ভূখণ্ডই নয়, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রয়েছে সরদিক থেকে পার্থক্য। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের ভাষা ও চিন্তায় রয়েছে পার্থক্য, তাদের জীবনযাত্রা, আহার ও বেশ-ভূষায় নিজস্বতা আছে। তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে বসবাস করে। এমন কি তাদের খেলাধূলাও আলাদা মেজাজের। ফুটবল—যা লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে উৎসাহিত করে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এর কদর কম। সেখানে ক্রিকেট ও হকির প্রাধান্য। যদিও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মেলামেশা হচ্ছে, তবু বিয়ে-সাদী হচ্ছে কম। দেশের অবস্থাতা রক্ষার জন্য সরকার দু’অঞ্চলের মধ্যে অন্তঃদেশীয় বিয়ে শাদীর জন্য ক’বছর যাবৎ চেষ্টা চালিয়েছেন। প্রতিটি বিয়েতে পাঁচ’শ টাকা যৌতুক দেয়া হয়েছে তবুও হাতে গোনা যে ক’টি বিয়ে হয়েছে, আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এ

ধরনের দু'একটি বিয়ে বর্তমানে যুক্তের কারণে তিক্ত ঘৃণা ও দুঃখজনক পরিসমাপ্তিতে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিকভাবেও দুটি অঞ্চল ভিন্ন তরঙ্গে বাঁধা। পশ্চিম পাকিস্তান নিজেকে মধ্য প্রাচ্যের অংশ হিসাবে বিবেচনা করে। সেভাবেই সর্বদা দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেছে এবং ১৯৫৮ সনের এক স্মরণীয় অনুষ্ঠানে পাকিস্তান মন্ত্রিসভায় প্রেসিডেন্টে মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা আফগানিস্তান ও ইরানের সঙ্গে কনফেডারেশনের প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। এ ধরনের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে পূর্ব বাংলার লক্ষ লক্ষ জনগণের অস্বস্তিকর রাজনৈতিক চাপকে বানচাল করার প্রধান কারণ হয়ে থাকবে।

সঙ্গত কারণেই ঐসব দেশগুলো থেকে এ ধরনের হাস্যকর প্রস্তাবে কোন সাড়া না পেয়ে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। পাকিস্তানের অংশ হলেও পূর্ববাংলার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র সমূহের সঙ্গে স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান আন্তর্জাতিক অনুশাসনের প্রতি কখনই উৎসাহিত হয়নি।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে সান্নিধ্যের উষ্ণতার লক্ষণ দেখা যায়নি। দিঘীতে আমার তিন বছর থাকাকালে আমি দেখেছি—পাকিস্তান দৃতাবাসের বাঙালী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ভারতীয়দের সঙ্গে যতটা নৈকট্য ও আত্মিক, তাদের দেশবাসীর সঙ্গে ততটা নয়। যদিও দুটি দেশের মধ্যে ভারতীয় রাজধানীতে যে রাজনৈতিক বাতাবরণ, তাতে বিপরীত অবস্থা হওয়া বিধেয়। ১৯৫৮ সনে ওয়াশিংটনে এবং ১৯৬৭ সনে বিলিতে একই রকম দেখেছি। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে একই সামাজিক অবস্থান দেখতে পাবেন। অবসর সময়ে বাঙালী কর্মচারীরা নিজেদের মধ্যে কিংবা বিদেশী সহকর্মী বন্ধুদের সান্নিধ্য বেশী অভিভেত মনে করে। পাঞ্জাবী ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের চলার পথেও ভিন্নতার। যদি কখন সাক্ষাৎ হয় তা মিশনের আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে কিংবা দৃতাবাসের অনুষ্ঠানিক সৌজন্য মদের পার্টিতে (ককটেল পার্টি)। যখন একজন কৃটনীতিবিদ এ ধরনের কৌতুহল উদ্দীপক বিষয়ে প্রশ্ন করেন তখন আড়তোহানভাবে একজন পাঞ্জাবী কর্মকর্তা উত্তর দিলেন : “এতে আশ্চর্যের কি আছে, শত হলেও আমাদের জনসূত্র-ধারার উৎস ভিন্ন।”

পশ্চিম পাকিস্তানের প্রকৃতি জনগণকে কর্ম্ম' ও উৎ করেছে—। কষ্টসহিষ্ণু পার্বত্য মানুষ ও উপজাতীয় কৃষকদের সব সময় বন্ধুর পরিবেশ জীবন ধারনের জন্য তৎপর থাকতে হয়। বাঙালীরা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্ত ও মর্যাদা সম্পন্ন বাঙালী, তারা সহজ জীবনযাপন ও বন্দীপ এলাকার প্রাচুর্যে বসবাসে অভ্যন্ত। কুমিল্লায় নবম ডিভিশনের একজন পাঞ্জাবী সামরিক কর্মচারীর মন্তব্য আমার বেশ মনে আছে। হাত দিয়ে চারিদিকে কালো উর্বর মাটির দিকে লক্ষ্য করে বললেন, “হায় আল্লাহ! এ

বিচিত্র এদেশ দিয়ে আমরা কি না করতে পারি।” ক্ষণেক চিন্তা করে বললেন, “কিন্তু আমার মনে হয় তাহলে আমরা বাঙালীদের মতো হয়ে যেতাম।”

ইসলাম অবশ্যি দু'অঞ্চলের সাধারণ যোগসূত্র। কিন্তু পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাস প্রমাণ করে—দু'অঞ্চলের পরম্পরারের প্রতি সাধারণ ক্ষেত্রে ধর্ম খুব নগণ্য বদ্ধন সৃষ্টি করেছে। ভারত ভাগভাগির সময় এ ধরনের ঘৃণা ততটা ছিল না। কেননা তখন হিন্দুদের সঙ্গে আদর্শিক বিরোধ ছিল। যা তৎকালীন ভারতবর্ষে ‘পাকিস্তান’ মুসলিম ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি। পাকিস্তানের নতুন মুসলিম জনমানস, এই বিরোধপূর্ণ সূত্রগুলি উপেক্ষা করে, স্বাধীনতার প্রাথমিক উদ্দেশ্যনা ক্ষীণ হতে থাকলে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ অর্জনের ভিন্ন ধারা বইতে শুরু করল।

অন্তিম রক্ষা ও অগ্রগতির সংগত কারণেই উগ্র পচিম পাকিস্তানীরা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ও জনবহুল পূর্বাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল। পূর্বাঞ্চল ভার অন্তিম রক্ষার জন্য আধিপত্য প্রতিরোধ করতে শুরু করল। এ পটভূমিতে আর্থনীতিক বিষয়গুলো এলো সামনে আর ধর্মের স্থান গেল পিছনে, বিরোধ তীব্র হতে লাগলো।

এই আর্থনীতিক উন্নোব্যধারাকে ও পূর্ব বাঞ্চালকে পদানত রাখার জন্য পাকিস্তানী শাসকেরা বারে বারে গত দু'দশকেরও বেশী সময় ধরে ধর্মীয় গৌড়ামির আশ্রয় নিয়ে ব্যর্থ আক্রমণ চালিয়েছে। যখনি রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক প্রকট সমস্যাগুলি উত্থাপিত হয়েছে তখনি ‘ইসলামীকরণে’র নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে। এসব হলো ধর্মক্ষতার নতুন ফুটুয়া। সব সময় পুরনো আদর্শের তোল পিটানো হয়েছে, প্রাক-স্বাধীনতা যুগে সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় আদর্শে রূপ নিয়েছে। যেহেতু পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে ইসলামকে মুক্ত করে তোলার জন্য, সে কারণে ভারতের সঙ্গে সহাবস্থান সৃষ্টির কোন অচেষ্টা হ্যানি। ভারত একসময় ভয়ংকর হিন্দু আধিপত্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

এই উদ্দেশ্য ভুরাব্বিত করার জন্য কাশীর সমস্যা পাকিস্তানের জন্মক্ষণ থেকেই সূলভ বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জনসমূহের একাধিক অনুষ্ঠানে আমাদের বলা হতো “কাশীরের যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা থেকেই পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতি উৎসারিত।” পাঞ্জাবী ও পাঠানদের কাছে এটা খুব সুখশাব্দ্য ছিল, কারণ ওদের অনেকেরই কাশীরের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বাঙালীদের কাছে অতটা উদ্দেশ্যনার কারণ ছিল না, যদিও বাঙালীদের অনেকে দেশপ্রেমের কারণে সরকারী ভাষ্যের সঙ্গে ঐক্যত্ব পোষণ করতেন। কিন্তু সেটা ছিল খুবই সীমিত। শুরুতে কাশীর নিয়ে যে প্রেশণাই থাকুক না কেন পরবর্তী সময়ে তা শুধু জনগণের মধ্যে উদ্দেশ্যনা সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জেনেছি, প্রয়াত প্রেসিডেন্ট কেনেডি পাকিস্তানী জনৈক

কৃটনীতিককে বলেছিলেন, “জনাব, আমার মনে হয় কাশীর নিয়ে আপনাদের যতটা উদ্দেগ তার চেয়ে বেশী আগ্রহ কাশীর সমস্যার প্রতি।” পাকিস্তান যখন সৃষ্টি হলো তখন থেকেই ধর্ম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সাধারণ শক্র বিরুদ্ধে এক্ষণ্য প্রকাশের সাহায্য করেছে। কিন্তু দুই অংশের মানুষের মধ্যে প্রেম বা আত্মবুদ্ধিমত্ত্বের প্রকাশে এ একসঙ্গে থাকার যথেষ্ট অবদান রাখেন। বাংলাদেশের নেতৃত্বস্থ বলেছেন, “আর্থনীতিক অংগতির প্রাধান্য এত বেশী যে, ইসলামের সৌহার্দ্য ও ঐতিহ্যের শোগান দিয়ে তাকে উপেক্ষা করা যাবে না। এটা ভাবা সমীচীন হবে না যে, পূর্ব বাংলার মানুষেরা আর্থনীতিক শোষণ ও তজ্জনিত অবনতি ভুলে গিয়ে ইসলামী বদ্ধন শক্তিশালী বিবেচনা করেন।” শেখ মুজিবুর রহমানের আর্থনীতিক উপদেষ্টা এবং সমাগত নৃতন বাংলাদেশ সংস্থাপনায় সবচেয়ে কৃতী আর্থনীতিবিদ রেহেমান সোবাহান এ বিষয়ে পুনরায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন, “বৃত্তিশ ভারতের ধর্মীয় সংখ্যা গরিষ্ঠের শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তির জন্যই বাংলাদেশ ধর্মীয় ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনীতিতে ক্ষেত্রে অংশীদারী হয়েছিল। কেউ অগন ভাবেনি যে, এই ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত হয়ে পাকিস্তানের শোষণ ব্যবস্থায় স্বপ্নান্বিত হবে” (বাংলাদেশ আর্থনীতিক পটভূমি ও সম্ভাবনা)।

পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল যতই পরম্পর থেকে দূরে সরে যেতে থাকে ততই উভয়ের মধ্যে ইসলামের সাধারণ বদ্ধন গ্রিয়মাণ হতে থাকে। পাঞ্জাবের প্রথ্যাত রাজনীতিবিদ নবাব মুস্তাক আহমেদ গুরমানীকে যখন এক পর্যায়ে অনুযোগ করতে শোনা গিয়েছিল, “গুরু দুটো পাখাই দেখা যাচ্ছে, পাখি দেখা যাচ্ছে না।” এখন এমনকি সেই ডানার বাপটানো পর্যন্ত নীরব হতে চলেছে।

## ଉଦ୍‌ବେଦର ମୂଳ ହେତୁ

‘୧୯୪୭ ସନେ ପାକିତ୍ତାନ ସାଧୀନ ହଲେଓ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ବୁବତେ ୨୪ ବଛର ଲେଗେଛେ ଯେ  
ତାରା ସାଧୀନ ହୟାନି ।’

କବୀର ଉଦିନ ଆହମେଦ  
(ବାଂଲାଦେଶେର ଜନା)

‘ଆମାର ମତେ ବାଙ୍ଗଲାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଷୟେ ବିକ୍ରମ ହୋଯାର ନାମ୍ୟସମ୍ପତ୍ତ କାରଣ ରଖେଛେ ।’  
ପ୍ରେସିଡେନ୍ଟ ଇଯାହିୟା ଖାନ  
ଜାତିର ଉଦ୍‌ଦେଶେ ରେଡ଼ିଓ ଭାବଣ  
ଜୁଲାଇ, ୨୮, ୧୯୬୯ ।

କରାଟିତେ ଆମାର କ'ଜନ ପୁରାନୋ ବନ୍ଧୁ ଅଭୀତେର ଘଟନା ମୂଲ୍ୟାଯନ କରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାତେ  
ଆସଲେନ, ମୁସଲିମ ଲୀଗ ଯଦି ତାର ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଦାବି ଓ ଧାରଣା ମେନେ ଚଲତେନ  
ତାହଲେ ଯେ ସବ ଦୃଃଖ୍ୟନକ ଘଟନା ଦେଶର ଐକ୍ୟସ୍ଵର୍ଗ ଛିନ୍ନ କରେଛେ ତା ହୟାତେ ଘଟିତେ  
ନା । ‘ବୃତ୍ତିଶ ଭାରତେର ମୁସଲାମାନଦେର ଜନ୍ୟ ପୃଥିକ ଆବାସଭୂମି ‘ପାକିତ୍ତାନ’ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର  
ପରିକଳ୍ପନା ଛିଲ । ଭାରତ ଉପମହାଦେଶେର ଏହି ପ୍ରାକ୍ତ୍ତେ ଦୁଟି ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକଇ ନେତ୍ରେ  
ଗଠିତ ହବେ । ୧୯୪୦ ସାଲେ ‘ଐତିହାସିକ ଲାହୋର ପ୍ରକାବ’ ଏକଜନ ବାଙ୍ଗଲୀ ଉତ୍ସାହନ  
କରେଛିଲେନ । ତିନି ବାଂଲାଦେଶେର ଶେରେ-ଇ-ବାଂଲା ଫଜଲୁଲ ହକ ନାମେ ପରିଚିତ । ଏହି  
ପ୍ରକାବେ ବଲା ହୟ ଯେ, “ଭାରତେର ଯେ ସମ୍ମତ ଅଂଶେ ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଯେମନ ଭାରତେର  
ଉତ୍ତର ପଚିମେ ଓ ପୂର୍ବାସ୍ତଳେ, ଏଇସବ ଅଂଶକେ ଏକତ୍ର କରେ ସାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରେ  
ସେଇ ସବ ଅଂଶକେ ସାର୍ବଭୌମ ଓ ସାଯାତ-ଶାସିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହତେ ହବେ ।”

ଭୌଗୋଲିକ ଅବଶ୍ରା ମୋକାବେଲାର ଜନ୍ୟଇ ଏ ଧରନେର ଉଭ୍ୟବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଧ୍ୟୋଜନ ।  
କିନ୍ତୁ ମୁସଲିମ ଲୀଗେର ଜମିଦାର ଓ ଶିକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀର ସଦସ୍ୟଦେର ଆକାଞ୍ଚଳ୍ୟ ପୂରଣେ ତା  
ମନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୟାନି । ଛ'ବଛର ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦିବଚନ ଶବ୍ଦଟି କାରଣିକେରା ତ୍ରୁଟି ହିସେବେ ଅବଜା  
କରେ ଏକବଚନେ ସୁବିଧାଜନକ ଭାବେ ସଂଶୋଧନ କରା ହୟ । ଏ ଥେକେଇ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶେର ବୀଜ  
ବପନ କରା ହଲ । ମୁସଲିମ ଲୀଗ ଇତିହାସବେତ୍ତାଗମ ତାଦେର ଇତିହାସେର ଜଟିଲ ସଂକଟେର  
ସରଳିକରଣେ ବିରକ୍ତି ବୋଧ କରିବିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଟା ବାନ୍ଦବ ବିବର୍ଜିତ ନନ୍ଦ । ୧୯୭୧ ସାଲେର

২৫শে মার্চ পর্যন্ত এ সত্য বিদ্যমান ছিল। পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রের দ্বিবচন ক্লিপটির মূল প্রস্তাবের সঙ্গে সংগতি রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তাঁরা শ্বীকার করেছেন, এ রাষ্ট্র দু'টির মধ্যে পাকিস্তানের পরিচয় রক্ষার একমাত্র উপায়। এটাই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের ছয়দফা দাবীর সার কথা। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় এ ধরনের মনোভাব ছিল না। পরিবর্তে পূর্ব ও পশ্চিম ভাগের আর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অসম বৈশিষ্ট্যসমূহ ও এক হাজার মাইল ভারত ভূখণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন দুটি অংশকে সংযুক্ত রাখার সাধিবিধানিক ও আর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায় ফন্দি আঁটা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সম্ম অংশীদারিত্ব প্রধান উপাদান হিসেবে দু'অংশের ঐক্য বজায় রাখতে পারতো এবং সেটিই ছিল অনুপস্থিতি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের উৎকৃষ্ট স্বাদেশিকতা এটা গ্রহণ করেনি। তাই দেশের ঐক্য বজায় রাখার সকল প্রয়াসই বহিমুখী উদ্দেশ্য সাধন করেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে স্পর্শকাতর বাঙালীরা ৪টি মূল দাবিতে গণঅসম্ভোগ প্রকাশ করেছেন। সেগুলো হলো : রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে তাদের অঙ্গীকার করা; মাত্তামাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে শীকৃতি দিতে বহু বছরের অঙ্গীকৃতি; পশ্চিম পাকিস্তানীদের চোখে বাঙালীদের কর্মণার দৃষ্টিতে দেখা এবং আর্থনৈতিক বৈষম্য যা ছিল, গলা টিপে ধরার শামিল। এ আর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে পরে আলোচনা করবো। বর্তমানে প্রথম তিনটি কারণের আলোচনা করছি।

অংশীদারিত্বহীনতা : পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান লিখতে সাড়ে আট বছর লেগেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের উপরে কেন্দ্রীয় আইন সভায় তাদের সদস্য সংখ্যা কমানোর জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। শ্বীকার করতে হয় এসবকিছু কতিপয় বাঙালী নেতৃবৃন্দের বিশেষত প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এবং মুহাম্মদ আলী বগড়ার সহায়তায় করা হয়েছিল। কিন্তু '১৯৫০ সনের দুঃখের ঘটনায় দেখা যায়, এই সকল হতভাগ্য নেতৃবৃন্দ তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঞ্চা পূরণের জন্য শক্তিশালী পাঞ্জাবীচ্ছের হাতে বন্দী হয়ে পড়েছিল।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার প্রস্তাৱ করেছিলেন। যাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম-প্রতিনিধিত্ব থাকবে। এই সূত্র অনুযায়ী দুই অংশের দুইশত সদস্য বিশিষ্ট নিম্ন পরিষদ ও আট সদস্য বিশিষ্ট উচ্চ পরিষদ দেওয়া হয়েছিল। এ প্রস্তাৱেও পূর্ব অংশের ৫৬ ভাগ জনসমষ্টিৰ বাস্তবতাকে অঙ্গীকার করা হয়েছিল। এ বিষয়ে অকথিত কারণ পূর্ব পাকিস্তানের দেড়কোটি হিন্দুর উপস্থিতি। যাকি দেখানো হয়েছিল সংখ্যালঘুদের বাদ দিলে পূর্বাঞ্চলে মুসলিম জনবসতি পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে কম হতো। লিয়াকত আলীর সূত্র পূর্ব বাংলায় কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান রাওয়ালপিন্ডিৰ জনসভায়

আত্তায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। যদিও নিহত হওয়ার সরকারী তদন্তের বাখ্যা, অবস্থার সঙ্গে সম্মতজনক ছিল না।

১৯৫২ সালে খাজা নাজিমউদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হলে অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং পূর্ব বাংলার জনগণ আত্মতের ন্যায় প্রতিরোধ করেন। দু'বছর পরে পাঞ্জাবী-চক্র যখন নাজিমউদ্দিনকে প্রয়োজন নেই ভাবলো তখন তাকে গদিচ্ছত করে। মুহাম্মদ আলী বগড়াকে নৃতন প্রধানমন্ত্রী করে তৃতীয় সূত্র উত্থাপন করা হলো। আপাতৎ দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল যে মুহাম্মদ আলী বগড়ার প্রস্তাবে নিম্ন পরিষদে পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রতিনিধিত্ব স্থাকার করা হয় কিন্তু উচ্চ পরিষদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা ছিল চৰম হতাশাজনক। কেননা পূর্ব বাংলায় শুধু সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব ছিল। মুহাম্মদ আলী বগড়া প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে অপসারিত হলে, অন্য দু'জনের আনীত প্রস্তাবটিও অনুরূপ ভাগ্য বরণ করে।

অবশ্যে সম-প্রতিনিধি ভিত্তিতে একটি চুক্তিতে উপনীত হয়। এ চুক্তিতে বলা হয় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সমসংখ্যক প্রতিনিধির এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ থাকবে। এই ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলা প্রশাসনকে সম-প্রতিনিধিত্ব স্থাকার করে নিতে হয়। যদিও এই সমতা ফরমুলা ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়; কিন্তু তাতেও এর মূল্য দেয়া হয়নি। প্রাণসনের উচ্চ পদে বাঙালীদের সংখ্যা শতকরা ৩৬ ভাগ উপরে অতিক্রম করেনি। এমনকি ১৯৬৯ সালের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান উনিশ জন সচিব পদে মাত্র তিনজন বাঙালী পেয়েছিলেন। সামরিক বিভাগেও বাঙালীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে একজন মাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল ছিলেন। পাকিস্তানের বিমান বাহিনীতে বাঙালী সমর্যাদার পদ পায়নি। এই অসম প্রতিনিধিত্ব অতটা মারাত্মক হতো না যদি না লিয়াকত আলী খান আত্তায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর থেকে পাঞ্জাবী নিয়ন্ত্রিত আমলা-সামরিক-চক্র পাকিস্তান শাসন না করতো। সমসাময়িক রাজনৈতিক কর্মীরা এ বিষয়ে বহুবার উল্লেখ করেছেন। লোক দেখানো গণতন্ত্রের অন্তরালে অধিষ্ঠিত কয়েকজন বেসামরিক আমলা, সেনাবাহিনীর মদদপূর্ণ সরকারী কর্মচারী থেকে নৃপাত্তিরিত রাজনীতিবিদ এবং অবশ্যে ক্ষমতালোভী সামরিক কর্মচারী নিজেরাই গত দুই দশক ধরে পাকিস্তানের নীতি নির্ধারণের সকল ক্ষমতা ভোগ করে আসছে। নৃতন দিল্লীর জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তান টাউনিস বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর মুহাম্মদ আইয়ুব, কার্নিহোন ভরিস এর একটি ষাটি থেকে উন্নতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, ১৯৪৮-৫৮ সাল পর্যন্ত যখন দেশে লোক দেখানো একটি সংস্মীয় সরকার ছিল তখনও জাতীয় পরিষদের বৈঠক বসেছে মাত্র ৩০৮ দিন অর্থাৎ গড়ে বছরের ত্রিশ দিন। উক্ত সময়ের মধ্যে আইন পরিষদ মাত্র ১৬০টি আইন প্রণয়ন

করেছেন। অন্যগক্ষে গভর্নর জেনারেল / প্রেসিডেন্ট মোট ৩৭৬ টি আইন প্রবর্তন করেন।

এই সমস্ত ঘটনাই বাঙালীদের অসন্তোষের ন্যায্যতা প্রমাণ করে। এটা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কৃতিত্ব বলা চলে যে তিনি প্রথম অবস্থায় এ ধরনের ক্ষেত্রগুলি সংশোধনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি জনগণের দাবীর প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের পক্ষে সমতা ফরমূলা বাতিল ঘোষণা করেন। প্রশাসনে বা সিভিল সার্ভিসে তিনি বাঙালীর সংখ্যা বাড়ান। কিন্তু ইতিমধ্যেই শ্বাসরুক্ষকর আর্থনীতিক পরিস্থিতির মুখে বাঙালীদের মোহুক্তি ঘটে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সকল প্রচেষ্টা ছাপিয়ে সামরিক বাহিনীর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ জাতীয় জীবনে বড় হয়ে দেখা দিল।

### ভাষা সমস্যা :

গুরু থেকেই পঞ্চিম পাকিস্তানী উৎকৃষ্ট স্বাদেশিকতার হাতে বাঙলা ভাষা প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছরেও কম সময়ের মধ্যে বাঙালীরা ঔপনিবেশিক ব্যবহারের স্বাদ পেয়েছিল। কায়দে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারীতে পূর্বাঞ্চলে সফরে এসে একত্রফাভাবে ঘোষণা করেন যে, “উর্দু এবং উর্দুই” একমাত্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। জনসংখ্যার দশ ভাগেরও কম মানুষের এই উর্দু ভাষা সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালীদের মতো আলাদা আলাদা মাতৃভাষা ছিল।

কায়দে আজমের এই ঘোষণা বাঙালী মুসলমানেরা মেনে নেয়ানি। যদিও তাদের সমর্থন পাকিস্তান অর্জনের জন্য বিবাট শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ঘটনায় সীমাহীন প্রতিরোধ আন্দোলনের উন্নত হয়েছে। ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে বহু ছাত্র ও আন্দোলনকারীরা প্রেক্ষিতার হন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এই প্রথম পাকিস্তানের কারাগারের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। অন্যেরা গান্ধীয় পুনীশের হাতে নৃশংসতার শিকার হলেন।

এই ঘটনার পরে নতুন ধরনের অসন্তোষের সৃষ্টি হলো। আইন সভায় বাঙালী সদস্যদের মাতৃভাষায় কথা বলার অনুমতি বাতিল করা হয়। যখন তাঁরা প্রতিবাদ জানালেন তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান উন্নয়নে, “পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে সংযোগকারী ভাষা থাকা প্রয়োজন।—। এই জাতির জন্য একটি ভাষার প্রয়োজন এবং সেই ভাষাটি কেবলমাত্র হতে পারে উর্দু।”

ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে চরমে পৌছলে কেন্দ্রীয় সরকার উর্দুর সংগে

বাংলা হরফকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছাকৃতভাবে রাজী হলো। বেশ কিছু সংখ্যক লোক পুলিশের সাথে সংঘর্ষে নিহত হলো। অবশ্যেই বাঙালীদের দাবী সরকার মেনে নিলেন এবং উর্দ্ধ ও ইংরেজীর সঙ্গে বাংলা গান্ধীভাষা হিসাবে সরকারী স্বীকৃতি পেল।

### ইসলাম :

“উর্দু মুসলিম জাতির ভাষা” লিয়াকত আলী খানের এই জাহির করা উক্তিই ইসলামী আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। উর্দু নয় আরবী হচ্ছে কোরানের ভাষা। তার ভাষণে অনুকূল মুসলিম বিশ্বাস সংক্রান্ত কটাক্ষ এবং অমুসলমানদের প্রতি অনীহা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর ভাষাভাষী বালুচী, সিঙ্গি, পাঞ্জাবী অথবা পশ্চিমুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। সরাসরি কেবল বাংলা ভাষার প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছিল। শুধু অন্য কুসংস্কার ছাড়া এসব বিবৃতিগুলোতে কোন যুক্তি ছিল না।

এমন কি হাস্যকর সমাধান যে বাংলা ভাষায় হিন্দুর বৈশিষ্ট্য রয়েছে কেননা পূর্ব বাংলা জনসমষ্টির এক বিশেষ অংশ হিন্দু। এ যুক্তি ধোপে টেকেনি। পাঞ্জাবী ভাষাতেও অনেক হিন্দু কথা বলেন, যেমন পশ্চিম পাঞ্জাবের বহু মুসলিম পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলেন। তবু বাংলা ভাষাকে যেভাবে হেয় করার চেষ্টা হয়েছে, সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তা অন্য ক্ষেত্রে হয়নি। বাঙালী মুসলমানদের নানাভাবে অবজ্ঞা ও কর্কণার চোখে দেখা হয়েছে। ১৯৫২ সনে পূর্ববঙ্গের গর্ভর মালিক ফিরোজ খান নুন একবার মন্তব্য করেছিলেন, বাঙালী মুসলমানরা অর্ধেক মুসলমান এবং তারা মুরগীর মাংস হালাল করেও খায় না। এই অপমানে জননেতা মৌলানা তাসানী তীব্র ভাষা ব্যবহার করলেন, “লুঙ্গী উচ্চা করিয়া দেখাইতে হইবে আমরা মুসলমান কি না?”

কুমিল্লার নবম ডিভিশন হেডকোয়ার্টারে আমার সফরকালে আমি দেখেছি পাঞ্জাবী অফিসারগণ বাঙালীদের ইসলামের আনুগত্যের প্রতি সব সময়ই সদেহ পোষণ করতো। তারা বাঙালী মুসলমানদের কাফের ও হিন্দু বলতো। এসব বলার প্রকৃত কারণ হলো, পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য না মেনে মুসলমানেরা বাঙালী জাতীয়তাবাদে সমর্থন দিয়েছে। এ ধরনের দোষারোপ করা সত্ত্বেও অপলাপের সামিল। পশ্চিম পাকিস্তানের যে কোন নগরীর মতো, ঢাকাও এক হাজার মসজিদের শহর, এ ন্যায্য দাবি করতে পারে। এমন কি পর্যটনের পোস্টারে এর সমর্থন মিলবে। আমি বাঙালী মুসলমানদের অন্যত্র বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায়ের চেয়ে বেশী মাত্রায় ধর্মতীক্ষ্ণ দেখেছি। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান নগরীর সহধর্ম্মাবলম্বীদের থেকে মনে হয়েছে রক্ষণশীল ও ধর্মের প্রতি অনুরক্ত।

পূর্ব বাংলায় মদ বিক্রয় কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে, অননুমোদিত মদের দোকানগুলো শুক্ৰবারেও খোলা থাকতে দেখেছি—

যা পূর্ববাংলায় কথনোই ঘটেনি। করাচী ও লাহোরে যৌন আবেদনমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং ক্যাবারে নাচ হোটেলে চলে, এগুলো ঢাকা ও চট্টগ্রামে দেখানো হলে বা ঢাকু করা হলে সঙ্গে সঙ্গে জনতার কন্দ্র প্রতিবাদের শিকার হত।

রমজান মাসে পূর্ব বাংলার সম্পদশালী মুসলমানদের কঠোরভাবে রোজা পালন করতে আমি দেখেছি, যা পশ্চিম পাকিস্তানের সমশ্রেণীভুক্তদের মধ্যে দেখিনি। ১৯৭০ সনে কষ্টকর নির্বাচনী প্রচার অভিযানের মধ্যেও শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিদিন রোজা রাখতেন। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এটা জেনেছি। আমি তাঁর ঢাকার ধানমন্ডির বাসগৃহে সাক্ষাতের জন্যে গিয়ে একথা জেনেছি। রাওয়ালপিণ্ডি ও করাচীতে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতে আমার যথেষ্ট ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এদের একজনের সাথে খেয়েছি আর একজনের সঙ্গে মদ্য পানেও শরিক হয়েছি। এসব সম্মেলনে মুজিব ও তাঁর লোকদের বলা হয় ‘কাফের’। পূর্ব বাংলার মুসলমানের প্রতি অকারণ কলংক লেপন করে যে সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছে পূর্বে তেমনটি করা হয়নি। ফলশ্রূতিতে সংবেদনশীল বাঙালীদের বেদনাদায়ক অপমানই তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী ইওয়ার অন্যতম অনিবার্য কারণ হয়ে থাকবে।

## আর্থনীতিক হেতু :

“এক পরিবারের একজন খেলেই অন্যজনের পেট ভরে না। তাই কেমন করে এবং কোন বিবেচনায় আমাদের অংশের ওপর দাবি জানালে তোমরা আমাদের স্বার্থপর বল? তোমরা, যারা কেবল তোমাদের নিজের অংশই ভোগ করছো না, তোমাদের ভাইয়ের অংশও ভোগ করছ?”

শেখ মুজিবুর রহমান  
আমাদের বাচার অধিকার

আমার যত অপেশাদারী লোকদের পক্ষে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পঙ্গু আর্থনীতিক বৈষম্য পর্যালোচনার যে ব্যাপক সংস্করণ তথ্য ও অংক, পরিসংখ্যানের উপযুক্ত রেফারেন্স থেকে বুলেটিন, স্ট্যাডিওপস্ এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত এবং যারা শুরু থেকে এইসব ব্যর্থতাগুলোতে আলোকপাত করেছেন, সেই সবের উল্লেখ করতে হয়।

আর্থনীতিক বৈষম্যই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্কের সঙ্গে সবচেয়ে বড় সমস্যা যা অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে ওভেরলেভেড জড়িত। পাকিস্তান বাণ গ্রহণকারী অন্যান্য দেশের মতোই আমেরিকা, ইউরোপীয় দেশ এবং জাপানী অনুসন্ধিৎসু উভয় দৃষ্টির বক্তৃ হয়ে গয়েছে। অনুমান করা চলে, এইসব দেশগুলো পাকিস্তানের বাণ পরিশোধের ক্ষমতা সমক্ষে উদ্বিগ্ন। সুতরাং পাকিস্তানের আর্থিক ও আর্থনীতিক বাস্তবতা নিয়ে অনেক দীর্ঘ পরিসরে আলোচনা হয়েছে।

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বাঙালী আর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান ও কবীরউদ্দিন আহমদ এবং তিনজন হার্ডার্ড আর্থনীতিবিদের একটি দল এডওয়ার্ড এস ম্যাসন, ম্বার্ট ডর্ফস্যান এবং স্টিফেন ও মার্লিন পৃথক পৃথকভাবে যুক্ত ও নজিরসহ তথ্যাদি যে প্রণালীতে উথাপন করেছেন তাতে পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ বলা চলে। উদ্ঘাটিত তথ্যাবলি বেশ চমকিথে। এগুলো হলো :

১। ১৯৬৯-৭০ অর্থ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৬১ শতাংশ বেশী ছিল। এবং এটা ছিল পাকিস্তানের দশ বছর আগের মাথাপিছু আয়ের দ্বিগুণ।

২। ১৯৫০-৫৫ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলার জন্যে উন্নয়ন বরাদ্দ শতকরা ২০ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য শতকরা ৮০ ভাগ, ১৯৬৫-৭০ পঞ্চবার্ষিকীতে কেন্দ্রীয় সরকারের বছৰ ওয়াদা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন খাত পেয়েছে শতকরা ৩৫ ভাগ, পশ্চিম পাকিস্তানের বরাদ্দ হলো শতকরা ৬৫ ভাগ। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৪ ভাগ বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানকে এইভাবে বিশ্বিত করা হয়। পাকিস্তানে পাচার করা হয় ৩১০০ মিলিয়ন টাকার সম্পদ, যার বর্তমান মূল্য ২১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৫। পূর্ব বাংলার যাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার মন্তব্য এবং পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কম, এই স্ববিরোধী সরকারী যুক্তি দেখানো হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ১৯৪৯-৫০ সালে ৪১ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ১৯৫৯-৬০ সালে ৫৩ মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়ায় এবং ১৯৬৯-৭০ সালে জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৬৯ মিলিয়নে।

প্রথম দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ২.৯ এবং দ্বিতীয় দশকে এই বৃদ্ধির হার হল ৩। পশ্চিম পাকিস্তানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৪৯-৫০ সনে ৩২ মিলিয়ন থেকে ১৯৫৯-৬০ সালে ৪৫ মিলিয়ন এবং ১৯৬৯-৭০ সালে ৫৯ মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়ায়। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে যথাক্রমে ৪ এবং ৩। দাঁড়াল।

এইসব তথ্যগুলো থেকে নিঃসন্দেহেই আওয়ামী লীগের আর্থনীতিক কঠরোধ ও শোষণের দাবিনামার যথার্থতা ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ব বাংলার শোষণ বিষয়ে কিছু ধারণা দেয়। কিন্তু এটা অবশ্যই বলতে হবে, ইয়াহিয়া সরকারের অন্যতম অর্থনীতিবিদ (মুখ্যপ্রাপ্ত) এবং প্রেসিডেন্টের আর্থনীতিক উপদেষ্টা এম এম আহমেদ তাঁর নিজের মনগড়া একটি আর্থনীতিক সমতার ছবি আঁকতে সমর্থ হয়েছেন, যা দিয়ে তিনি বর্তমান সরকারের বিদ্যমান আর্থনীতিক বৈষম্যের প্রাবাহকে ঘোরাবার চেষ্টা করেছেন অর্থাৎ, এই দাবির যথার্থতা প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছে। পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্যসমূহ কেবল বিতর্কের জন্যই ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু মানুষের অশেষ দৃঢ়ত্ব কষ্ট সম্বন্ধে কোন সৃষ্টি ধারণাই এই তথ্যগুলো থেকে লাভ করা যায় না। অথবা থরোজনীয় মানবিক কাঠামোর প্রকৃত বেদনাদায়ক বাস্তবতাকেও এইসব তথ্য তুলে ধরতে পারে না। এগুলো সবই সম্পূর্ণভাবে পূর্ব বাংলার নিপীড়িত জনগণের অনুকূলেই তথ্য নির্দেশ করে।

অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানেও দুধের নহর বয়ে যাচ্ছে না, এমনকি সেই পশ্চিম পাকিস্তানের একজন লোক সাময়িকভাবে পূর্ব বাংলায় এলে তিনিও পূর্ব বাঙলার দারিদ্র্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। করাচীতে যে কুড়ি বছর আমি ছিলাম তার

ভিতর আমি আটবার পূর্ব বাংলায় গিয়েছি। আমি প্রদেশের সর্বত্র ঘুরেছি, মূল ভূখণ্ড থেকে সুদূর দক্ষিণে কল্পবাজারের প্রশংস্ত সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত।

এই বছরগুলোতে আমি তিন ডজনেরও বেশী পেশা উপলক্ষে এবং ছুটি কাটাতে উত্তরে রাওয়ালপিণ্ডি লাহোর ও পেশোয়ার গেছি।

৩। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পশ্চিম পাকিস্তানী রাষ্ট্রনী দ্রব্যের শতকরা ৪০ ভাগ থেকে ৫০ ভাগ পূর্ব পাকিস্তানের দখলি বাজারে বিক্রি হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের অদক্ষ শিল্প ইউনিটগুলোতে উৎপাদিত বকেয়া, বাজে দ্রব্যাদির উচ্চমূল্যের বিক্রির আঁতাকুড় হিসেবে এই প্রদেশকে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪। বহির্বিশ্বে পূর্ব বাংলার উদ্ভৃত রাষ্ট্রনী আয় কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতি পূরণে ব্যবহার করেছেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার হয়েছে। পাকিস্তানের বিশ বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৮-৬৯ সন পর্যন্ত পশ্চিম থেকে পশ্চিমে কোয়েটা জিয়ারত ও সিঙ্গুর নিকটবর্তী হায়দারাবাদ এবং সুক্রুর ভ্রমণ করেছি। আমি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ওয়ানার উপজাতীয় এলাকার সামরিক চৌকিতে গিয়েছি, এক স্বর্গীয় অনুষ্ঠানে বরফাচ্ছন্ন কারাকোরামের লুনমা এবং গিলগিটেও গিয়েছি। এসব সফর আমি বিমানে, ট্রেনে, মোটর গাড়িতে ও মিনিবাসে করেছি। যেসব সফর আমি পূর্ব বাংলায় করেছি তা নৌকায়, বিশেষ করে মেঘনা-চাঁদপুর থেকে খুলনায় নয়নজুড়নো ভ্রমণ আমি করেছি। অতীত রোমহন করে অস্মার একথা বলতে দিখা নেই যে পশ্চিম পাকিস্তানের কোথাও পূর্ব বাংলার মতো অবিশ্বাস্য দারিদ্র্য দেখিনি। একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, পেশোয়ারের নিকটবর্তী এলাকায় গুহাবাসী পাঠান উপজাতীয়দের দারিদ্র্যের সঙে তুলনীয়। ঠিক একই ধরনের অবস্থা সিঙ্গুর হারিপুজা কৃষকদের। সেখানে গভর্নর লেং জেনারেল রাখমান গুল, আট থেকে দশটি লোকের একটি পরিবারকে ছয় থেকে চৌদ বস্তা গমের বার্ষিক আয়ের উপর বেঁচে থাকতে হয় দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। যেকোন সভ্য সমাজের কাছে এ ধরনের দুঃখ ও দৈন্য লজ্জার বিষয়। কিন্তু পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এই দুঃখ ও দৈন্যের জন্য লজ্জাবোধ শুধু তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র একটি শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। পূর্ব বাংলার বিরাট এলাকা জুড়ে মানুষের সীমাহীন দুঃখ ও দৈন্যের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার তুলনা মেলা ভার। পূর্ব বাংলার দৈন্যদশা শহর ও গ্রামাঞ্চলেও সমভাবে লক্ষণীয় যা পশ্চিম পাকিস্তানে নেই। জীর্ণ ঢাকার শীর্ণ রিস্কাচালক রাত কাটায় রিজ্বায়, দেখতে বয়স চাহ্নাশ; আসলে বয়স হবে বিশ। বরিশালের জেলেরা, চট্টগ্রামের ডকশ্রমিক, কুমিল্লার ধানী জমির কৃষক এবং সিলেটের রাস্তার ধারে আনারস বিক্রেতাদের দেহের ঐ একই শীর্ণ অবস্থা। পুষ্টিহীনতা, যক্ষা ও অন্যান্য শ্বাসরোধ ও পেটের পীড়া স্থানীয়ভাবে ঘোরতর অসুখ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ ধরনের কোন কিছু তুলনামূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে দেখা যাবে না। পূর্ব বাংলার পুরুষের জন্য গোশাক বলতে একথানি লুসী এবং ময়লা বা ছেঁড়া সার্ট। শাড়ীই নারীদের একমাত্র দেহের আবরণ। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে গরীব গ্রামীণ নারীর জন্যও তিন প্রস্তু আবরণ রয়েছে—সালওয়ার, কামিজ এবং দোপাষ্ঠা। তাছাড়া আবশ্যিকভাবে তারা সবসময়েই কিছু অংলকার পরবে। আর পূর্ব বাংলার নিঃশ্ব নারীদের অলংকার নেই, ফুলের হার তারা কখনো পরে। (বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীরা ক্লোর অলংকার কখনো একটা পরে থাকে)। খাবার কখন এক বেলা, তাও একথালা মোটা ভাতের সঙ্গে ঘশ্বরের ডাল কিংবা একটুকরো মাছ। মাস ও ডেইরী সামগ্রী কমই থাকে। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানী শামবাসী সবদিন মাস পায় না ঠিকই তবে যে কোন ভাবেই হোক দুধ বা লাচিহ তারা খাবেই। স্বীকার করছি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণও গরীব কিন্তু তাদের সমস্যাজর্জারিত বাঙালীদের চেয়ে সুখী মনে হয়। এই শুরুত্বপূর্ণ মনস্তান্ত্বিক কারণ বোধ হয় এই যে, পশ্চিমে জনগণের সুখী হবার সুযোগ এবং উন্নত জীবনের আশা করার মত সুযোগ রয়েছে। পূর্ব বাঙলার ভাইদের মুখে ডেসে উঠেছে আশাহত এবং জীবনযুদ্ধে পরাজিতের চিহ্ন। জীবনযুদ্ধে পরাজিত বাঙালীদের মুখছবি আমি কখনো তুলবো না।

পূর্ব বাংলার লোকদের নানাদিক থেকে বঝনার ছবি শূর্ত হয়ে উঠেছে। সামান্য একটি অফিসের চাকুরীর জন্য কয়েকশত গ্রাজুয়েটদের আবেদনের ভীড় দেখবেন। আর্থনীতিক কঠরোধ ও বঝনা বিষয়ে পূর্ব বাংলার অভিযোগ যে সত্য, সে সব আপনি সাধারণ দৃষ্টিতেই ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা অথবা চট্টগ্রাম শহরের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন।

এসব শহরের দোকানগুলোতে জিনিসপত্র ভর্তি আর সেসবই এসেছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। পশ্চিম পাকিস্তানের দোকানে পূর্ব বাংলার জিনিস-পত্র খুঁজে পবেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বাংলার অসম ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে পূর্ব বাংলাকে যে খেসারত দিতে হয়, তার একটি বিশেষ দিক হলো, পূর্ব বাঙলার বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রাম পূর্ব বাঙলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সরাসরি ভোগ্যপণ্য প্রাপ্তভার উপর প্রাতিক প্রতিক্রিয়া। এসবের প্রধান ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যগুলো হলো : চা, দিয়াশলাই, কয়েক পদের ঔষধপত্র ও নিউজপ্রিট। পশ্চিম পাকিস্তানের ভোগ্যপণ্য বাজারে এগুলো ছিল পূর্ব বাংলার প্রধান অবদান। পূর্ব বাংলার লোকদের অভিজ্ঞতা বিপরীত স্থানে প্রায় সকল ভোগ্যপণ্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানী করতে হয়। সেজন্য ঘাটতি নিম্নরেখাগামী।

এই আর্থনীতিক কঠরোধের নজির পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীদের প্রাচুর্যের মধ্যে পাওয়া যাবে। বড় বড় ব্যবসা বাণিজ্যগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে।

বাইশটি পরিবারেই শুরু দিয়ে পাকিস্তানের সময় সম্পদের ওপর একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব ব্যবসায়ীরাই পূর্ব বাংলার বড় বড় ব্যবসা, কারখানা, চা-বাগান, পাট, আমদানী এবং রপ্তানী বাণিজ্য, ব্যাংক ও বীমা এমনকি গাড়ী সংযোজন কারখানা পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানগুলো আধিকারিক দণ্ডের বা শাখা দণ্ডের হিসেবে। এসবই করাচীর প্রধান দণ্ডের সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণে রাখে গেছে। এমনকি দ্বিতীয় সারির ব্যবসায়ীও পশ্চিম পাকিস্তানী। এসব ব্যবসায়ীরা প্রধানতঃ মেমন ও খোজা গোষ্ঠী, এদের করাচী ই'ল আবাসভূমি। কিন্তু পেশোয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর অথবা পাঞ্জাবের কোন শহরে এদের ব্যবসা করতে দেখা যায় না। অথচ সিন্ধুর রাজধানী হায়দরাবাদে এবং পূর্ববাংলার প্রায় সকল শহরে এদের ভৌড় রয়েছে। এই ব্যবসায়ী সম্পদায়দের উদ্যোগ এবং পুঁজি খাটানোর বিরাট ফল অঙ্গীকার করা সঠিক হবে না। এটাও ঠিক অনুধাবন করা যায় যে, বাঙালীরা যখন অভিযোগ করেন তাদের সব সময়েই একজন 'পশ্চিম পাকিস্তানী বহিরাগতের কাছে যেতে হয়-তা চাকুরী হোক, কাপড়-চোপড়ের জন্য হোক, দোকানের জিনিসই হোক বা টাকা কর্জ করার জন্যই হোক। (কলকাতার মাড়োয়ারী ও পাঠানগু, কর্জ দেয়) এমনকি অফিসের বড় সাহেব তিনিও একজন পশ্চিম পাকিস্তানী কিংবা বিহারী মুহাজের। কিন্তু কেন বাঙালীকে সব সময় 'সর্বগ্রাসী বহিরাগত' উপস্থিতিকে সালাম ঠুকতে হবে? এটা কি উপনিবেশবাদ নয়? বাঙালীর এই হতাশাকে হাজার পরিসংখ্যান তালিকা দিয়েও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা যাবে না।

## “চরম বিশ্বাসঘাতকতা”

গত ২৩ বছরে তোমাদের নেতারা যে নির্যাতন, উপেক্ষা এবং দাসত্বের শাসন-কড়া আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে তা সত্ত্বেও আমরা আহ্মাহর নামে পাকিস্তান রাখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তোমাদের নেতারা আমাদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেওয়া সহ্য করেনি অথবা আমাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে কিছুতেই সহ্য করেনি।

তাজউদ্দীন আহমেদ  
বাংলাদেশের ধ্বনমস্তী  
এপ্রিল ১৭, ১৯৭১।

পূর্ব বাংলার বর্তমান বিয়োগাত্মক জটিল পরিস্থিতির এক বাক্যে সার-সংক্ষেপ করা যেতে পারে। বাঙালীরা আওয়ামী লীগের পতাকার তলে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রথম বারের মত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ১৯৪৮ সন থেকে যে পাকিস্তানী পাঞ্জাবীচক্র দেশের ক্ষমতার আধিপত্য বজায় রেখেছিল, তারা ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না এবং সামরিক বাহিনীকে দিয়ে ক্ষমতা ফিরে পেতে তারা তৎপর।

গণতন্ত্রের রায়ের অবমাননা তা'য়তই অসংযত মনে হোক পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এটা নতুন কিছু নয়। বরং এই ন্যাকারজনক অস্থীকৃতির চরম পর্ব, জনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি বারে বারে বিশ্বাসঘাতকতা বা বিগত ২৪ বছরে পূর্ব বাংলাকে শুধু উপনিবেশই সৃষ্টি করেনি, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ জনেরাও এদের হাতে শোষিত হয়েছে। জনতাকে যে সব কর্মচারী “ভয়ানক অপরিচ্ছন্ন” বলে থাকে, তারাই সামরিক আমলাচ্ছের উচ্চাকাঞ্চকা চরিতার্থ করার জন্য মাল মশস্তা জুগিয়ে বর্তমান কামানের শিকার হয়েছে। শোষণ হল এদের সরকারী নীতি, একনায়কতন্ত্রের বিস্তার এদের পদ্ধতি এবং পাকিস্তানের শুরু থেকেই এই বিস্তৃতি চালু রয়েছে।

পাকিস্তানের কোন দিনই সত্যিকার আর্থে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছিল না। বৈরতন্ত্রিক এখানে রাজনীতির কেন্দ্রীয় চিন্তায় বিবর্তিত। এটা বৃটিশ শাসনের দিনগুলোতে মুসলিম আন্দোলনের অঞ্চলত মুসলিম লীগের ক্ষেত্রেও যেমন সত্ত্ব,

তেমনি ১৯৪৭ সনের পরবর্তী ঘটনায় তা প্রযোজ্য। সাধারণ অর্থে মুসলিম লীগ একটি জনগণের দল ছিল কারণ বৃটিশ ভারতের বিস্ফূর্ন মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এই দলের মাধ্যমে সোচ্চার হয়েছিল।

কিন্তু মুসলিম লীগ সামন্তবাদী অভিজাত শ্রেণী এবং একদল শিক্ষিত শ্রেণীর মুখ্যপ্রাপ্ত হিসেবে সেবা করেছে। এইসব সামন্তবাদী অভিজাত শ্রেণীরা ছিলেন পাঞ্জাব ও সিঙ্গুর ভূস্থামী, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খান বংশধরেরা এবং যুক্ত প্রদেশগুলো থেকে আসা নওয়াব ও নওয়াবজাদারা। এবং শিক্ষিত শ্রেণীতে ছিলেন, যুক্তপ্রদেশের প্রবীণ নেতৃত্বন আর বোবের চতুর ব্যাণিস্টারগণ যাঁদের অন্যতম হলেন উচ্চমানের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, বৈরোচারী কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। এঁদের দ্বারাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো প্রভাবিত হত। এঁরা কংগ্রেস ও ঘরযুক্তি বৃটিশ-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন। তারাই শিশির মুসলিম রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল ও ভোগের একচেটিয়া দাবি করেছেন।

তারিক আলী তাঁর বই ‘পাকিস্তান-মিলিটারী রুল অর পিপল্স ওয়ার’-এ মুসলিম লীগের সত্যিকারের চরিত্র উন্মোচন করেছেন।

পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ সরকার একটি ফরমান জারি করে তাঁদের শ্রেণী-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই ফরমানে ১৯৪৪ সালের মুসলিম লীগ মেনিফেস্টো গোপনে অথবা প্রকাশ্যে কোন প্রজার পড়া অপরাধ ছিল, কেননা তাতে কিছু বৈপ্লাবিক চিন্তার উল্লেখ ছিল। এই অভিযোগে অভিযুক্ত একজন কৃষকের শাস্তি ছিল স্থানীয় ভূ-স্বামীর চাষের জমি থেকে উৎখাত হওয়া। বল্কি কথায় প্রজাকে বলা হত : স্থানীয় ভূ-স্বামীকে হয় সমর্থন করো, নতুনা জমি ছাড়ো।

স্বাধীনতার পরবর্তী বছরগুলোতে এই শাসকচক্র জোট বেঁধেছিল। পাকিস্তানের ক্ষমতা পাঞ্জাবী ও তাদের খালাত ভাই হাজারা, পাঠানদের কাছেই সংরক্ষিত রয়ে গেল। এই সবকিছু একশ্রেণীর আমলা ও মধ্য বয়সী সামরিক কর্মচারীদের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার মধ্যেই তা গৃহ্য হয়ে উঠেছিল। এইসব কর্মচারীরা ক্ষমতার শীর্ষে বসে শুধু বন্দুকের জোরেই ক্ষমতাকে মূলধন করেছিলেন তাই নয় সে সঙ্গে অসংতোষের সাগরের সুশৃঙ্খল হেতুও ছিল এটাই। পাকিস্তানের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে আমলা ও সামরিক বাহিনী দৃঢ় দল রয়েছে—এই উক্তি সেক্ষেত্রে অযৌক্তিক নয়।

যদিও বাঙালী মুসলমান জনসাধারণের সমর্থন পাকিস্তান অর্জনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের ভূমিকা নিয়েছিল কিন্তু শীর্ষস্থানীয় বাঙালী নেতৃত্ব ছিল দ্বিধাবিভক্ত, অকর্মণ্য, সংখ্যায় সীমিত ও অকেজো। বিশ্বিত হবার কিছু নেই, এইচ.এস, সোহরাওয়ার্দী এবং ফজলুল হক এই দুইজন পাকিস্তান আন্দোলনের পথিকৃতকে মুসলিম লীগের আনুকূল্য থেকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যেই বেরিয়ে আসতে দেখা গেল।

পরবর্তী বছরগুলোতে বাঙালী দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজনীতিবিদেরা নিজেদের জনগণের দাসত্বের হাতিয়ার হিসেবে এঁদের হাতে নির্দয়ভাবে ব্যবহৃত হতে থাকলেন।

যে উচ্চ আশা ও ধর্মীয় আদর্শিক উচ্ছ্঵াস নিয়ে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা বাস্তবরূপ পেলে এর অবস্থা ভিন্ন হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। জিন্নাহ সাহেবের নিজেই নতুন রাষ্ট্রে কর্তৃত্বের ছাপ রাখবার প্রয়োজন মনে করলেন এবং নিজেই গডর্চের জেনারেল পদে আসীন হলেন। জিন্নাহ সাহেবের এই সর্বাধারী ভূমিকার উল্লেখ করে এ্যালেন ক্যাম্পবেল জনসন তার “শিশন উইথ মাউট্যাটন” বই-এ লিখেছেন, “এখানে বাস্তবরূপে একজন ডয়ংকর কায়েদে আজমের মধ্যে পাকিস্তানের শাহানশাহ, ক্যাপ্টারবাহীর আর্কবিশপ, স্পীকার এবং প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীভূত হয়েছে।” জিন্নাহ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভাকেই শুধু অকেজো করেননি তিনি আমলা ও সেনাবাহিনীকে মন্ত্রিদের এড়িয়ে সরাসরি তাঁর কাছে রিপোর্ট করতেও উৎসাহিত করেছেন। পূর্ববর্তী ইসব নজির পরবর্তীকালে বৈরেত্তি ও ধৰংসের পথ বিস্তৃত করে। একবার উপরের পদে আসীন হতে পারলে, সামরিক বাহিনীদের একমাত্র আকাঞ্চ্ছা সমস্ত ক্ষমতা হাতে রাখার। এই প্রবৃত্তির কৃতী পুরুষ চৌধুরী মোহাম্মদ আলী—যিনি দেশের প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল ও পরে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন যেমনি উচ্চ ধর্মান্ধ মুসলমান, তেমনি উগ্রবাদী পাঞ্জাবী। তিনিই পাঞ্জাবী আমলাতাত্ত্বিক উত্থানের প্রাথমিক কাঠামো সৃষ্টিতে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছেন। এটাও কম শুরুত্বপূর্ণ নয় যে, বিগত ২০ বছরে, যারা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন—হয় তারা আমলা, পরবর্তীকালে রাজনীতিবিদে ক্রপাঞ্চরিত নতুবা সামরিক বাহিনীর অফিসার। এঁদের একজন প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। দেশের চাকরীর সীতির পদ্ধতিকে এয়নভাবে প্রভাবিত করেছিল। মন্ত্রিসভায়ও তাদের সুযোগ নির্ধারিত ছিল। এসব ক্ষেত্রে আমলাদের অন্যায়ভাবে অনুপ্রবেশকে সরকারী অর্থাত্তাবিক যুক্তি দেখানো হতো অথচ এসব পদ জনপ্রতিনিধিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। শুধু আমলাদের মধ্যেই এইসব প্রতিভাধার ব্যক্তিত্ব পাওয়া যেত—সাড়ে সাত কোটি মানুষ হল প্রতিভাধীন— এই কটাক্ষ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কিন্তু দক্ষ প্রচার মাধ্যমের নিপুণভাবে পরিচালনা করে, পরে আমরা দেখতে পাবো, এই অপমান জনগণ হজম করতে শুধু শিখলোই না বরং এসব পছন্দ করতে লাগলেন।

আমলাতত্ত্বের অবরোহণ সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা ও সামর্থ্যের অনুপাতে বেড়ে চললো। আমলাবর্গ অসহনীয়ভাবে বেপরোয়া হয়ে উঠলো। ১৯৫১ সালে ঢাকা ক্লাবে আমার প্রথম সফরের কথা আমি কখনো ভুলবো না। টমবোলা (বিংগো) অধিবেশন সবে শেষ হয়েছে। ঠিক সে সময় দীর্ঘকাল সুদর্শন এক দম্পত্তি দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, সবকটা চোখ সেদিকে নিমিয়ে ঘুরে গেল। জনৈক ঠাট্টমক ওয়ালা

শিল্পতি সালাম জানাতে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। এ ধরনের উত্তেজনার কারণ জানতে চাইলে একজন বাঙালী সম্পাদক বলেন, “ওহ হো উনি চীফ সেক্রেটারী। মিঃ এবং মিসেস সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে ধূলার পৃথিবীতে নেমে এসেছেন।”

আর একবার করাচীর এক বিলাস বহুল হোটেলে কোটিপতি ভাত্তাচার্য সন্তানদের বিবাহ অনুষ্ঠান করছিলেন (এ ধরনের রাজক্ষম বিবাহ এ সমাজে স্বাভাবিক ঘটনা, কেননা সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে এসব বিবাহে)। সুসজ্জিত মধ্যে দু’জার আমন্ত্রিত বরপক্ষের অতিথিদের খাওয়াচ্ছেন এমন সময় সংবাদ এলো শিল্প সচিব এসেছেন। তখন সেখানে হৈ চৈ পড়ে গেল। একজনের টমটোর জুস গড়িয়ে গেল অন্যদিকে, অন্যদিকে আমন্ত্রণকর্তা তাড়াতাড়ি করে মাননীয় অতিথিকে স্বাগত জানাতে গিয়ে চায়ের কাপ উল্টে দিলেন। হাসির রোল থামলে—এক সময় কানে ফিস ফিস আওয়াজ এলো : “দেখতে পাচ্ছি বাসটার্ডগুলো আর একটা কারখানার জন্য আবেদন করছে।”

আইয়ুব হলের রেঙ্গোরা, জাতীয় পরিষদের অস্ত্রায়ী ভবন হিসেবে পরিচিত, সেখানে জাতীয় পরিষদের সভা-কক্ষের চেয়ে অনেক বেশী আনন্দঘন পরিবেশ ছিল। সব সময় সেখানে লোকের ভৌত থাকতো। কিন্তু আশাতীত হলেও যারা ওখানে বসে থাকতেন তাঁরা সম্মানিত পরিষদ সদস্য নন, সকলেই উচ্চ পদের আমলা। যে ভঙ্গীতে এসব সদস্যরা আরো কফি এবং কেকের জন্য অঙ্গুলি নির্দেশ দিতেন তাতে তাঁদের অবস্থান জানতে সন্দেহ থাকতো। তাঁদের দীনাতা দেখে আমার বন্ধু মানসুর মন্তব্য করলেন, “এই অচৃত লোকদের অর্থের প্রতি দুর্নির্বার চাহিদা রয়েছে, তিনি বছর আগে যখন এঁরা প্রথম পরিষদে এলেন, তখন রিস্ক চড়তেন পোশাক পরিচ্ছন্দও ছিল খুবই সাধারণ। এখন এঁরা টয়োটা চালান, পোশাকেও বাহার এসেছে।”

১৯৪৮ সালে সেক্টেবরে কায়েদে আয়ম যখন মারা গেলেন—নিচের সারির লোকেরা যাঁরা তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন, তাঁরা জিন্নাহ সাহেবের স্বেরাচারী হাবভাব রূপ করে নিতে দিখা করলেন না। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব তাঁর কর্তৃত জাহির করেছেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে আর অন্যদের ছিল স্বার্থপ্রবাতার উদ্দেশ্য। তাঁরা রাজনীতির পাকে জড়িয়ে গেলেন। সমস্যা স্থানীয়ভাবে প্রাদুর্ভূত হল। পাকিস্তান টাইমস-এ তাঁরিক আলীর একটি উদ্ভৃতি থেকে এই অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায় :

“সব সময়ই শাসকশূলী জাতীয় বিষয়াদি বিশেষ নোংরা পর্যায়ে নিয়ে থেকে পেরেছেন এবং সময়ের নিয়মানুবর্তিতা মাফিক সেটা তাঁরা করেছেন। অসংখ্য কাময়ী স্বার্থবাদী মহল থেকে যে চিরকার উঠতো তা জনগণের মুক্তির জন্য নয় বা ন্যূনতম বৃহত্তর গণতন্ত্রের জন্যও নয়—সেটা ছিল বৃহত্তর একনায়কত্বের জন্য।”

এই বিস্তৃত একনায়কত্বের প্রয়োজন ছিল ব্যক্তি ও প্রাদেশিক পর্যায়ে একীভূত

করে আকাঞ্জকা পূরণের জন্য। এ সবের মুখ্য উপাদান ছিল : সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা সংরক্ষণ এবং কৃষি থেকে মোটা আয় আদায়, একচেটিয়া পৃষ্ঠপোষকতা যা থেকে ভাগ্যবানদের অর্থনীতিতে লোডের সামাজিক উপযোগিতা আদায়ের সৌভাগ্য সৃষ্টির অধিকার।

পাঞ্জাবের ছিল উভয় ক্ষেত্রেই খুটির জোরের প্রাবল্য। এখানেই ছিল বৃহত্তম প্রভাবশালী এবং বোধহয় শিক্ষিত ভূম্বামীরা। পাঞ্জাবীদের অনেকেই ছিলেন এই ভূম্বামী পরিবারের বংশধর। আবার এঁরাই ছিলেন সিভিল সার্ভিসের মেরুদণ্ড এবং সামরিক বাহিনীর ক্যাডারভুক্ত উঁচু পদের অফিসার। ব্যক্তিগত পাঞ্জাবী স্বার্থ অবশ্যস্থাবীরূপে অধিকৃত হয়ে দখল বাধতে লাগল। উগ্র পাঞ্জাবী জাতীয়তাবাদী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্ষমতার রাস শক্তভাবে বাঁধতে তৎপর হয়ে উঠলো।

“তারা অন্য কাউকে নিঃখ্বাস নিতে দেবে না।” প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হবার পর আমাকে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে সোহরাওয়ার্দী এ তিক্ত মন্তব্য করেছিলেন। যদি এইসব আকাঞ্জকা অপরিহার্যরূপে বিরোধী হয়ে দাঁড়ালে, তা হত শুধু ব্যক্তি পর্যায়ে। এতে পাঞ্জাবী গোষ্ঠীর মৌলিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতো না কিন্তু মার্শাল আইয়ুব খানের বচত বড়াই করা পরিকল্পনাগুলোসহ পাকিস্তানের ভূমি সংক্রান্ত এক হাস্যকর অনুকরণই হয়ে রইল। কৃষি আয়ের উপর কোন আয়কর কখনো বসানো হয়নি। এমনকি ১৯৭১ সনের জুনের সমস্যাসংকুল বাজেটেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সরকার যথন পূর্ব বাঢ়ায় সামরিক অপারেশন চালাতে শিয়ে এক রকম দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল তথনও কৃষিকর ধর্য করতে পারেনি। অর্থে সাধারণ মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকারী বিধিবিধান, নিয়ন্ত্রণ, পারিষিট এবং উঁচু পর্যায়ের আমলাদের পৃষ্ঠপোষকতা আগের মতোই নিপুণভাবে বোনা ছিল।

উল্লেখযোগ্য, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান উভয়েই যে কয়েকশ’ ঘূর্মখোর আমলাদের ‘চাকুরিচ্যুত করেছিলেন তাঁরা অসং উপার্জন বহাল রাখার অনুমতি পেয়েছিলেন। এঁদেরকে আপনি রাজধানী ইসলামাবাদের ক্লাবে বা সুদূর করাচীর সিঙ্গু ক্লাবে যে কোন দিন গলফ অথবা ব্রীজ খেলায় দেখতে পারেন। এঁদেরকে আপনি দেখবেন পাকিস্তানী সশাজের বাছাই করা লোকদের সঙ্গে, বর্তমান প্রশাসনের সদস্যদের সঙ্গে মত বিনিময় ও হাসির উচ্ছ্঵াসের মধ্যে। অন্যান্য সভা সমাজে সরকারী দুর্নীতিকে খুব কমই এমন উদারভাবে গ্রহণ করতে দেখা যেত।

এই ব্যক্তি আকাঞ্জকা পূরণের বিরোধে সময় সময় রাজনৈতিক হল্লোড়ে নটের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পটের পরিবর্তন হয়নি আর এটা ছিল গণতান্ত্রিক অনুশীলন থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। এ বিষয়টি রেকর্ড করার মতো যে বিগত এগার বছর পাকিস্তানের তথাকথিত সংসদীয় সরকারের সাতজন প্রধানমন্ত্রীকে হয় হিংসাত্মক

উপায়ে নতুবা সামরিক আমলা চক্ৰের আদেশে অপসারণ কৰা হয়েছে। নিৰ্বাচনী পদ্ধতিতে কখনো সরকার পরিবৰ্তন হয়নি। প্রথম প্ৰধানমন্ত্ৰী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান বাওয়ালপিডিৰ এক জনসভায় রহস্যজনকভাৱে নিহত হলেন। এ বিষয়ে আগেই বলেছি, তাৰ নিহত হৰাৰ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কখনো দেয়া হয়নি। সময় সময়ে বলা হয়েছে তিনি পাঞ্জাবী চক্রান্তে নিহত হয়েছেন। এটা সত্য হতেও পাৰে কিংবা নাও হতে পাৰে। তবে এ কথা সঠিক, তাৰ স্পষ্টভাবিণী বিধবা পত্নী বেগম লিয়াকত আলী খান এবং দু'জন প্ৰধানমন্ত্ৰী গুলী চালানোৱ গোলমেলে প্ৰশংগলোৱ উত্তৰ পেতে ব্যৰ্থ হয়েছেন।

খাজা নাজিমুদ্দিন যিনি লিয়াকত আলী খানেৱ হৃলাভিষিক্ত হলেন, তিনিও পাঞ্জাবী গৰ্ভৰ জেনারেল গোলাম মোহাম্মদেৱ দ্বাৰা অপৰাসিত হলেন। পৱৰ্বৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোহাম্মদ আলী বগড়া যিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্ৰে ছিলেন অপৰিচিত, তাকে ওয়াশিংটনেৱ রাষ্ট্ৰদূত পদ থেকে ডেকে এনে রাজকীয়ভাৱে গদিনসীন কৰা হল। পৱে তিনি আমাকে বলেছিলেন, তাৰ ছিল জাৰজতুল্য চাকুৱি। পদ থেকে অপসারণেৱ ভয় দেখিয়ে তাকে দিয়ে তাৰ মন্ত্ৰিসভা পুনৰ্গঠিত কৰানো হয় এবং এই অপমান যেন তাৰ জন্য যথেষ্ট হয়নি ভেবে কয়েকমাস পৱেই আবাৰ রাষ্ট্ৰদূতেৱ পদে ফেৰত পাঠানো হয়। মোহাম্মদ আলী বগড়া কখনো পৱিষদ বিতৰকে পৱাজিত হলনি। একমাত্ৰ তাৰ দলীয় লোকেৱাই তাকে উৎখাত কৰেছেন।

প্ৰাক্তন সেক্রেটাৰী জেনারেল থেকে রাজনীতিবিদ এবং অৰ্থমন্ত্ৰী চৌধুৱী মোহাম্মদ আলী এক সন্তা রাজনীতিৰ চাল মেৰে তাৰই নামধাৰী মিঃ বগড়াৱ উত্তৰাধিকাৰী হলেন। মুসলিম লীগ পৱিষদ পার্টি মিথ্যা কথাৰ ফোদে ফেলে তাকে দলনেতা নিৰ্বাচিত কৰলেন এই ভেবে যে তিনি বিৰোধী দল আওয়ামী লীগেৱ নেতা সোহৱাওয়াদীৰ সঙ্গে শীঘ্ৰই আলোচনায় বসবনে এবং একটি কোয়ালিশন সৱকার গঠন কৰবেন। সোহৱাওয়াদী সেই মহান মুহূৰ্তেৱ জন্য অধীৰ অঘৰে অপেক্ষা কৰছিলেন। চৌধুৱী মোহাম্মদ আলী তখন গৰ্ভৰ জেনারেল হাউসে পৌছে গেছেন এবং প্ৰেসিডেন্ট ইসকান্দাৰ মিৰ্জাৰ কাছে প্ৰধানমন্ত্ৰী রূপে শপথ নিয়েছেন। তিনি তখন পাকিস্তানকে প্ৰথম শাসনতত্ত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। বাঙালীদেৱ কাছ থেকে জোৱ কৰে আদায় কৰা এক রাজনৈতিক রফাফ ভিত্তিতে এৱ খসড়া প্ৰণীত হয়। পৱৰ্বৰ্তী চৌদ বছৰ পূৰ্ব বাংলা প্ৰতিনিধিত্বেৱ এই কৃৎসিত সংখ্যাসাম্য বা প্যারেটি ফৰ্মুলাকে তীব্ৰভাৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰেছে।

যদিও চৌধুৱী মোহাম্মদ আলী একজন অন্তৰ্গোষ্ঠীয় সদস্য তবু সহকৰ্মীদেৱ কাছে উচ্চাভিলাসী হিসাবে তিনি প্ৰমাণিত হলেন। তাৰা ভাবলেন, তাদেৱ অবস্থান একজন সৰ্বাঞ্চক ক্ষমতা লাভেছুকেৱ দ্বাৰা বিপদ সংকুল হতে পাৰে। সেইজন্যেই তাকে জোৱ কৰে অপসারিত কৰে তাৰা সোহৱাওয়াদীৰ পক্ষে আনুগত্য দেখালেন।

ইতিমধ্যে সোহরাওয়ার্দী প্রেসিডেন্ট মীর্জা ও সামরিক বাহিনীর সংগে ঐকমত্যে পৌছে গেছেন। পরিষদে সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী লীগের সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব ছিল। সেইজন্যে তিনি প্রেসিডেন্ট মীর্জার খেয়ালের হাতে বন্দী হলেন। যখনই তিনি তাঁর অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন তখনই অভ্যন্তরীণে পায়ের তলার গালিচা সরিয়ে নেওয়া হয়। এবাবে বোঝের একজন ব্যক্তিটার আই, আই, চুল্লিগড় 'ম্যাড হেটোরস' নাচে কিংবা উন্মুক্ত নাচে যোগ দিতে এলেন। আরেকজন মাত্র চল্লিশ দিন ক্ষমতায় থেকে মালিক ফিরোজ খান নুনের জন্য পথ করে দিলেন।

এই পাঞ্জাবী সামগ্র্য ভৃস্থামী পূর্ব বাংলার গভর্নর হিসেবে ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক অবস্থায় আনাড়ীর মত এই জটিল বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে তাঁর সুনামের মথেষ্ট ক্ষতি করেছেন। কিন্তু সে সব ভূলে গিয়ে ১৯৫৭ সালে শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক ফায়দা লুটিবার প্রয়োজনে আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন। ফিরোজ নুনকে প্রধানমন্ত্রীর পদে ডাকা হলে খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠলেন। যদিও লেডি ডিকারননেসা নুন(ভিকি)-এর আশঁকা ছিল গুরুতর। তাঁর স্বামী শপথ নেবার এক ঘন্টা পূর্বে আমাকে বলেছিলেন, “এসব বড় চাকুরীর বাপাপেরে আমি সব সময় বড় উদ্বিগ্ন থাকি, এগুলোর সব সময় দুঃখজনক পরিণতিই ঘটে। আমি আশা করি এবাব হয়তো তা হবে না।”

এই ভদ্র মহিলার অনুমান সঠিক হ'ল। আবাব বিদ্যুৎ বালসে উঠলো—এবাব কেবল নুনের ব্যক্তিগত পরাজয় নয় এবাব ঘটলো জাতীয় দুর্যোগ। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবৰ বহু প্রতীক্ষিত সাধারণ নির্বাচনের ছয় মাসেরও কম সময়ের আগে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় পরিষদকে পদাবাতে উল্টে দিয়ে প্রকাশ্যে বৈরাগ্য যুগের প্রতিষ্ঠা করলেন। অবশেষে ঘাপটি মারা দানব বৃহ থেকে বের হয়ে এল। এই ধরনের রাজনৈতিক বিকাশ, পরিশেষে এই ধরনের সর্বনাশই ডেকে আনে তা' প্রমাণিত হল। এমনকি পাকিস্তানী গণতন্ত্রের ভঙাচি যা বছরের পর বছর টিকে ছিল সেটুকু শেষ করে দিয়ে, সামরিক আমলাতান্ত্রিক চক্র জনগণকে তার শোষকের মুখোয়াখি দাঁড় করাল।

পরবর্তী দশ বছর পাকিস্তানকে এক নির্দয় শাসনে শাসিত হতে হল। লড় একটিনের উকি উপস্থাপন-এর আগে খুব কমই থাকলো না। দাসত্ব, মোসাহেবি এবং মুমের নানাবিধ সংক্ষরণ জাতীয় জীবনের দৈনন্দিন হালচালের প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সত্ত্বিকার রাজনৈতিক পেশাগত, ব্যবসা ও আমলাতান্ত্রিক সাফল্য ধারণাতীত হয়ে যাবে—যদি না সঠিক স্থানে প্রয়োজনীয় মাখন মাখান হয়। ‘প্রতু তোষণ ও তৈল মর্দন’ অতীতে জনগণ এ ধরনের অপমানকর পরিস্থিতিতে কখনোই ছিল না।

এই হলো পাকিস্তানের ‘গণতান্ত্রিক’ ঐতিহ্যের স্বচ্ছ নমুনা।

## এক ‘নব সূচনা’

প্রিয় দেশবাসী, আমি আপনাদের কাছে এটা খোলসা করে বলতে চাই যে  
সাধারণিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া আমার  
আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান  
২৬ মার্চ, ১৯৬৯।

১৯৬৯ সনের ২৬ মার্চ সকালে পাকিস্তান এক নতুন যাত্রার শুরুতে জেগে উঠলো—  
নিদেনপক্ষে সকলেই সেরকম আশা করেছিলেন। কয়েক ঘন্টা পূর্বে ফিল্ড মার্শাল  
মোহাম্মদ আইয়ুব খান, কুটিল স্বৈরাচারী, যিনি তাঁর সর্বাস্তুক উপস্থিতি দিয়ে জাতীয়  
জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন, দেশের জনগণের নজরবিহীন গণঅভ্যুত্থানে  
তিনি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। সেই ঘটনার ইতিহাস-এখন এমনিতেই একখনে পরিণত  
হয়েছে। এ সমস্কে অন্তর বলা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহে এই ঘটনা অনেক  
গ্রহের বিষয়বস্তু হয়ে থাকবে। আমার উদ্দেশ্য এখানে ফ্লাফলের উপর আলোকপাত  
করা। বিগত বাইশ বছর ধরে পাঞ্জাবী অধিকৃত আমলা-সামরিক চক্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষা  
চরিতার্থের জন্য হাস্যকর যে রাজনৈতিক অবকাঠামো পাকিস্তানে গড়ে উঠেছিল,  
তার সম্যক চিত্র এখনে তুলে ধরা।

এই নড়বড়ে অবস্থা যতই গতানুগতিক ও নিরস শোনাক তবু পাকিস্তানীদের  
এক অদম্নীয় আনন্দলনের ভ্যাংকর বিজয়ে নতুনভাবে রক্ষা পাওয়াকে সাহসী পৃথিবী  
নতুন আশার সঞ্চার বলে মনে করেছিল। এটা ছিল জনগণের বর্তমানকালের মহসূম  
বিজয়। এতে তাদের আনন্দ প্রকাশ অস্বাভাবিক কিছু নয়। পক্ষান্তরে, শক্ত বুননের  
শাসকশ্রেণীর জন্য ভ্যাংকর দুর্ঘটনা জেনে নিল। তাঁরা এখন পিছু হটেছেন। এই  
দুয়োর মধ্যে জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাসনা নিয়ে দাঁড়িয়ে  
আছেন। পাকিস্তানের সবকটি চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই চৰম দিনের  
বিকেলে করাচীর জিমখানা বিশেষতঃ সিঙ্গু ক্লাবের খাবার ঘর ও লাউঞ্জে স্বাভাবিকের  
চেয়ে জনগণের ভৌড় ছিল বেশী। এদের মধ্যে মিল গালিক, ব্যবসায়ী, অফিসার এবং

দালালদের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে গুলজার করতে দেখা গেল। অনেকে জেনারেল ইয়াহিয়ার যোগাতা নিয়ে অনেক কথাবার্তা বললেন। একজন গুজব ছড়ালো যে জেনারেল ইয়াহিয়ার ব্যক্তিগত ফাইল, অপসারিত ফিল্ড মার্শালের চেয়ে তিনি বেশী বৃদ্ধিমান হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। বড় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের মুখে তার উন্নত জীবনের প্রতি আকর্ষণের কথা উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠল। বিগত বিশ বছর তারা এই সূত্রের উপর নির্ভর করে প্রতিটি মানুষের মূলা আছে জেনেছে। ইচ্ছা করেই তারা এসবের মূল্য দিয়েছে—আবার অনেকবার খেসারতও দিয়েছে। এ স্বত্বাব পরিবর্তন হবার নয়—তাহাড়া এসবের কারণও নেই।

এইসব বনোৎসবে শিয়ালদের ধূর্ত্বা ও লেগে থাকার ধৈর্য এদেরকে সিংহের চেয়ে বেশী সম্মান সংগ্রহের সুযোগ দিয়েছে। কেননা বেসামরিক ও সামরিক আমলাচক্রের অর্থলোভের প্রতি এদের অচেল বিশ্বাস ছিল। পাকিস্তানের ভাগোর এই নব মুহূর্তে এদের একমাত্র প্রচেষ্টা, বাজারে এসব কথা চালু ছিল। নতুন সামরিক কর্তৃত্বের তথা সামরিক হেড কোর্যাটোরের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, লাইন লাগানোর পথ বের করা। এটাই হল সাফল্যের সংক্ষিপ্ত পথ। সেজন্য এরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত গুঁজে, টমেটো রসে গলা ভিজিয়ে এবং পানীয়-মদ কিনে চারিদিকের খবরাখবর সংগ্রহ করেছে। এদের একজন মন্তব্য করে বললো “আলীবাবা ভেগেছে চল্লিশ চোর ত আর যায়নি।”

যখন এটা জানাজানি হল, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ছেলে এক আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানীর ‘জুনিয়র এক্সজিকিউটিভ’ তখন একজন মক্কেল নীচু স্বরে তার খোজাকে নির্দেশ দিয়েছে : যে কোন মূল্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করো। পরে ফাঁস হয়ে গেলে যে পূর্বসূরীর মত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ছেলের নিশ্চিত আশ্রয়ে ধরা দেননি। সেই অন্দুলোকটি (আইয়ুব খানের পুত্র) বার মাসের মধ্যে ক্যাপ্টেন পদ থেকে অবসর নিয়ে শিল্পের ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁর ছেলেকে এসব বড় ব্যবসায়ীদের খপ্পার থেকে দূরে সরিয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠালেন। যা হোক এদের মধ্যে নতুন টোপ পাওয়া যাবে—আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে যারা সম্প্রতি বেশ প্রাধান্য পেয়েছে এদেরকে। ছয় মাসের অভ্যুত্থানের ঘটনা যা, পুলিশের নৃশংসতা বা সামরিক বাহিনীর বুলেট শুরু করতে পারেনি। সরকার পরিচালনায় জনগণের বৃহত্তর অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলো। ১৯৫৮ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র ছেঁটে ফেলা ঠিক হয়নি এখন স্বীকার করা হচ্ছে। এই ভুলই এখন জনগণকে প্রকৃত শোষকের মুখোয়াখি এনে দাঁড় করিয়েছে। অতএব এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যতক্ষণ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে তুলে না নেয়া হয, ততক্ষণ জনগণের সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবি যে কোন রকমফের ভাবে মেনে নিতে হবে। এমত পরিস্থিতিতে, সাধারণ নির্বাচনকে

অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান হল। অত্যধিক ব্যস্তবাগীশ রাজনীতিকদেরও ধারণা এইরূপ। যখন সবকিছু বলা ও করা হয়ে যাবে তখন তারা যয়দানের ঘোড়া হয়ে উঠবেন।

কয়েক ঘন্টা পরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জাতির উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ রেডিও ভাষণে জনগণের দাবির সুরাটি অনুরাগিত হয়েছে :

সামরিক আইন জারির পেছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষা করা এবং প্রশাসনকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে আমার প্রথম এবং মূখ্য কাজ হল জনগণের পছন্দমত শাসন ব্যবস্থায় স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা, নিরপেক্ষতা ও নিচয়তার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা। আমাদের যথেষ্ট প্রশাসনিক শৈথিল্য ও বিশ্বব্লা রয়েছে। আমি এসব দেখবো, যেন এসবের পুনঃস্থিতি না ঘটে। প্রশাসনের প্রত্যেক সদস্যকে এই গুরুতর বিষয়ে সাবধানবাণী জানিয়ে দিচ্ছি।

### প্রিয় দেশবাসী,

আমি আপনাদের কাছে খোলসা করে বরতে চাই যে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া আমার আর কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুস্থ, পরিচ্ছন্ন এবং সৎ প্রশাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু গঠনমূলক রাজনৈতিক জীবন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পূর্বশর্ত। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব হবে দেশকে একটি কার্যকরী শাসনতন্ত্র দেয়া এবং অন্যান্য সব রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো যা জনমন বিক্ষুর্ক করে আসছে সে সবের সমাধান খুঁজে বের করা।

প্রেসিডেন্টের এসব কথায় জনগণের আশানুরূপ সাড়া মিললো। দেশের সংবাদপত্রগুলো, যারা বহু দিন ধরে সোচার ভূমিকা পালন করছিলেন, তাঁরাও তাৎক্ষণিকভাবে 'নব আণকর্তা'র 'দেশপ্রেমিক সামরিক বাহিনী'র এবং 'জনগণের বিজয়' উন্নাসে ফেটে পড়লেন। সংবাদপত্রের কলামে বিভিন্ন মহলের উন্নতিপ্রশংসন বান ডেকে গেলো। বিশেষতঃ আইয়ুবের তদানীন্তন রাজনৈতিক সহকর্মী, ব্যবসায়ী, শ্রমিক নেতা, প্রেশাধারী ছাত্র-এমনকি শিল্পী ও লেখকেরা, যাঁরা এতদিন হিসেবীর মত চূপ করে ছিলেন—তাঁরাও প্রশংসন ও স্তুতিতে উদ্বাহ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁরা এখন পরাজিত নেতার কাটা-ছেঁড়া করাতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এসব কথা একজনের জন্য যথেষ্ট। এসব বর্ণনার দৃশ্যাবলী এতই অপমানজনক ছিল যে নতুন শাসকগোষ্ঠীকে তা বক্সের নির্দেশ জারী করতে হলো। যদিও তা জনগণের ইঙ্গিত ছিল। সেইজন্য তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে পত্রিকার সম্পাদকের কাছে বার্তা পাঠান হলোঃ

‘কোন ব্যক্তিচরিত্র হনন নয়, গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে, রচিতাইন একশেষেমি আর নয়, শুধু সমানিত নেতৃত্বস্থের বক্তব্য ছাপানো যাবে, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের কৃৎসা ছাপা যাবে না।

যদিও তাদের প্রচলিত প্রশংসা করা অস্বীকৃত হল তবু পত্রিকাগুলোর সমালোচনা করার যথেষ্ট প্রসঙ্গ ছিল। যাহোক, নতুন প্রেসিডেন্ট জনগণের দাবির প্রতি বেশ ভালভাবেই সাড়া দিয়েছেন। পরোক্ষ প্রতিনিধিত্ব নির্ভর আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট-স্টাইল সংবিধান ছেঁটে দিতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটার্থিকারের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। ধিকৃত আমলাত্ত্বের উপর ঝাপিয়ে পড়তে হবে। প্রেসিডেন্টের ভাষণের সব কিছুতে শুধু সৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়নি। সামনের মাসগুলোতে দৃঃঘের সঙ্গে সেটাই আবিকৃত হ'ল। কিন্তু সে সময় চরম নিন্দুকও জনগণের প্রশংসন মনোভাব দেখে চুপ করে গিয়েছিল। তবে সদিচ্ছার পরীক্ষা এত তাড়াতাড়ি করা হয়নি। এই নতুন নেতৃত্বকে সন্দেহাত্মীয় ভাবার সময় দিতে হবে।

এই উচ্ছাসের মধ্যে জনগণ জানতেই পারল না যে তাদের গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম অনেক দূর চলে যাচ্ছে। তারা বস্তুত একটি বড় যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। আইয়ুব খান তার অফিসার ও রাজনীতির সাগরেদদের সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ ত অন্য ব্যাপার।

দেশের ক্ষমতা এখনো সামরিক বাহিনী ও তাদের উপদেষ্টাদের হাতেই রয়ে গেছে। স্বীকার করতে হয়, পুরনো গার্ড পরিবর্তন হয়েছে—নতুনকে জনগণের দাবির প্রতি সাড়া দিতেই হবে। কিন্তু তারা একই শ্রেণীস্বার্থ থেকে উদ্ভূত এটা তো অস্বীকার করা যায় নাম। প্রকৃত অর্থে ১৯৪৮ সনে কায়েদে আয়মের মৃত্যুর পর থেকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে, মিউজিক্যাল চেয়ারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহমান এটা তার এক অন্য রূপ। যারা এ বিষয়ে পক্ষপাতশূন্য মূল্যায়ন করার শ্রম গ্রহণ করেছেন, তাদের জন্য এটা গভীর চিঞ্চার কারণ হয়েছে।

বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এমনকি রাজনীতিকরাও এই বিজয়ে বুঁদ হয়ে পড়ছিলেন। তাদের জন্য এটা বাস্তব হল যে, আইয়ুব খানকে উৎখাত করা হয়েছে—এবং ইয়াহিয়া খান নব সূচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারা এটা ভাবতে ভুলে গেলেন যে, নতুন প্রেসিডেন্ট কেবল শৈরাচারী সামরিক নেতৃত্বের ঐতিহ্যগতভাবে প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র। যেমন—সারা বিশ্বের একমায়ক সামরিক নেতৃত্ব করে থাকেন। এবং বিশ্বজনীনভাবেই এরা প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকেন। এটা কিন্তু প্রথম বারের মতো নয়, পাকিস্তানী জনগণ আত্মসন্তুষ্টিতে নিজেদেরকে বোকা বানাল।

১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের দেয়া ওয়াদা কি আন্তরিক

ছিল? গত আড়াই বছরে দেশের রাজনীতিতে এই একটি প্রশ্নের উত্তর বিপর্যস্ত হয়েছে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের পতনের অন্যান্য কারণগুলোর মধ্যে প্রধান কারণ। যারা প্রেসিডেন্টের সাথে ইতিমধ্যে সাক্ষাৎ করেছেন তাঁরা সকলেই তাঁর কঠোর, স্পষ্টভাষিতা, সামরিক অন্ধৌরীকার্য মনোহারিত্ব গুণে আকর্ষিত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন বিদেশী সাংবাদিক, বৃটিশ পার্লামেন্ট সদস্য, কূটনীতিকবৃন্দ এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। তাঁরা প্রেসিডেন্টের সদিছা সম্বন্ধে কোন ভুল ধারণা পোষণ করেননি। যখন এঁরা দেশের ভয়ংকর বাস্তবের সম্মুখীন হন তখনও এঁরা ইয়াহিয়া খানের ক্রটিগুলোকে তাঁর অনুচরদের ক্রটি বলে বাতিল করেছেন এবং তাঁকে কেবল অঙ্গতার এবং তাঁর ম্যাকিয়াভেলি কর্মচারীদের উপর অন্ধ বিশ্বাস রাখার অপরাধে অপরাধী করেন। হয়ত এর মধ্যে সত্য থাকবে কিন্তু ঘটনা সম্পূর্ণ মূল্যায়ন করলে তাঁর রাজনীতির অঙ্গতাই প্রমাণিত হয়। তিনি যে সামরিক প্রতিষ্ঠানিকের পূর্ণ আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন এটা কিন্তু ঔৎসুক্যের সঙ্গে অস্বীকৃত হয়।

প্রেসিডেন্টের উন্নত জীবনের প্রতি আকর্ষণ এবং সহকারী স্টাফ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে একজন বিশ্বনিন্দুক বর্ণনা দিয়েছেন যে, প্রতিদিন একখানা কমিক বই, তৈরী করা হত—সেটাতে তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন—এবং এগুলোই তাকে বিপথগামী করেছে। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কর্তৃতৃ সব সময়ে ছিল। একমাত্র তিনিই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাঁর উপদেষ্টারা তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করে থাকবেন, তবে তাদের ভূমিকা ছিল গৌণ। এটা যুক্তিহীন ছিল না যে তিনি জনসমক্ষে প্রায়ই নিজেকে সেনাবাহিনীর প্রধান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দিতেন।

তাঁর কথামত স্টাফদের কাজকর্ম এবং গোলমালের প্রতি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর স্বাভাবিক উদাসীনতা, এটা বলা চলে না। তিনি দেশের সব কাজের প্রতিই গভীর নজর রাখতেন। এটা তিনি করাতেন নিজস্ব সংবাদদাতা ও গোয়েন্দা বিভাগের জটিল নেট ওয়ার্কের মধ্য থেকেই। তাঁরা প্রেসিডেন্টকে বাস্তিগতভাবে রিপোর্ট করতেন। যদিও তারা প্রধান বিষয়গুলো যেমন নির্বাচন সম্বন্ধে ভুল তথ্য দিয়েছেন বা মূল্যায়নে ক্রটি ঘটায় এটা হয়েছে—তা ঠিক নয়। এটা তাঁদের ঘটনাকে প্রভাবিত করতে না পারার ক্রটি। সেনাপতি হিসেবে জেনারেল ইয়াহিয়া খান তাঁর কঠিন মুঠিতে দেশের ক্ষমতা ধরে রেখেছেন। উচ্চ পদে পদোন্নতি, সিনিয়র পদে নিয়োগ, সামরিক লো এবং বিমান বাহিনীর ইউনিটগুলোর চলাচল তাঁর অনুমতিক্রমে ও জানামতেই হতো। তিনি সামরিক বাহিনীকে শাসন করতেন এবং তাদের মাধ্যমেই দেশ শাসন করতেন।

আন্তরিকতার কথায় ফিরে আসি, ১৯৬৯ সনে ২৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান

তিনটি ওয়াদা করেছিলেন, সেগুলো ছিল : দুর্নীতি ও অদক্ষ প্রশাসনকে পরিচ্ছন্ন করা; পুনরায় ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা; এবং জন প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। আমার ব্যক্তিগত ধারণা হল এই যে, তিনি প্রথম দুটি ওয়াদার প্রতি মনোযোগী ছিলেন। তিনি আইয়ুব খানের খৎসের কারণগুলোর প্রতি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। সেসব সাম্প্রতিক রাজনীতিক মহাবিপ্লব অভিনীত হয়েছে। কিন্তু তিনি তৃতীয় ওয়াদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য বলেননি। তিনি রাজনৈতিক সংক্ষার করতে গিয়ে প্রশাসনের পরিচ্ছন্নতা করে সত্য বলতে একটি বড় কাজ করেছেন। বেসামরিক ও সামরিক তদন্তকারী এজেন্সীগুলো নোংরা তুলতে গর্ত করতে শুরু করলো। এবং সমুচ্চিত প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা গর্ত খুঁড়েছিল। আমার মনে আছে, একজন নৌ-বাহিনীর গোয়েন্দা অফিসার আমাকে বলেছিলেন : কতগুলো নোংরা ইঁদুর না সরিয়ে একখানা পাথর সরাতে পারবেন না।' সমাজে প্রতিষ্ঠিত একজন নৌ-বাহিনীর অফিসারের উল্লেখ করে, তিনি বললেন ঐ অফিসারের ড্রিসিয়ার অভিযোগপত্র ছাদ ছুই ছুই হয়েছে এবং এখনো জমা হচ্ছে।"

কিন্তু এ সকল ভাল কাজগুলো আসার পরিগণিত হলো যখন বর্তমান শাসনচক্র বুরাতে পারলেন যে, আইয়ুব খানের 'সংক্ষারের দশকে' দুর্নীতি এমন এক দৃষ্টান্তের শিখরে পৌঁছেছে, সহজভাবে পরিচ্ছন্ন করতে গেলে সকল বেসামরিক প্রশাসন ও সামরিক প্রতিষ্ঠানের বৃহস্তু অংশকেই বাদ দিয়ে দিতে হয়। সেজন্য সিদ্ধান্ত হয়, শুধু বেসামরিক প্রশাসনের দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছে তাদের বিকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ সীমাবদ্ধ রাখা হবে। সেই অনুযায়ী ৩০৩ জন আমলাকে অপসারণ করা হল। (অপসারিত আমলাদের সংখ্যা সামরিক রাইফেলের বোরের সাথে তুল্য হওয়ায় রাজনৈতিক বাঙ চিত্র শিল্পীদের প্রচুর আনন্দের খোরাক যোগায়)।

সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে এমন কি প্রভাবশালী নৌ-বাহিনী অফিসারদের স্পর্শ করা হল না—তারা নিশ্চিত আনন্দে সময় কাটাতে লাগলেন। এই দুর্নীতির বিষয়ে এভাবে রফা হবার পর ইয়াহিয়া খান যে আইয়ুব আমলের শেষের দিকে দুর্নীতি ঠিক যতটা প্রাদুর্ভূত হয়েছিল ততটা না হওয়া পর্যন্ত চোখ বুজে থাকবেন এটা অবশ্যাভাবী হয়ে পড়েছিল। তাঁর প্রথম প্রতিশ্ৰূতি রক্ষার এই হল নয়না।

সাধারণ নির্বাচন সম্বন্ধে বলতে হয় যে, গত ছ'মাসের ঘটনাবলী সরকারের প্রশাসনিক আমূল পরিবর্তনের জন্য বাহ্যিকভাবে পদ্ধতির সংক্ষারের ন্যূনতম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ১৯৫৮ সনের তথাকথিত সংসদীয় সরকারের বাতিল করাটা মারাঞ্জক ভূল হয়েছে। গণতন্ত্রের ভূমিকা আর কিছু না করক, জনগণের আবেগ সম্মতিতে এবং জনপ্রতিনিধি সম্বন্ধে যিথ্যা ধারণা দিতে পেরেছিল। এই অপসারণের ফলে জনগণকে তার প্রকৃত শোষকের মুখোযুথি দাঁড় করাল। অতএব

নতুন শাসকচক্র স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন যে, কোন রকমের একটি সংসদীয় পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন করতেই হবে এবং জনগণের দৈনন্দিন বিষয়ে বক্তুনিষ্ঠ বক্তব্য দেবার অধিকার দিতে হবে। ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মত পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য তা করতে হবে। দেশের ২৩ বছরের জীবনে কোন সাধারণ নির্বাচন না হওয়াটাকে জনগণ আভাবিকভাবে এইল করেনি। সরকারের জন্য এটা ছিল দুর্ঘাত সমস্যা সৃষ্টির একটি শক্তিশালী উৎস। কাজেই ইয়াহিয়া খান ধূর্তরার সঙ্গে নির্বাচন দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমি তাঁর এ ব্যাপারে আন্তরিকতায় বিশ্বাসী ছিলাম।

কিন্তু তাঁর প্রদত্ত তৃতীয় প্রতিশ্রূতি, জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। এক্ষেত্রে আমি নিশ্চিত যে প্রেসিডেন্ট কোন ক্রমেই তার বক্তব্যের সঙ্গে আন্তরিক ছিলেন না।

ইয়াহিয়া খান সম্ভবত অন্যদের চেয়ে ভালভাবেই জানতেন যে, সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় থাকার জন্য এসেছে এবং সেগতভাবে তাকে তার অবস্থান সুদৃঢ় করতে হবে। কার্যতঃ তাঁর সকল কর্মসূচী সেভাবেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েছিল। তিনি পৃষ্ঠপোষকতায় উদার এবং মহানূভবতার সাথে রাজনৈতিক পোশাক বদল করবেন ও আনুষ্ঠানিকভাবে যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন তাঁদের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করবেন কিন্তু তিনি ক্ষমতাচ্যুত হবেন না। আমি এ ব্যাপারে আমার সহকর্মীদের সাবধান করেছি এমনকি বাজী ধরতেও রাজী যদি আমাকে দেশত্যাগ করতে না হয়। ঘটনাবলী এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সত্যিকারভাবে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা প্রেসিডেন্টের কোন ইচ্ছা ছিল না। শুধু বেসায়রিক সরকারের কাছে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করে নেপথ্যে সামরিক পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতার চাবুক হাতে নিয়ে তিনিই ক্ষমতায় থাকবেন।

তাঁর এই কৌশল সম্বন্ধে আমার একজন সামরিক বন্ধু বললেন, “ইয়াহিয়া খান নির্বোধ নন। তিনি সংখ্যাম না করে নির্বিশ্বে সংকট চালাবেন। তার একাজের জন্য তিনি বেশ কিছু গাধাও সংগ্রহ করবেন। আপনি দেখে নেবেন, এসবের নাচের ব্যবস্থাও তাঁকে করতে দেখবেন।” এটা ছিল ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসের কথা। এ সময়ের মধ্যে চমক ভাঁতে শুরু করেছে—কিছু লোকের কাছে প্রভাতী আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো—কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলোতে তাদের সংসদ ও জনপ্রিয় সরকার গঠিত হলেও—সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা ইয়াহিয়া খান ও তাঁর সামরিক চক্রের হাতেই থেকে যাবে।

এই কাঠামো মোতাবেক না হলে কোন সংবিধানই তাঁদের কাছে ঘৃণযোগ্য হবে না। নির্বরযোগ্য সূত্রে আমি জেনেছি, রাওয়ালপিণ্ডির সামরিক বাহিনীর হেড

কোয়ার্টারে প্রথম থেকেই এ ধরনের একটি সময়োত্তা হয়ে আছে। 'জাতীয় স্বার্থ' এটা ছিল যথারীতি অজুহাত ।

প্রেসিডেন্ট এ ধরনের বিধানের আবশ্যিকতা এবং তাঁর এই পদের পূর্বসূরীদের পরার্থতা ধার করে নিজের বিবেকের কাছে যথার্থতা বোঝাতে পারতেন। বাইশ বছর ধরে ক্রমাগত জনগণের কানে ঢোকানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে রাজনীতিকরা অবিশ্বাসী। সামরিক বাহিনী জনগণকে তাদের বাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার করার যে কোন সংবিধানের চেয়েও তাদের ঐতিহ্যগত মহত্তর দায়িত্ব রয়েছে। কালো যে কালোই তা কুচকুচে কালো না হলেও সময়ে এমনকি কলংক প্রণেতারাও এসবে বিশ্বাস করতে লাগল। ইয়াহিয়া খান এই কুটিল সমাজের অপরিশীলিত পণ্য, তিনিও এ ধরনের কুচকানো মানসিকতা মুক্ত ছিলেন না। সুতরাং যখন তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের ওয়াদা করেছিলেন তখন তিনি গ্রহণীয় সংরক্ষণগুলো ধরে নিয়েই ক্ষমতা হস্তান্তর বুঝেছিলেন। দৃশ্যতঃ এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্রটি ছিল অন্যত্র ।

জাতির কাছে ওয়াদা করেছিলেন তিনি, যেহেতু ওসব ওয়াদা করতেই হয়, না হলে নতুন শাসকচক্রের স্থায়িত্ব যে দীর্ঘ হয় না। পরে অবশ্য যথেষ্ট সময় পেয়েছে এসবের অর্থের যথার্থ আচ্ছাদন দিতে। এ ভাবেই 'নব সূচনা'র পুরাতন প্রত্যাবর্তন হ'ল। অন্য আরেকটি বিশ্বাসঘাতকতা ঠিক পা বাড়ানোর দ্রব্যত্বেই রয়েছে।

## নির্বাচন-পূর্ব টালবাহানা

পঞ্চিম বা পূর্ব পাকিস্তানের কোন একক দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে আবির্ভাবের  
সম্ভাবনা নেই।

পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের একক দলভুক্ত হয়ে মুখোয়াখি হবার প্রশ্নই নেই,  
যদি তা ঘটে তা হলে এর পরিণতি হবে পাকিস্তানের বিলুপ্তি।

ফ্রেন্সের জি. ডাল্টন, চৌধুরী

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের শাসনতাত্ত্বিক বেসরকারী উপদেষ্টা

লক্ষ্মন, ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০।

শুরু থেকে যাই ঘটে থাকুক, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ওয়াদা মোতাবেক জনগণের  
কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর বা পদ ছেড়ে দেবার কোন ইচ্ছাই তিনি পোষণ করেননি।  
এপ্রিল ১৯৬৯ সালে প্রশ্ন ছিল জনমনে আঘাত না হেনে কীভাবে মতলব হাসিল করা  
যায়। আইয়ুব খানের পতন থেকে এ শিক্ষা গভীরভাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।  
শ্বেতত্ত্বের জন্মালগ্নে তার রূপ জাহির করা হবে না। সাধারণ নির্বাচন যতই অগ্রিম  
হোক, তবু তা প্রয়োজনীয় কারণে গিলতে হবে। দেশ নির্বাচন অঙ্গীকৃতি আর মেনে  
নেবে না। কিংবা বিগত নির্বাচনগুলোর মত প্রহসনের পুনরাবৃত্তি আর গহণ করবে  
না। এ ব্যাপারে এটা মুখ্য হয়ে দাঁড়াল যে জনগণের প্রতি ন্যায় বিচার করা হচ্ছে তা  
বোঝাতে হবে।

সুতরাং প্রেসিডেন্টের দৃশ্যাতঙ্গ এটা মনঃপুত হল যে সামনে গণতন্ত্রের বিভাগিকর  
ক্ষেপের নেপথ্যে ক্ষমতা ধরে রাখবার ছদ্মবেশের নৈপুণ্য, এবারের কৌশল বলে ঠিক  
করা হল। এটা জনপ্রতিবাদ ও শাসকচক্রের প্রয়োজনীয় বৈধতা দিতে নিরোধ (বাটার)।  
হিসেবে কাজ করবে। ক্ষমতা অধিগ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইয়াহিয়া খান  
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাথা ঘামাতে (তেজারতি) শুরু করলেন।  
রাজনৈতিক সূক্ষ্ম বিচারশক্তি দিয়ে তিনি ব্যবস্থা নিলেন। তিনি এক চতুর পরিকল্পনা  
শীঘ্র বের করলেন, যা জনগণের অনুমোদন অর্জনে এবং কার্যতঃ ক্ষমতা তার হাতের  
মুঠোয় থাকার নিষ্ঠয়তা দেবে।

এটা ছিল বিশ্বয়কর এবং সহজ সূত্র। বাস্তব ক্ষেত্রে এটা শীকার করতে হলো।

যে, জনসংখ্যাগের কারণেই নির্বাচনের ফলাফল শাসকচক্র বিকৃত করতে পারলো না। সেই কারণে শাসকগোষ্ঠী শাসনত্বের কাঠামো আগেই ঠিক করে দেবেন যাতে ইয়াহিয়া খানের নিজের অবস্থানে কোন স্পষ্টই লাগবে না। ব্যাপারটা দাঁড়ালো, ভোজ পর্ব শেষ হওয়ার পরে খাসী জবাই দেওয়ার মত, যা কেউ কখনো আশা করে না।

পরিকল্পনাটা জনগণকে ধোকা দেওয়ার মোক্ষ চেষ্টা। স্থানীয় রাজনৈতিক মতভেদ ও নেতৃত্বদের মধ্যে অত্যর্দম্ব সৃষ্টি করতে বাধ্য করা। ইয়াহিয়া খানের এটা বক্ষগুল ধারণা ছিল যে, নির্বাচন মন্ডলীদের মত প্রকাশে পূর্ণ সুযোগ দিলেও একটি দলের ছদ্মছায়ায় তারা ঐক্যবন্ধ হতে পারবে না। বরঞ্চ এদের পরিষদের বিপরীতমুখীদের ব্যাপক হারে ভোট দেবে। যাদেরকে পরবর্তীকালে যথেচ্ছ ব্যবহার করে উদ্দেশ্য হাসিল করা সহজ হবে। তাহলেই তিনি পারাম্পরিক মৌলিকের অভাব দেখিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে সংবিধান তৈরী করতে পারবেন। তিনি যদি এই অনিচ্ছায়তাকে নিশ্চিতকরণ করতে পারেন তাহলে তিনি সুস্থিতাবে ক্ষমতার শীর্ষে থাকবেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খানের এই আঘাতপ্রত্যয়ী হওয়ার কারণও ছিল। আইয়ুব খানের পতন ঘটানোর জন্য সমগ্র দেশ ও দেশের নেতৃত্ব এক্যবন্ধ হয়েছিল বটে কিন্তু বিকল্প সরকার পদ্ধতির ঐক্যত্বে পৌছতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। এ কারণেই ওরু থেকে ইয়াহিয়া খান আইয়ুব খানের জুতোয় হাঁটতে শুরু করলেন। পাঞ্জাবী শাসক চত্রের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষাই যে, দেশজুড়ে অস্থিরতার আসল কারণ সে সব কথা আগে উল্লেখ করেছি। এটা বহুকাল ধরে পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ছাঁচ দ্বারা দেশকে বিস্ফুর্ক করে রেখেছে। কিন্তু নেতৃত্ব দোষমুক্ত ছিলেন না। দেয়াল তোলা আমলা-সামরিক গোষ্ঠীর হাতে ব্যবহৃত হোত না, যদি না অতটা অমনোযোগী কিংবা কম বিনয়ীভাব দেখাতেন। তাঁরা এসবের কোনটাই ছিলেন না। লোলুগতার শৃংখলে তারা বাধা পড়ে গিয়েছিলেন। সেকারণেই রাজনৈতিক দল তাঁগা গড়ার খেলা হয়েছে। কোন কোন সময় তিনি সদস্য নিয়েও দল হয়েছে। চেয়ারম্যান হিসেবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, সম্পাদক কল্পে তার অফিস কর্মী এবং ধর্মী চাচা কোষাধ্যক্ষ কল্পে। কোন একটি স্মরণীয় ঘটনায়, এই অন্তুত রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রষ্টা এক কর্মণ পরিণতিতে পৌছে যান যখন নির্বাহী নির্বস্তরের পদ থেকেও তাঁকে বাদ দেয়া হয়। তাতে তিনি অসম্ভুষ্ট হননি। তেমনি, তাঁর গতিপথ অন্য দিকে সরিয়ে বাকী ক'মাসের মধ্যেই তিনি নতুন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করলেন। নির্বাচনের পদ্ধতি দলের মতে, শুধু ভাস্তবেই সৃষ্টি করে। ১৯৬৯ সালে ৩৬টি রাজনৈতিক দল ও উপদল নির্বাচন সংকেতের অপেক্ষায় ছিল। এটা অস্বাভাবিক নয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খান এই অবস্থা দেখে তাঁর প্রতারণার উদ্দেশ্য হাসিলের সুযোগ পেয়ে গেলেন।

ইয়াহিয়া খান যখন তিনি তাঁর অভিযান শুরু করলেন, তখন তিনি পূর্ব বাংলার যে আর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসম্ভোষ বিগত দু'দশকের ঔপনিবেশিক শোষণের থেকে উদ্ভৃত হয়েছে এবং নির্বাচনের সময়ে তা সামুদ্রিক জল বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়বে তিনি তা' ভাবতে পারেননি। এই ঘটনা সম্পর্কে তাঁর ভিত্তি গেল পাচ্ছে। এটা উপলক্ষ্মি করে তাঁর অথেরোধা আকাঞ্চ্ছা মহা ভুলের পথে এগিয়ে গেল। সে সময় দাবার ঘুঁটিশুলোর অবস্থানও ছিল সুন্দর এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ইয়াহিয়া খানকে এ খেলায় বাঁপ দিতে উৎসাহিত করলো। দাবার চালও তেমনি চালা হলো। এতে আজবিশ্বাস ও উদ্বীপনাও গেল বেড়ে।

১৯৬৯ সালের ২৮ শে নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে রেডিও এবং টেলিভিশনে বহুল প্রচারিত ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন, যে গত সাত মাস ধরে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখলেন, নেতাদের সাথে কথা বললেন, এবং এখন তিনি জাতিকে তাঁর আস্থায় আনতে পেরেচেন। তবে তিনি দুঃখের সাথে বললেন যে, শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে কোন আনুষ্ঠানিক ঐকমত্যের সৃষ্টি হয় নি। তথাপি তিনি দাবি করেন যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মতামত সম্পর্কে তিনি সচেতন। সে কারণে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিতে প্রয়োজন বোধ করেছেন। প্রাথমিকভাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আইনগত কাঠামোসহ প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন তিনি বোধ করেছেন। এটা তিনি পরে জানাবেন। ত্রৃতীয়ত, সাংবিধানিক প্রশ্নে বিশেষতঃ সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তবাস্তুর সরকার, সার্বজনীন ভোটাধিকার, জনগণের মৌলিক অধিকার, আইন প্রয়োগকারী ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং শাসনতন্ত্রে ইসলামী রূপ এইসব প্রশ্নে তিনি কোন মতান্বেক্য দেখতে পাননি। সে কারণে নতুন শাসনতন্ত্রে এসব প্রশ্ন মীমাংসিত বলে বিবেচিত হবে।

ত্রৃতীয়ত, তিনি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের বিবেচনা করেছেন। তিনটির সাংবিধানিক সমস্যার মাঝে দুটো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন। তাঁর মধ্যে একটি হলো, এক ইউনিট প্রথমে বাতিল করা, যা পশ্চিম পাকিস্তানকে স্বতন্ত্রভাবে সিঙ্গু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হিসাবে শীকৃতি দেবে। আর অন্যটি হলো, প্যারেটি অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের সমান প্রতিনিধিত্ব। সেইজন্য ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন যে, সিঙ্গু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ রূপে পরিণত হবে এবং এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে আগামী নির্বাচন ও সংবিধানের অংশ হিসাবে সংখ্যা সামোর পরিবর্তিত নীতি হিসাবে গৃহীত হবে। শাসনতন্ত্রের সমস্যাবলীর মীমাংস হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ত্রৃতীয় এবং সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন সমস্যার সম্পর্কেও কেন্দ্রের সঙ্গে (প্রদেশ) সম্পর্ক বিষয়ে

সমাধান দিতে পারতেন, তাতে দেশ একটা তৈরী করা সংবিধান' পেয়ে যেত। কিন্তু তিনি উদারতা দেখিয়ে এই সমস্যাটিকে জাতীয় পরিষদের জন্য রেখে দিলেন। যাতে "পরিষদ এই সমস্যার সমাধান এমনভাবে করেন যা সকল প্রদেশের বৈধ চাহিদা ও দাবি পূরণে তথা সামগ্রিকভাবে জাতির প্রধান চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়।" ইয়াহিয়া খান তার পর জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি বলেন, ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারী থেকে রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু হবে। ৩১ মার্চের মধ্যে আইনগত কাঠামো, জুন মাসের মধ্যে ভোটার তালিকা প্রস্তুত এবং অক্টোবর মাসের ৫ তারিখে জাতীয় পরিষদ নির্বাচন হবে। নতুন পরিষদে ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নে ব্যর্থ হলে পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হবে। সংবিধান প্রণয়নের পর প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ইয়াহিয়া খান যদিও একথা বলেননি তবুও, সাধারণতঃ লোকের একটা ধারণা হয়েছিল যে ১৯৭১ সালে মার্চ কিংবা এপ্রিল অর্থাৎ প্রায় ১৮ মাস পরেই তারা নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে চলেছেন। মার্চের ঘোষণার মত প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই তৈরী করা হয়েছিল। এতে আশানুরূপ সাড়াও মিলেছিল।

১৯৫৫ সনে পঞ্চম পাকিস্তান একীকরণ করে যখন এক ইউনিট গঠন করা হল তা ছিল পাঞ্জাবী আকাঞ্চকাকে আয়াসলক্ষ করা অন্য সকল অঞ্চলের জন্য তা ছিল সম্পূর্ণ ক্ষত। বিগত ১৪ বছর ধরে সিঙ্কি, বেলুচি, পাঠানরা একীকরণ প্রাদেশিক কাঠামোতে পাঞ্জাবী আধিপত্যের তৌত্র বিরোধিতা করে এসেছে। সে কারণে নির্বাচনের আগে ইয়াহিয়া খান আকস্মিকভাবে এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে পঞ্চম পাকিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চলেই উচ্চসিতি প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

অন্য অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ সবচেয়ে বেশী সন্তোষ জানিয়ে ছিল যে প্রেসিডেন্ট মহানুভবতা দেখিয়ে প্যারেটি বা সংখ্যাসামগ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তার 'একজনের এক ভোট' নীতি মত প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের তথা এ প্রদেশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের পূর্ণ অধিকার লাভের সুযোগ দিয়েছিল। এ অপ্রত্যাশিত বোনাসে সকলেই উন্নিসিত হলো। পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশের জনগণ আনন্দিত হয়েছিল, এইটুকু জেনে যে সাধারণ নির্বাচন ও আকাঞ্চক্ষত ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য অন্ততঃ একটা তারিখ নির্দিষ্ট হলো।

উন্নিসিত জনগণ পরিষদের সংবিধান প্রণয়নের সিদ্ধান্ত ও ইয়াহিয়া খানের মীমাংসিত সমস্যাবলির ঘোষণার ক্ষমতা হ্রাস করার কথায় যোটেই উদ্বিগ্ন হয়েন। এমনকি প্রেসিডেন্ট যে আইনগত কাঠামো ও ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের যে আদেশ জারি করেছেন সে সব নিয়েও জনগণকে কোন রকম উদ্বিগ্ন হতে দেখা

যায়নি। নতুন পরিষদের ভোটের পক্ষতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্ব শাসনের মতো উজ্জেব্নাময় সমস্যা পরিষদ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়নের বিরাট বাধা হয়ে দাঢ়াবে, যদি সেটা আশা করা যায় পরিষদ ছেট ছেট দল দ্বারা গঠিত হয়। জনগণ এক ইউনিট ভেঙ্গে দেয়া এবং এক জনের এক ভোট ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট ছিল এবং তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের আশায় বিভোর ছিল। এবং অন্যান্য বিষয়ে একটা দ্রুত সমর্থনোভায় পৌছে যাবে এটা ধরে নিয়েছিল। ইয়াহিয়া খান একহাতে গাজুর এবং চতুরভাবে অন্য হাতে চাবুক লুকিয়ে রেখেছিলেন।

চারমাস পরে যখন আইনগত কাঠামো আদেশ প্রকাশিত হলো তখনই অনুভূত হলো আসল সমস্য। কৌতুহলোদীপক সামঞ্জস্য রক্ষা করে ঘটনাটি ঘটেছিল এক্সিল ফুলের দিনে। পাকিস্তানে একুপ ঘটনার নজির অজস্র মিলবে।

আইনগত কাঠামো আদেশে (এল এফ ও) যে ইয়াহিয়া খানের দুরভিসকি প্রকাশ পেয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : “জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধান বিলকে প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবে। প্রেসিডেন্ট যদি সংবিধান বিল অনুমোদন না করেন তাহা হইলে জাতীয় পরিষদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।”

২৭ নং অনুচ্ছেদের বায় হলো : (১) এই আদেশের যে কোন শর্তের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা সন্দেহ দেখা দিলে তাহা প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মীমাংসিত হইবে এইুপ সিদ্ধান্ত হইবে চূড়ান্ত এবং তাহা কোন আদালতে উত্থাপিত হইতে পারিবে না।

(২) এই আদেশের যে কোন সংশোধনীয় ক্ষমতা থাকিবে প্রেসিডেন্টের হাতে; পরিষদের হাতে নয়।

এই আদেশ অনুযায়ী পরিষদের সদস্যাগণ নির্ধারিত শপথ গ্রহণে বাধ্য থাকিবেন। শপথ নামায় অন্যান্য কথার মধ্যে “১৯৭০ সালের আইনগত কাঠামো আদেশের শর্তাবলী এবং সেই আদেশবিধৃত পরিষদের আইন ও বিধি অনুযায়ী বিধ্বন্তার সহিত” কর্তব্য পালনের কথাও জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

এই আদেশে সমান উপযোগিতার উপর দৃঢ়ভাবে পাঁচটি মূলনীতির ভিত্তিতে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। ২০ নং অনুচ্ছেদে স্বতন্ত্রভাবে বিধৃত হয়েছে : সংবিধান এমনভাবে প্রণীত হইবে, যাহাতে নিম্নলিখিত মৌলিক নীতিগুলো অন্তর্ভুক্ত হইতে বাধ্য থাকিবে :

১। পাকিস্তানের একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র হইবে যাহা ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান নামে এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হইবে তাহা ঐনামে পরিচিত হইবে। ইহাতে প্রদেশগুলো ও অন্যান্য অঞ্চলে বর্তমান অবস্থান ও

যুক্তরাষ্ট্রে এমনভাবে মিলিত হইবে যেন স্বাধীনতা আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি নিশ্চিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা কোনমতে দুর্বল না হয়।

২। (ক) ইসলামী জীবনাদর্শ, যাহা পাকিস্তানের সৃষ্টির মূল ভিত্তি তাহা অবশ্যই রক্ষিত হইতে হইবে এবং (খ) রাষ্ট্রপ্রধানকে একজন মুসলমান হইতে হইবে।

৩। ক) জনসংখ্যা এবং প্রাণবয়স্কের ভেটাধিকারের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে প্রত্যক্ষ ও অবাধ নির্বাচন ব্যবস্থার পর্যাবৃত্তের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিমালার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। (খ) নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ নির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হইবে এবং সেইগুলি মানিয়া চলিতে বিধান রাখিতে হইবে এবং (গ) ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকার নির্বাহন নিশ্চিত করণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকিতে হইবে। অর্থাৎ আইনের শাসন নিশ্চিত করিতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকিতে হইবে।

৪। যুক্তরাষ্ট্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক যাবতীয় ক্ষমতা এমনভাবে বন্টন করিতে হইবে যাহাতে প্রদেশগুলোর সর্বাধিক স্বায়ত্ত্বাসন অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরিমাণে আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্জন করিতে পারে। তবে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ও আইন প্রণয়ন প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতাসহ যথেষ্ট ক্ষমতা থাকিতে হইবে যাহাতে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সম্বন্ধীয় দায়িত্ব পালনে এবং দেশের স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সমর্থ হয়।

৫। (ক) ইহা নিশ্চিত করিতে হইবে যে, পাকিস্তানের সব অঞ্চলের জনসাধারণ যাহাতে পূর্ণস্বত্ত্বাবে সকল প্রকারের জাতীয় কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং (খ) একটি সুনির্দিষ্ট কালে যাহাতে সকল প্রদেশগুলোর ও প্রাদেশিক বিভিন্ন অঞ্চলসমূহের মধ্যেকার আর্থিক ও অন্যান্য বৈষম্য সাংবিধানিক আইন ও অন্যান্য পদক্ষেপের মাধ্যমে দূরীভূত হয়।

আমি আইনগত কাঠামো আদেশ থেকে বিস্তারিতভাবে উন্নতি দিয়েছি কেননা এতে জড়িয়ে থাকা অন্তর বেদনা স্পষ্ট হয় :

যাহোক শেষকথা হলো, নির্বাচিত সদস্যগণ যতই খোশ খেয়ালে বুঝ হন না কেন, জাতীয় পরিষদ কিছুতেই একটি সার্বভৌম সংস্থা হবে না। এটা হবে প্রেসিডেন্টের খেয়াল খুশীমত একটা খসড়া সংবিধান প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান। এই খেয়ালকে ইয়াহিয়া খান সুবিধামত ব্যাখ্যা দিতে পারবেন এবং সংবিধান প্রণয়নের প্রথম ও চতৰ্থ নীতির পরম্পর বিরোধী শর্তের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান সুকোশলে রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও পারস্পরিক আবিক্ষারের বীজ ব্যবহার করেছেন। একদিকে বলা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা, অপরদিকে বিপরীত শর্ত জুড়ে উখাপিত হয়েছে প্রদেশগুলো পারে সর্বাধিক স্বায়ত্ত্বাসন অর্থাৎ সর্বাধিক পরিমাণে আইন প্রণয়নী, প্রশাসনিক ও আর্থিক

କ୍ଷମତା । ମୋଦ୍ଦା କଥା ହଲୋ, ଏକଇ ସଙ୍ଗେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରକେ ଦିତେ ହବେ ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣେ ଆଇନ ପ୍ରଣଯନୀ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା, ଯାତେ ବୈଦେଶିକ ଓ ଅଭ୍ୟାସତାରେ ଦାୟିତ୍ୱସୁହୁ ପାଲନ କରାତେ ପାରେ । କାଉକେ ଏ ଧରନେର କ୍ଷମତା ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣେର ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାତେ ଅଭିଧାନ ଚର୍ଚାର ପ୍ରୋଜନ ହବେ ନା ।

ଆମେ ତିକ୍ତତାଯ ଦୃଷ୍ଟି ହୁଅଛେ ତାତେ ଇୟାହିୟା ଖାନ ଏକଟା ରାଜନୈତିକ ମୋଢ଼ ଦିତେ ଚେଯେଛିଲେନ, ଯା ପାକିସ୍ତାନେର କୁଳ୍ଲୀ ପାକାନୋ ରାଜନୀତିକେ ଆରା ଅସମ୍ଭବ କରେ ତୋଲେ । ନିର୍ବାଚନେର ପୂର୍ବେ ରାଜନୈତିକ ଦଲମୂହ ସ୍ବ କର୍ମସୂଚିର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରମାଣେ ଜନ୍ୟ ୪ ନଂ ନୀତିର ଯଥେତ୍ତେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିତେ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ପରିଷଦେର ଅଭ୍ୟାସରେ ଭାଲଭାବେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କରା ଯାବେ ନା । ଏମତାବହ୍ୟ ଜନଗଣେର ସର ସମୟେର ବନ୍ଦୁ ଓ ରକ୍ଷକ ଜେନାରେଲ ଇୟାହିୟା ଖାନ ବଲବେନ, ଜାତୀୟ ସ୍ଵାର୍ଥ ଓଟା ଚାଯ ନା, ଚାଯ ଏଟା, ଏଟା- । ଏହି ଗତଲବେ ତିନି ଆଇନଗତ କାଠାମୋର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦାନେର ସର୍ବଗୟ ସଫଳତା ସୁନିଦିଷ୍ଟଭାବେ ନିଜେର ଜନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରେଖେଛେନ । ଏମନକି ଦୃଶ୍ୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ସଟନାର ଫଳେ ପରିଯଦ ଯଦି ବାଧା ବିପଣ୍ଟି କାଟିଯେ ଉଠିତେ ପାରେଓ ତଥାପି ସଂବିଧାନ ବିଲ, ଯଦି ତାର ପରିକଳନାର ଓ ଆକଞ୍ଚନାର ଅନୁରୂପ ନା ହୁଏ, ତା ହଲେ ତିନି ତାର ସମ୍ମାତି ଦାନ ଶୁଣିତ ରାଖାତେ ପାରେନ ।

ଅନୁପକାରୀ ହବେ ନା ବଲେ ଯା ଏକ ସମୟ ମନେ କରା ହୁଯେଛିଲ, ସେଇ ଆଇନଗତ କାଠାମୋର ସାମାଜିକ ଫଳାଫଳ ହଲୋ ଧାର୍ଥା ଲାଗାନୋ, ଇୟାହିୟା ଖାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ତାର ଦାତ ଦେଖାଲେନ ।

ଇତିମଧ୍ୟେ ପ୍ରତିବାଦେର ଦେବୀ ହୁୟେ ଗେଛେ । ନବବର୍ଷେର ଦିନେ ରାଜନୀତିର ଶୁରୁ ହଲେ ପୁରାନୋ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଦିତା ଓ ବିତର୍କେର ନୃତ୍ୟ ଜୀବନ ପେଲ । ରାନ୍ତାଯ ରାନ୍ତାଯ ସଂଘର୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ଵାସାର ଉତ୍ସବ ହଲେ ଶାସକଚକ୍ର ଏଟାକେ ରାଜନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱହିନତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ଵରୂପ ନିନ୍ଦା ଜ୍ଞାପନ କରାତେ ଦେବୀ କରେନି । ଜନସାଧାରଣେର ମନେ ତାଦେର ଭାବୀ ନେତ୍ରବୃଦ୍ଧେର ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କେ ସଂଶ୍ୟେର ସୃଷ୍ଟି କରାଲେ । ଏମତାବହ୍ୟ ଇୟାହିୟା ଖାନ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରତ୍ତାବାଲୀ ପେଶ କରଲେନ । ଯା ଛିଲ ସକଳେର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଥବା କାରୋଇ ନା ।

ଜନଗଣେ ବୋକାରୀ ଆବାର ସର୍ବନାଶେର କାରଣ ବଲେ ପ୍ରମାଣିତ ହଲୋ । ରାଜନୀତିବିଦେରା ତାଦେର ଭୂମିକାର ଜନ୍ୟ ଦେଖାତେ ପେଲେନ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ମଞ୍ଚତ୍ରେ ଆଶା । ତାଦେର ଏସବେର ଲୋଭ ସାମଲାନୋ ଦାୟ । କାଜେଇ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନେର ଆୟାମୀ ଲୀଗେର ଶେଷ ମୁଜିବୁର ରହମାନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପାକିସ୍ତାନେର ଜୁଲଫିକାର ଆଲୀ ଭୁଟ୍ଟୋ ଏହି ଜ୍ଞାଲାତନ ସହ୍ୟ କରେ, ଆମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମରିକ ଅଛୋପାଶେର ବିରକ୍ତକେ ତାଦେର ନିଜେଦେର ଅଧିକାର ଅର୍ଜନେର ଉତ୍ତମ ସୁମୁଗେର ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରଲେ ।

ଅତତ: ଆୟାମୀ ଲୀଗେର ଜନ୍ୟ ଏଟା ସୁଦୂର ପରାହତ ଛିଲ ନା । ଜେନାରେଲ ଇୟାହିୟା

খান আগেই নির্ভুলভাবে অনুমান করেছিলেন যে সংবিধান প্রণয়নের কাজে প্রধান বাধা আসবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। পশ্চিমের শব্দেশবাসীদের তুলনায় সেখানকার জনগণ রাজনৈতিকভাবে অধিক সচেতন ছিলেন। দুই যুগেরও অধিককাল ধরে শোষিত হওয়ার পর তারাও সরকারী কর্তৃত্ব লাভের বিষয়ে সন্দিহান। সুতরাং সন্দেহযুক্ত করতে তিনি সুচতুর চাল চাললেন, যদি তাদের মন জয় করে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা যায়।

কৌশলটি ছিল সরল অথচ যথেষ্ট ফলদায়ক। ক্ষমতা প্রহণের কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি কেন্দ্রীয় সেক্রেটারীয়েটের উচ্চপদে কয়েকজন বাঙালী অন্তর্ভুক্ত করে এদের চেহারা পাল্টে দিলেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে আগে যেখানে দুই বা তিনজন বাঙালী সচিব ছিলেন, যন্ত্রকালের মধ্যে তাদের সংখ্যা তিনজন বৃদ্ধি পেল। স্টেট ব্যাংকে, পরিকল্পনা কমিশনে, সরকারী কর্পোরেশনগুলোতে, পাকিস্তানী দূতাবাসে এবং সরকারী বেতার ও টেলিভিশনের চাকুরীতেও বাঙালীদের প্রবেশ ঘটতে লাগলো।

বিদেশে সরকারী প্রতিনিধিত্বে বাঙালীরা প্রাধান্য পেল। পূর্ব পাকিস্তানের পত্রিকাগুলোর সম্পাদক ও সাংবাদিকগণ সকলে বাঙালী না হয়েও প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী ও বৈদেশিক ডোজসভায় অংগীকার পেলেন। এই সম্প্রসারিত কার্যক্রমের সঙ্গে প্রচারের মাত্রা ও গেল বেড়ে। তারপর নৌবাহিনীর প্রধান অধিনায়ক এ্যাডমিরাল আহসানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত করা হল। এই ভদ্র ও যোগ্য অফিসার কয়েক বছরের জন্য এই প্রদেশের লো-পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে সময় তাঁর নিরপেক্ষতা ও বিচক্ষণতার জন্য সামাজিক সুনামের যথাযোগ্য সম্মান অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন বাঙালীদের প্রিয়। বাঙালীরা তাঁর নিয়োগকে অভিনন্দিত করেছিলেন। সর্বোপরি ছিল বাঙালীদের জন্য ইয়াহিয়া খানের দরদ প্রকাশের পুনরুত্থি। ১৯৬৯ সালের ২৮শে জুলাই তারিখে বেতার ও টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট সর্বসমক্ষে স্বীকার করেছেন যে, জাতীয় পর্যায়ে ও জাতীয় কার্যক্রমের কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রহণ প্রতিক্রিয়া পূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ না পাওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানীরা যে অবহেলিত, তা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত। তিনি যোথণা করলেন যে, সেনাবিভাগে বাঙালীদের অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা এখন থেকে দ্বিগুণ করা হবে এবং দেশরক্ষা বাহিনীগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি চলতেই থাকবে বলে প্রতিশ্রূতি দিলেন।

এ সমস্ত ঘটনা বাঙালীদের প্রতিপত্তি সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু সংখ্যক লোকের মনে গিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলেও বাঙালীরা এগুলোকে লুফে নিল। শাসকবর্গ অতীতে কখনো তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেনি।

তারপর আইনগত কাঠামো সম্পর্কে বাঙালীদের সন্দেহ নিরসনার্থে ইয়াহিয়া

খান নিজেকে আরও এগিয়ে নিলেন। প্রতিনিধিত্বের সংখ্যাসাম্যনীতি বাতিলকরণ এ সমস্ত কৌশলের মধ্যে তখন কিন্তু একটা মারাত্মক ভুল এবং সর্বনাশের মূল বলে প্রমাণিত হল।

যদিও দীর্ঘস্থায়ী অভিযোগের বিষয় হলেও সংখ্যাসাম্য কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল না। আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচীতে কিংবা বাঙালী ছাত্রদের ১১ দফা দাবিতে এটা ছিল না। এটাকে সহজেই মীমাংসিত সমস্যাবলীর প্রেরীভুক্ত করা যেতো। তখন বাঙালীরা এই সংখ্যাসাম্য নীতিকে সর্বনাশের কারণ বলে দাবি করেনি। কিন্তু তাদের দাবি ছিল ব্যাপক অর্থে এই মূল চুক্তির আও বাস্তবায়ন অর্ধাং বেসামরিক চাকুরি ও সামরিক বাহিনীতে সমান প্রতিনিধিত্ব দান এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য অপসারণ যা পূর্ব বাঙালায় অসম্ভোষ সৃষ্টি করেছে। তোষণের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কর্মপর্চা হিসাবে অর্মাংসিত বিষয়গুলোর মীমাংসা না করে অকৃতপক্ষে ইয়াহিয়া খান বাঙালী অসম্ভোষের সমাপ্তি ঘটালেন। যা এ পর্যন্ত আর কেউ করেনি।

আরো অনেকের কাছে এই বিপদ ছিল সুস্পষ্ট, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন অকৃতির রাজনীতিবিদ হিসাবে ইয়াহিয়া খান কৌতুহলেদীপকভাবে ব্যাপারটিকে সেদিক থেকে দেখেননি। সম্ভবতঃ এটা ছিল নিজের উপর মাত্রাত্তিক বিশ্বাস।

‘একজনের এক ভোট’ নীতি জাতীয় পরিষদে ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ব বাংলাকে দিয়েছিল ১৬৯টি আসন এবং পরিষদে স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা-এই নির্ধারিত রাজনৈতিক সুবিধা শেখ মুজিবুর রহমানের জন্যে হয়ে উঠলো যেন স্বর্গ থেকে প্রেরিত একটি অমোঘ সুযোগ। প্রতিগুরু বিরুদ্ধে তিনি এই সুযোগের সম্ভাবহার করলেন। আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচীকে ‘ম্যাগনা কার্টার’-এর মতো অনুমোদন দেওয়া হলো এবং সাধারণ নির্বাচনকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের উপর গৃহীত গণভোটে পরিণত করা হল। এর অপরিহার্য পরিণতি ইয়াহিয়া খানের অভিপ্রেত সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে ছলনাশ্রয়ী করে তুললো।

সামরিকভাবে ক্ষমতা দখলের অভিপ্রেত কৌশল শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হল। অভীষ্ট পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়ে প্রেসিডেন্ট তাঁর স্বাভাবিক শান্তভাব হারিয়ে ফেললেন, তারপর আর কোনদিন তিনি শান্তভাব ফিরে পেলেন না। নিছক রাজনৈতিক সমস্যার সামরিক সমাধান হিসাবে পরবর্তীকালে যে হঠকারিতা ও বর্বরতার আশ্রয় নেওয়া হল তা মাত্রের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু সেটা হল ইতিহাসের আরেক অধ্যায়। ১৯৭০ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে সবকিছুই ঠিকমত চলছিলো। ইয়াহিয়া খান আগত বিপর্যয়ের সংকেত না বুঝতে পেরে ক্ষমতার তুঙ্গে আরোহণ করলেন।

পাকিস্তানের মত দেশে যেখানে বাকস্বাধীনতা নেই বললেই চলে। কোন বিষয়

সম্পর্কে কথা বলার সীতির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। কোন কোন সময় অকথিত বিষয়কে অধিকতর মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। রাজনৈতিক সাফল্য অনেক সময় নির্ভর করে কি বলতে হবে এবং কীভাবে বলতে হবে তার উপর।

১৯৭০ সালের শীৰ্ষকালে এবং নির্বাচনী অভিযানের দশম মাসে সবকিছুই মোটামুটিভাবে আশানুরূপ চলছিলো। তখন পর্যন্ত সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জনসাধারণের কোন অভিযোগ ছিল না। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তখন পরম্পর পরম্পরের গলা কাটছিলেন আর প্রেসিডেন্ট ভবনে যাওয়া-আসা করছিলেন। দেশের বড় বড় শহরে বিছিন্ন বিশ্বাখলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো। রাজনৈতিক দলগুলো পরম্পরের প্রতি কাদা ছোড়াচুড়ি করছিল। সে সঙ্গে হঠকারী তৎপরতা নির্বিম্বে চালানো হচ্ছিল।

যদিও শুধু সংবাদপত্রে সুষ্ঠুভাবে গুজব ছড়ানো হয়েছিলো যে, প্রেসিডেন্টের জামার আস্তিনে একটি তাসের টেক্কা লুকানো রয়েছে। দেশের রাজনৈতিক গতিবিধি ও সংবিধানের ভাগ্য সম্পর্কে জনগণের সংশয়ের সঙ্গে সামঝস্য রক্ষা করে তা উপর্যুক্ত সময়েই চালা হবে। নানা বকমের কাহিনী শোনা যাচ্ছিলো। তন্মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশী স্থায়ী হয়েছিল তা হলো খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্মে প্রেসিডেন্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি বিকল্প কমিশন গঠন করেছিলেন। প্রেসিডেন্টের মনে যে ফর্মুলা ছিল তা যেভাবেই উপস্থিত হোক না তাতে মূল ভাবের অনুমান করা গিয়েছিল।

এসব যেভাবেই আসুক না কেন, এসবের উপর কিন্তু একই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি ফলপ্রসূ ভারসাম্য, সামরিক বাহিনীর উদ্ভৃত কাজের জন্য তহবিলের নিশ্চয়তা, সর্বোপরি ক্ষমতার শীর্ষে প্রেসিডেন্টের নির্বাঙ্গুটি অবস্থিতি। এসব আলোচিত হল, প্রত্যাশিত রাজনৈতিক জাটিলতা সৃষ্টিতে। পরিষদে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে তাতে এইসব বিকল্প প্রস্তাবগুলো পরিষদে উপস্থাপিত হবে। তখন নির্ধারিত ১২০ দিনের মধ্যে সাংবিধানিক বাক-বিত্তার সফল নিষ্পত্তির জন্য, এসব প্রস্তাবের আপোষ ফর্মুলা হিসাবে গ্রহণের জন্য পরিষদ সদস্যদের বাধ্য করা হবে।

যে সম্পাদক আমাকে এ খবর বললেন, তিনি কিন্তু তা তাঁর পত্রিকায় ছাপাতে সাহস পাননি। তিনি বিশ্বস্ত যাকেই পেয়েছেন তাঁর কাছেই গোপনে বলেছেন যে, তিনি ঘোড়ার মুখ থেকে সন্দেহ এ খবর সংগ্রহ করেছেন। এই বিতর্কিত জন্মতি বা সূত্রাটি প্রেসিডেন্টের শাসনভাব্বিক উপদেষ্টার চেয়ে কম ছিলেন না। রাওয়ালপিণ্ডি, করাটী ও ঢাকার গুজব কারখানাগুলোতে তখন পুরোদয়ে গুজব ছড়ানো চলছিলো। জনমত এভাবে তৈরী করা হচ্ছিল যে আলোচিত বিষয়গুলোর সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।

কোন এক ধরনের যাদুর প্রয়োজন হবে। সতর্কতার সঙ্গে এমনভাবে ফাঁদ পাতা হয়েছিলো, যেখানে বাজি ছাড়াই পিণ্ডিতেরা বাজি ধরেছিলেন যে, ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কে অনিবার্য মতানৈকের দরকন পরিষদ অচল হয়ে যাবে। কাজেই ইয়াহিয়া খানের লুকানো তাসের টেকার প্রকৃত স্বরূপ কি নিম্নের সমস্ত জগ্ননা কল্পনায় তা কেন্দ্রীভূত হল।

তখন পূর্ব বাংলার যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের দৃশ্য সৃষ্টিভাবে দেখানো হচ্ছিলো, পশ্চিম পাকিস্তানের তেমন উদ্দেগ দেখা দেয়ানি। শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক তাঁর দলের কর্মসূচীতে নির্বাচনকে গণভোটে পরিণত করার আবেদনে আওন জুলতে শুরু করেছে। লক্ষণীয়, অনেক চরমপন্থী যাঁরা শেখ মুজিবের দক্ষিণঘৰেঁয়া মধ্যপন্থার নীতি হজম করতে পারতেন না তাঁরাও নিঃশব্দে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াচ্ছিলেন। এহেন অবস্থার অগ্রগতি সদাপর্যবেক্ষণকারী সরকারী কর্তৃপক্ষকে অকারণে উদ্বিগ্ন করেছে বলে মনে হয়নি। ক্ষমতার শীর্ষে ইয়াহিয়া খান আগের মতই আজ্ঞাবিশ্বাসী, আপাতৎ দৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছিল।

উল্লেখ্য মজার বিষয় হল এই যে, প্রেসিডেন্টের সংস্থাপনের নীচতলায় তখন একদল জাঞ্জা কাজ করছিলো। পাঁচজন সেনানায়ক ও দু'জন অসামরিক ব্যক্তির সমন্বয়ে এ 'সেল' গঠিত হয়েছিল। সামরিক বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে ছিলেন প্রধান সেনাপতি জেনারেল হামিদ খান, প্রেসিডেন্টের প্রধান স্টাফ অফিসার ও কার্যতঃ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সমতুল্য লেঃ জেনারেল পীরজাদা, বছর খানেক পরে বাংলাদেশের কসাইরূপে খ্যাত লেঃ জেনারেল টিক্কা খান, আন্তঃসার্ভিস গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক মেজর জেনারেল আকবর খান এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল ওমর খান, এদের সবাইই ছিলো প্রেসিডেন্টের কাছে অবাধ প্রবেশাধিকার। দু'জন বেসামরিক অফিসারও ছিলেন। এদের একজন হলেন অসামরিক গোয়েন্দা দফতরের পরিচালক রিজাভী, অন্যজন হলেন প্রেসিডেন্টের আর্থনীতিক উপদেষ্টা এম, এম, আহমদ।

অভ্যন্তরীণ চক্রের এইসব অনুলোকদের সমন্বয়ে প্রেসিডেন্টের একটি শক্তিশালী উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছিল, যারা অবিসংবাদিতরূপে প্রকৃত নিয়ন্ত্রক ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক। এরা প্রতিটি ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করতেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্বাচনী সাফল্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা এঁদের ছিল না। আগি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, প্রথম দিকে এসবের উপর গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টকে গুরুত্ব দেয়া হতো না। পূর্ব বাংলার কয়েকজন সংবাদদাতাকে শেখ মুজিবের প্রতি প্রচন্ডভাবে সহানুভূতিশীলতার অপরাধে অভিযুক্ত করা হল এবং তাদের অবিশ্বাসীর শ্রেণীভূক্ত করা হল।

পূর্ব বাংলার অসংখ্য মসজিদে শোভাগণ জামাতে ইসলামীর লাগামহীন ভঙ্গামির পক্ষে কর্কশ ভাষায় যে অভিযান চালাছিলো, তা শাসন কর্তৃপক্ষকে নতুনভাবে উৎসাহিত করছিল। এর সঙ্গে মাওলানা ভাসানীর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে গর্জন এই উৎসাহকে আরো জোরদার করল। সামরিকচক্রের মনে এই বিশ্বাস জন্মালো যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেখ মুজিবের দলের সাফল্যের দৌড় পৌছবে এক তৃতীয়ঘাণের মতো সম্ভবতঃ তিনি সব স্থান থেকে সঠিক সহযোগিতা পাবেন না।

এরূপ বিশ্বাস ছিল, প্রাণ প্রমাণাদির সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার নিজের ১৯৭০ সনের নভেম্বরের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তান সফর শেষে ধারণা হল যে আওয়ামী লীগ সহজেই বিপুল ভেটাধিক্যে বিজয়ী হবে। আমি ১২২টি আসনে কোন প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখতে পাইনি। বাকী ৪০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ যুক্তিসংস্থতভাবে কমপক্ষে অর্ধেক আসন লাভের আশা করতে পারে। ফলে আশা করেছিলাম এই দল কমপক্ষে ১৪২ টি আসন পাবে। এটা ছিল প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে মারাওক সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের কয়েকদিন আগেকার ধারণা।

এই শোচনীয় দুর্ঘটনায় শেষ আশাটুকু উবে গেল বলে প্রমাণিত হলো। বিশ্বের সকল দেশ থেকে যখন সাহায্য আসতে লাগলো, তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটি সহানুভূতিসূচক বাণীও শোনা গেল না। তখন সেখানে পরিবেশ যেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও সমাজের সুন্দরী নারীর মধ্যেকার ঘোন-অপরাধ ও আত্মহত্যার কলংকের মতোই মনে হয়েছে। যা নতুন মাত্রায় বাঙালী অসঙ্গোয়ের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুললো। বাঙালীদের মনে স্পষ্টরূপে এই ধারণার সৃষ্টি হলো যে তারা দেশের অপর অংশের ভাইদের কাছ থেকে সদাচারণের আশা করতে পারে না। কাজেই শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের ছয় দফা ভিত্তিক শায়তানাসনের দাবির উপর নির্বাচনকে প্রকৃতপক্ষে গণভোটে পরিণত করেছিলেন। এই ফলাফল হলো ড্যাবহ।

তথাপি একথা কৌতুহলজনকভাবে উল্লেখ্য, রাজনৈতিক বিপর্যয়ের গতি কম্বন্ধ হবে বলে শেষ সুহৃত্ত পর্যন্ত স্বত্ত্বাসীনরা আশা পোষণ করেছিলেন। নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের ফলাফল নিয়ে জল্লনা কল্লনা সম্বন্ধে আমাকে বলা হয়েছিল তা ছিল নিম্নরূপ :

আওয়ামী লীগ	৮০
কাইয়ুমপুরী মুসলিম লীগ	৭০
মুসলিম লীগ (দোলতানা শাখা)	৪০
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	৩৫
(ওয়ারী শাখা)	
ভূট্টো পাকিস্তান পিপলস পার্টি	২৫

এটা যে কত বড় ভুল হিসেব ছিল, সম্ভবতঃ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীগণ অভীষ্ঠ ফলাফল সম্পর্কে চিন্তা করে উদ্ভাবন করেছিলেন বা এতে ছিল বিদেশমূলক রহস্য? জাতীয় ধারণার প্রতিই আমি বিশ্বাসী।

এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের বেসরকারী শাসনতাত্ত্বিক উপদেষ্টা অধ্যাপক জি, ডিব্রিউ, চৌধুরীর ১৯৭০ সনের ১০ই সেপ্টেম্বরে লক্ষণস্থ পাকিস্তান সোসাইটিতে প্রদত্ত ভাষণের কিছু অংশ উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। এটি ছিল পূর্বাঞ্চলের মারাঠ্বক বন্যার জন্য নির্বাচনের তারিখ ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখার কঠোর দিন পরের ঘটনা। অধ্যাপক চৌধুরী পাকিস্তানের সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং ভাষণের পরে শ্রোতাদের ভীড়ে প্রশ্নাবনীর জবাব দিয়েছিলেন। সোসাইটির বুলেটিনে (৩১তম সংখ্যার ৪৬-৫৬ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত তার কিছু অংশকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি তা হলো এই :

কর্নেল জি, এল, হাইড : 'একজনের এক ভোট' নীতির ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই জাতীয় পরিষদ কি পূর্ব পাকিস্তান থেকে অধিক সংখ্যক সদস্য লাভ করবে?

অধ্যাপক চৌধুরী : হ্যাঁ।

কর্নেল হাইড : তার অর্থ কি এই যে পূর্ব পাকিস্তান সব সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে।

অধ্যাপক চৌধুরী : হ্যাঁ, যদি কেউ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, তা হলে একজনের এক ভোট নীতিকে গ্রহণ করতেই হবে এবং আমরা বিশ্বাস করি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান বলে কোনকিছু থাকবে না। অবশ্য দলের ভিত্তিতে তার প্রকাশ ঘটতে পারে। তবে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন আমরা আশা করি এই সাধারণ পার্থক্য থাকবে না। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের একটি মাত্র দলে সংঘবদ্ধ হয়ে ক্ষমতার গোকাবেলা করার প্রশ্নাই ওঠেনা। যদি তাই হয় তাহলে এর অর্থ হবে পাকিস্তানের বিলুপ্তি এবং আমরা পুরোপুরি আশাবাদী যে এমন অবস্থা কখনই ঘটবে না।

মিঃ আয়ম : অবস্থা যদি এমন হয় যে প্রতিটি ব্যাপারই পূর্ব পাকিস্তান বনাম পশ্চিম পাকিস্তানের ভিত্তিতে মীমাংসিত হচ্ছে, তা'হলে এক্ষেত্রে সরকার কী কর্মপদ্ধা গ্রহণ করবেন?

অধ্যাপক চৌধুরী : এটা কিছুতেই পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

মিঃ আয়ম : এমতাবস্থায় সরকার কি করবেন এবং বলবেন নাকি 'তোমরা

নিজেদের মধ্যে সমবোতায় পৌছতে পারো নি সুতরাং আমাদের নতুন নির্বাচনে ফিরে যেতে হবে।'

অধ্যাপক চৌধুরী : আমি আপনাদের আগেই বলেছি যে, পশ্চিম কিংবা পূর্ব পাকিস্তান থেকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আবির্ভাবের কোন সম্ভাবনা নেই। আমি বাক্তিগতভাবে পুরোপুরি আশাবাদী যে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এই ধরনের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেবে না।

অধ্যাপক চৌধুরীর মন্তব্য থেকে তিনটি বিষয় আমার কাছে স্পষ্টকরণে দেখা দেয় :

(১) পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা একই কঠে জনরায় দেয়, তা' পশ্চিম পাকিস্তান সেই গণরায় গ্রহণ করবেন।

(২) যদি সেৱাপ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তা'হলে রাষ্ট্রের সর্বনাশ হলেও পশ্চিম পাকিস্তান তা প্রতিরোধ করবে।

(৩) তাঁর বিবৃতি থেকে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জনোছে যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বই যে বৃদ্ধি পেয়েছিলো, শেষের দিকে সরকার সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। তখন সরকার সরলভাবে বুড়ো আঙুল মোচড়াচ্ছিলেন, আর পরিস্থিতির উন্নতি আশা করছিলেন।

প্রথম দুটি পয়েন্ট থেকে ব্যাখ্যা যা পরবর্তী ঘটনা অর্থাৎ 'রেইপ অব বাংলাদেশ' বা বাংলাদেশের উপর নৃশংস বর্বরতার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

প্রেসিডেন্টের মনে গণতন্ত্রের স্বরূপ কী ছিল এবং বাংলাদেশে নৃশংস সামরিক কর্মব্যবস্থা গ্রহণের পেছনে যে ম্যাকিয়াভেলিসুলভ মানসিক প্রবণতা বিরাজ করছিলো তা তাঁর দেখতে যারা অনিচ্ছুক ছিলেন এই ঘটনা তাদের চোখ খুলে দেবে।

অধ্যাপক চৌধুরীর তৃতীয় মত মেনে নিতে পারছিনা বলে আমি দুঃখিত। যোগ্য গোমেন্দা বাহিনী থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনের পূর্বে সরকার বাঙালী অনুভূতির তীব্র প্রবণতা সম্পর্কে অপরাধীর ন্যায় নির্বোধ ছিল। কিংবা 'বিশ্বাস্যকরণে অক্ষ ছিল। একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শাসকগোষ্ঠী সূচনায় এর ভূল হিসাবের কথা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক থাকতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সাক্ষা প্রমাণের স্তুপ এত বিরাট হয়েছিল যে, নির্বোধ এবং অন্ধরাও তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। সরকার নির্বোধ কিংবা অক্ষ কোনটাই ছিল না। বক্তৃতঃ সরকার বিপদের কথা উপলক্ষ্মি করতে পেরেছিল এবং তা প্রতিরোধ করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। ভালভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে প্রশাসনিক ভাঙ্গন কিংবা এ ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিনিধিরা বাকপটুভার সঙ্গে তাদের শাসকগোষ্ঠীকে যে ওয়াদা করেছিল তার উপস্থাপনের বার্থতাই এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।

নির্বাচনী অভিযানের পরবর্তী পর্যায়ে সরকারী প্রতারণার নির্দর্শনও যথেষ্ট ছিল। কোন কোন মন্ত্রী প্রকাশেই তাঁদের উদ্দেশ্যপূর্ণ নির্বাচনী তৎপরতা দেখিয়েছেন। কোন কোন দল বা প্রার্থীর অনুকূলে তাঁরা টাঁদা তুলেছেন। সামরিক জাত্তার জনকে সদস্য মাত্র এক সফরেই শিল্পতিদের কাছ থেকে দেড়কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে বলে খবর রয়েছে। এই সংগৃহীত অর্থ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রভাবশালী একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী অভিযানকে উৎসাহিত করার কাজে ব্যয় হয়েছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা বুব ভালভাবেই অবগত ছিল যে, সরকার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কাইয়ুমপুরী মুসলিম লীগের এবং করাচী, সিঙ্গু ও পাঞ্জাবে প্রগতিবিরোধী জামাতে ইসলামীর পক্ষে নির্বাচনের প্রভাব খাটাবার চেষ্টা করছিল। সীমান্তগান্ধী বলে সুপরিচিত খান আবদুল গাফফার খানের পুত্র ওয়ালী খানের নেতৃত্বে পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রভাব খর্ব করার জন্য কাইয়ুম খানকে সমর্থন করা হচ্ছিল। ওয়ালী খান কখনই সরকারের সুরেন্সে সঙ্গে নিজের সুর মেলাননি। সরকারের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন এমন একজন নেতা, যিনি শেখ মুজিবুর রহমানের মতই স্বায়ত্ত্বাসনের দাবিতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও বেলুচিস্তানের জনগণকে বিপজ্জনকভাবে পরিচালিত করছিলেন। বস্তুতঃ ওয়ালী খান শেখ মুজিবের ছয় দফা কর্মসূচীর প্রতি সমর্থনের কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছিলেন।

কাজেই ওয়ালী খানের ক্রমবর্ধমান শক্তি হ্রাস করার জন্যই কাইয়ুম খানের মুসলিম লীগকে সরকারের পক্ষ থেকে নির্লজ্জভাবে সাহায্য করা হচ্ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারবিরোধী পক্ষের কেন্দ্রবিন্দু জুলফিকার আলী ভূট্টোর প্রভাব খর্ব করার জন্য জামাতে ইসলামীও তদ্দুপ সরকারী সমর্থন পেয়ে আসলি। জামাতে ইসলামীর প্রার্থীদের পক্ষ সমর্থন এবং ওয়ালী খান, ভূট্টো ও শেখ মুজিবুর রহমানের বিরোধিতার কাজে ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলা (যা ছিল প্রকাশ্যভাবে সরকারের হাতে তৈরী) ব্যাকভাবে ব্যবহৃত হতে লাগল। সিঙ্গুতে ভূট্টো বারবার অভিযোগ করছিলেন যে, তাঁর পেছনে গোয়েন্দা বিভাগকে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। পূর্ব বাংলায় শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের প্রার্থীগণও একই ধরনের সরকারী হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছিলেন।

সর্বোপরি আওয়ালপিণ্ডি ও সামরিক হেড কোয়ার্টার থেকে এই মর্মে একটি প্রবল গুজব উঠেছিল যে, ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বরের পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমার সঙ্গে যাঁদের ঘোগাযোগ ছিল তাঁরা আমাকে বলছিলেন, “সামনেই বড় একটা কিছু হতে যাচ্ছে” নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলায় প্রলয়করী সামুদ্রিক জলোচ্ছাস ও ঘূর্ণিবাত উপকূলবর্তী এলাকায় যে ঘরণশোবল হানে, যা ছিল এ শতকের সবচেয়ে মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নির্বাচন মূলতবী রাখার অনুকূলে একটি সুবিধাজনক

অজুহাত এনে দিল। স্পষ্টতঃই এ সময়ে তা করার জন্য সামরিক জান্তার পক্ষ থেকে জোর চাপ এলো।

এই প্রসঙ্গে ইয়াহিয়া খান সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। দুর্ঘে ঘটার একদিন পরে প্রেসিডেন্ট পিকিং-এ তাঁর সরকারী সফর শেষ করে ফিরছেন। ফেরার পরে ঢাকায় তাঁর প্রথম যাত্রাবিবরিতি ঘটে এবং দুর্ঘের খবর শোনামাত্র তিনি এই শহরে চক্রবিশ ঘন্টার জন্য তাঁর যাত্রা স্থগিত রাখেন। দুর্ঘের ব্যাপকতা তখন পর্যন্ত জানা না গেলেও স্পষ্টতঃই ঘটনাটিতে রাজনৈতিক রঙের প্রলেপ দেয়া হল। শহরের সর্বত্র তখন গুজব চলছে, কেউ কেউ আসন্ন নির্বাচন মূলতবীর কথা বলছেন। অন্যেরা এই মর্মে ইঙ্গিত করেছেন যে, সামরিক জান্তা চূড়ান্তভাবে কর্তৃত এহণ করছে এবং ইয়াহিয়া খানের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে তাকে সম্পত্তিশালীদের মধ্যে শীর্ষ স্থানে রাখা হয়েছে।

চাপা উত্তেজনা এতই প্রবল ছিল যে, রাওয়ালপিডির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার প্রাক্তনে ঢাকা বিমান বন্দরে পূর্বপ্রস্তুতিহীন সাংবাদিক সভায় একজন বিদেশী সংবাদদাতা এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে সরাসরি প্রশ্ন করেন। প্রেসিডেন্টের জবাব ছিল ত্বরিত এবং স্পষ্ট। তিনি জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, তিনি তখন পর্যন্ত রাষ্ট্রপ্রধান আছেন এবং যতদিন তিনি সেনাবাহিনীর প্রধান থাকবেন ততদিন রাষ্ট্রপ্রধানও থাকবেন। পদত্যাগ করার ইচ্ছে তাঁর নেই।

কয়েক সপ্তাহ আগে এমন একটি প্রশ্ন ছিল অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। প্রেসিডেন্ট সম্ভবতঃ একটি সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়েই সংবাদদাতার মুখ বন্ধ করে দিতে পারতেন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, তিনি একপ অর্থীকার করাকেই পছন্দ করেছিলেন। এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেশের ভিত্তিতে প্রদত্ত তাঁর জবাবকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল।

এসবই আমার দৃঢ় বিশ্বাসকেই সমর্থন করে যে, নির্বাচনের আসন্ন বিপ্লব এবং তার পরিকল্পনার বিপদ সম্পর্কে ইয়াহিয়া খানকে পূর্বেই সাবধান করে দেয়া হয়েছে। যে ভাবেই হোক, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার মত যোগ্যতা যে তাঁর ছিল, সে সম্পর্কে স্পষ্টতঃই প্রেসিডেন্টের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি মরিয়া হয়ে ঘটনা স্মৃতকে পেছনের দিকে ঠেলে দেবারও চেষ্টা করছেন। কিন্তু নির্বাচনের গতিকে প্রভাবিত করতে সমর্থ ছিলেন না। অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ তাঁর কথায় প্রতারিত হয়নি, তাঁরা সুদৃঢ় কল্পনীয় সামরিক আগলাতান্ত্রিক চক্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়েছিল। যার জন্য তাদের এত জীবন ও রক্ষদান করতে হয়েছে। কেউ তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্য থেকে বিপথগামী করতে পারেনি। নির্বাচনের দিন ইয়াহিয়া খান বুবাতে পারলেন যে, একটা অসম্ভব কিছু ঘটে গেছে।

## নির্বাচনোভর প্রসন্ন

“আজ পাকিস্তান সবচেয়ে কঠিন রাজনৈতিক সংকটের সমূর্ধীন হয়েছে।”

—প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান

মার্চ ১, ১৯৭১।

জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করতে প্রেসিডেন্ট ১ মার্চ, ১৯৭১ যে বক্তব্য রেখেছিলেন বাস্তবে পাকিস্তানের কঠিন রাজনৈতিক সংকট তখন ততটা ছিল না। রাষ্ট্রের সর্বনাশের অথবা পদক্ষেপ হিসেবে ঐ ঘোষণা বেন ধারাল অন্তরে মুখে বাপে দেয়া। চারমাস আগে অর্থাৎ ৭ই ডিসেম্বর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশকাল থেকেই সংকট নিজে অথবাক্ষিণ্ণ হচ্ছিল। ঐ সংকট ছিল জেনারেল ইয়াহিয়া খানের তৈরী।

নির্বাচনের ফলাফল (৩০০ সাধারণ আসন) হল নিম্নরূপ :

আওয়ামী লীগ	—	১৬০
ভূট্টো পাকিস্তান পিপলস পার্টি	—	৮১
স্বতন্ত্র	—	১৬
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	—	৯
মুসলিম লীগ (দৌলতানা গ্রুপ)	—	১
জামাত আলে মুন্না	—	১
হাজারভী গ্রুপ	—	১
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	—	৬
(ওয়ালী খান)		
জামাত-ই-ইসলামী	—	৮
মুসলিম লীগ (এফসি চৌধুরী গ্রুপ)	—	২
পাকিস্তান (ডেমোক্রেটিক পার্টি)	—	১

মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত তেরটি আসনের নির্বাচন পরে অনুষ্ঠিত হয়। এতে আওয়ামী লীগ ৭টি আসন পায়। ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদের জনসংখ্যার

ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করে ১৬৭ টি।

নির্বাচনের ফলাফল বিভিন্ন জনের কাছে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রকাশ পেল। আওয়ামী লীগের পতাকাতলে বাংলাদেশ ছিলেন বিজয় উল্লাসে উৎসুক।

এই প্রথম বারের মত তারা প্রকৃত ক্ষমতা লাভের আশা করছে। এ নির্বাচন থেকে তারা অতীতের ঔপনিবেশিক আদর্শের অবসান এবং দুর্দশকের শোয়ণের প্রতিকারের সামর্থ্য অর্জন করেছে। ভূট্টো সাহেব পাঞ্জাব ও করাচীতে অগ্রস্যাশিত বিজয়ে বিস্তৃত রাজনৈতিক ক্ষেত্র সম্বন্ধে উল্লাস চেপে রাখতে পারেননি। মৌলবাদী গ্রন্থ যথা : জামাত-ই-ইসলামী এ পরাজয় আন্তরিকভাব সঙ্গে মেনে নেয়ানি। জামাত অবশেষে জনসমক্ষে সরকারী ইস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছিল। জনগণ যেভাবে তাদের রায় দিয়েছে তাতে সমগ্র দেশও বিশ্বিত হয়েছিল।

একমাস আগে পূর্ব বাংলার ঘূর্ণিবাড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসের দর্শন বাস্তব  
ক্ষতির চেয়েও পাকিস্তানীদের কাছে নির্বাচনের ফলাফল হল আরো শোকাবহ ও  
ধৰ্মসংস্কারক। এটা ঠিক ধর্মান্ধ প্রগতিবিবেরোধী দলগুলোর মূলোৎপাটনে মতামত প্রকাশিত  
হল। নতুন প্রজন্মের পাকিস্তানীরা পূর্ব পুরষের চেয়ে বেশী শিক্ষিত। তারা  
জনসাধারণের ধর্মানুভূতি ও অভিভাবকে ধর্মব্যবসায়ী ও গোড়া প্রতারকদের রাজনৈতিক  
হাতিয়ার হতে দেয়নি। রাজনীতিতে জিকির আহজারি করে ধর্মের ব্যবহার আর  
কেন ফায়েদা লুটতে পারবে না। অন্যত্র, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের হাতে গড়া  
সামরিক আমলাতাত্ত্বিকচক্র যা ১৯৬৮-৬৯ সালের অভ্যুত্থানে প্রত্যাখ্যাত হয়। এ  
নির্বাচন তাদের সামগ্রিকভাবে প্রত্যাখানের নিশ্চয়তা দিয়েছে। উভয়ের ক্ষেত্রেই নির্বাচন  
সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দেবে। গভীরভাবে লঙ্ঘনীয় এইসব পরিবর্তন শাসকচক্রকে  
বিপর্যস্ত করতে পারতো না, যদি তাদের পেশার প্রতি আনুগত্য থাকতো। যা হোক  
ঠেরা নির্বাচনের ফলাফলে অনুস্মানী এবং অতুর্ভূতি সরকার হিসাবে অঙ্গীকারবদ্ধ যে,  
“গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে এবং যতশীঘ্ৰ সম্ভব নিয়মতাত্ত্বিকভাবে জনগ্রত্তিনিধিদের  
হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য আগ্রানিবেদিত।” এ ধরনের মামুলী বক্তব্য শুরু  
থেকে আজ পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান দিয়ে আসছেন। রাজনৈতিক নেতৃত্বদের সঙ্গে একান্ত  
আলোচনায় প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক দলগুলোর খড়-বিখড় রূপ এবং জাতীয়  
ঐক্যমত্যের অন্পপ্রতিকে প্রধান অগ্রায় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

এমতাবস্থায় শাসকচক্রের নির্বাচনের নির্ধারিত রায়কে স্বাগত জানানো উচিত ছিল। এতে শুধু সাংবিধানিক প্রশ্নে গণতান্ত্রিক সমাধানই সম্ভব হতো না, উপরন্তু বেসরকারী প্রশাসনের কাছে নিরাপদে ক্ষমতা হস্তান্তরের নিশ্চয়তা দিতে পারতো। অন্ততঃপক্ষে এটা বোৰা যেত যে, ইয়াহিয়া খান তাঁর কামনা ফলপূর্ণ করেছেন।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট এটাকে সম্পূর্ণভাবে অন্য দৃষ্টিতে দেখলেন। তিনি নির্বাচনের ফলাফলকে ব্যক্তিগত বিপর্যয় বলে মনে করলেন। তার আইনগত কাঠামো বিধান, যা তিনি সমর্পণে পরিষদ অচলাবস্থার সৃষ্টির জন্য তৈরী করেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। এখন তিনি আর পরিষদে সংবিধান প্রণয়নে শেখ মুজিবুর রহমানের আধানাকে ধোকা দিতে পারবেন না। সে কারণে নির্বাচনের হিসাব বেদনাদায়কভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। ৩১৩ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদের ১৬৭ জন সদস্য বিজয়ে আওয়ামী লীগের নিরবন্ধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলো। এমন কি জাতীয় আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী খানের) সমর্থন না জানালেও এতে কোন অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে না।

প্রেসিডেন্ট যে বাধ্য হয়ে সংখ্যাসাম্য নীতির বদলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের বিধান তৈরী করে পূর্ব বাঙ্গালার মানুষকে দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছিলেন, তার জন্য তিনি এখন নিশ্চয়ই অনুশোচনা করে থাকবেন।

রাজনৈতিক বিভাজন সম্পর্কে প্রাথমিক ভূল হিসাব এবং এ বিষয় পূর্ব বাংলাকে প্রশ্ন দান সবকিছু মিলে জটলা পাকিয়ে গেল। সংখ্যাসাম্য বা প্যারেটি বজায় থাকলে শেখ মুজিবুর রহমান বড়জোর অর্দেক আসন পেতেন পরিষদে, তাতে পরিষদের কার্যাবলী কৌশলের সঙ্গে চালান যেতো। এখন যা হয়েছে, তাতে আওয়ামী লীগের নিরবন্ধু সংখ্যাগরিষ্ঠতা শেখ মুজিবকে এককভাবে নিজ ক্ষমতা জাহিন করার নিশ্চয়তা দিয়েছে। ৯ ডিসেম্বর, ৭১ ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমান দ্বার্থহীন কঠে ঘোষণা করলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬ দফা সম্বলিত স্বায়ত্ত্বাসনের দাবির ভিত্তিতে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হবে। এতে ইয়াহিয়া খান নতুনভাবে আশুক্তি হয়ে উঠলেন। শেখ মুজিব অকপটে খোলাখুলি ঘোষণা করলেন যে সংবিধান প্রণয়নের একক ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।

এক্ষণে আগে থেকে প্রথম বাধাস্বরূপ অর্থাৎ পরিষদের ভোট প্রদান পক্ষতি এখন আদৌ আর বাধা হলো না। সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সংবিধান পাশ করার তাগিদ নিতে পারে। এ কাজ করতে শেখ মুজিব সমন্ত কার্ড টেবিলে রেখে ছয় দফা দিয়ে সমন্ত পিট জিতে নিতে পারবেন। এ হেল অবস্থায় সংবিধান বিলে প্রেসিডেন্টের অসম্ভাব্য জানান হবে বোকায়ি, এমনকি পরিণতি হবে ভয়াবহ। যে গণঅভ্যুত্থানের ফলে আইয়ুব খানের গদি হারাতে হয়েছিল, সংবিধান বিলে সম্ভাব্য না জানালে ফলশ্রুতিতে তার চেয়ে ভয়াবহ গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হতে পারত। সেভাবে তিনি কাজ করলে ইয়াহিয়া খানের প্রকাশ ঘটত একজন বৈরাচারী হিসেবে—ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আন্তর্জাতিক সমাজে নিন্দার ভাগীদার হতেন আর যাবতীয় বৈদেশিক আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের পথ হতো রংক।

প্রেসিডেন্ট এবং তার উপদেষ্টারা জটিল বিকল্প নিয়ে 'যুক্তিহীন' মনোভাবে পরম্পরার সম্মুখীন হয়েছিল। প্রথমটি ছিল, পরিকল্পনার পরাজয়কে গলাধংকরণ করা এবং বেসামরিক সরকারের নিকট অবধারিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর হাসিমুখে মেনে নেওয়া। দ্বিতীয়টি হ'ল এই গণরায়কে মেনে না নেওয়া। এ ছাড়া তৃতীয় কোন পথ ছিল না।

ইয়াহিয়া খান দ্বিতীয় পথ বেছে নিলেন। সংগত কারণে প্রথম পথটি গ্রহণ করেননি। কারণ পরিপতিতে তা হতো আস্থাবাতী—তাঁর উচ্চাকাঞ্চক এবং সামরিক প্রতিষ্ঠানের জন্য। আওয়ামী লীগের ছয় দফা ভিত্তিক সংবিধান শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা করণভাবে র্ব করতো না, এমন কি তার নিজেরও ক্ষমতা হ্রাস পেতো। সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করে দিত কেননা যাবতীয় অর্থ ও বাস্তব উদ্দেশ্যের জন্য প্রদেশগুলোর উপর বিশেষ করে পূর্ব বাংলার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তো। এবং শেখ মুজিবুর রহমান বারবার বলেছেন যে সামরিক বাহিনীর আকাশচূম্বী উচ্চাকাঞ্চক র্ব করবেন যাতে তাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে আর কখনো নাক গলাতে না পারেন।

সে কারণে ইয়াহিয়া খান নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিলেন, আওয়ামী লীগ যতদিন তাদের খসড়া সংবিধানের নমুনা তাদের কাছে পেশ না করবে ততদিন পরিষদের অধিবেশন বসবে না। এটা অনুমান নয়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পরবর্তী কাজের মধ্য দিয়েই এ অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ পেয়েছে।

ইয়াহিয়া খান যদি তাঁর সিদ্ধান্তের বিকল্পটি গ্রহণ করে জনগণের রায়কে মেনে নিতেন, তাহলে পাকিস্তানের অবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভিজ্ঞতর হতো। তাহলে দেশে নির্বাচনোত্তর রাজনৈতিক সংকট থাকতোনা। বা কখনোই দেখা দিত না। দেশ অবশ্যিকভাবে বিভক্ত হয়ে যেতো এবং পূর্ব বাংলার ৩০ লক্ষ লোককে মৃত্যুবরণ করতে হতো না। গণরায় মেনে নিলে ৭১ এর জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে পরিষদের অধিবেশন বসতো এবং নির্দিষ্ট সময়ে সংবিধান গ্রণ্যনে খুব একটা বেগ পেতে হতো না।

১৯৭১ সালের গ্রীষ্মকালে কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলোতে বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করতো, পাকিস্তান অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেত। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচনের পরে দেশের সর্বত্র জনগণ এই আশাই করেছিল এবং এটাও অনেকের জন্ম ছিল, শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সকল সামাজিক ও আর্থনীতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারতেন না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান তা সত্ত্বেও নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন। জনগণ তাঁকে এবারের জন্য সুযোগ দিয়েছেন এবং এটা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের অর্জিত অধিকার।

বেশ কয়েকটি আসন বিশেষতঃ রাওয়ালপিণ্ডি, করাচী এবং সিঙ্গুর কিছু অংশে

আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলো। কিন্তু সব কটি নির্বাচনী এলাকায় তারা পরাজিত হয়েছে। ফলস্বরূপ পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত ১৬৭ জনকে নিয়েই চলতে হবে। ভূট্টো সাহেবের পাকিস্তান পিপসল পার্টি অনুরূপভাবে পঞ্চিম পাকিস্তান থেকে ৮১টি আসন পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১টি আসনও তাঁর দল পায়নি।

পরিষদের এই কৌতৃহলজনক চেহারার মধ্যে শাসকচক্র পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত খেলার অপূর্ব সুযোগ খুঁজে পেলেন। অন্য সুযোগটি হলো মৌলানা ভাসানী এবং অন্য কয়েকজনের '৭০ এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি স্বাধীনতার জন্য জিগির তুলে শেখ মুজিবকে অবশ্য প্লেবীভাবে বক্তব্য রাখতে আহবান জানিয়েছিলেন। এসব ঘটনা শাসকচক্রকে অন্তর্ভুক্ত তৎপরতা চালানোর পথ সহজ করে দিল।

একথা ছাড়িয়ে পড়ল যে দেশের ঐক্য বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। কেউ মৌলানা ভাসানীর দাবির জন্য নিন্দা জানালোনা। পরিবর্তে তাঁর বক্তব্য দিয়ে শেখ মুজিব ও তাঁর দলের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্ব শাসনের প্রস্তাবের প্রতি কালিমা লেপন করা হল। একই সময়ে ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের সংবাদপত্রগুলো এ ধারণা প্রচারে মেতে উঠলো যে, নির্বাচন দুই দল শাসন ব্যবস্থাকেই নয় (আওয়ামী লীগ এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি) বরং দুই 'পাকিস্তান' সৃষ্টিতে উৎসাহী করছে। বাঙালী উঠতি শক্তির হমকির বিরক্তে পঞ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা করতে পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই ভূট্টো-মুজিব একটি গ্রহণযোগ্য সাংবিধানিক সমরোতা সৃত্রের কথা উত্থাপিত হয়।

এই ফাঁদে আটকানোর উদ্দেশ্যপূর্ণ যুক্তি ছিল বাস্তবতার সুস্পষ্ট বিকৃতি। একদিকে ভূট্টো সাহেবের ভাগ্য তারকা যতই উজ্জ্বল হোক সমগ্র পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে শুধু পাঞ্জাব ও সিন্ধুর পক্ষে কথা বলতে তিনি পারেন না। পশ্চিম পাকিস্তানে ৪টি প্রদেশ রয়েছে। ভূট্টো সাহেব শুধু পাঞ্জাব ও সিন্ধুর প্রতিনিধিত্ব করছেন, সমগ্র দেশের নয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাঁর সমর্থক নগণ্য এবং বেলুচিস্তানে তাঁর একেবারেই প্রতিনিধিত্ব নেই। পাঠান ও বেলুচিস্তানের নামজাদা নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের ভাগ্যের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন।

একটি রাজনৈতিক গ্রন্থ যারা সিন্ধু, পাঞ্জাবে ভূট্টো সাহেবের বিরোধী তারাও শেখ মুজিবের গতিপথে আসতে শুরু করেছিলেন। পঞ্চিম পাকিস্তানের এ সমর্থন ও পূর্ব বাংলায় নিরাম্ভুক সমর্থনের বলে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা ভিত্তিক সংবিধান দেয়ার ন্যায়সংগত দাবি করার ক্ষমতা রাখতেন যা দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হত। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তাঁকে ভূট্টো সাহেবের সঙ্গে কোন রকম সমরোতার আর দরকার হয়না। অতএব পরিষদ অধিবেশনের আগেই ভূট্টো-মুজিব সমরোতার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ভূট্টো সাহেব যেটুকু সুযোগ পেতে পারেন তা হল পরিষদের সংখ্যালঘু বা বিরোধী দলের আসন গ্রহণ।

দেশের অবস্থা যে হমকির সম্মুখীন সে সময় এ অভিযোগের সামান্যতম অস্তিত্ব ছিলনা। আমি আগেই বলেছি, মৌলানা ভাসানী এবং তার তৎকালীন অনুচর সহকর্মীরা যারা স্বাধীনতার ধূঁয়া তুলে শেখ মুজিবের আগ্রাহিত প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা চালাচ্ছিল কিন্তু তাদের এসব বক্তব্য রাজনৈতিক অবাণ্যে রোদনই হয়েছে। নির্বাচনের পর তাঁরা নিজেদের ছাড়া অন্য কারোর প্রতিনিধিত্ব করতে পারেননি। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয় লাভ করে স্বায়ত্ত্বাসনের দাবি করলেন— স্বাধীনতার নয়। উল্লেখ করার মতো ব্যাপার এই যে, নির্বাচনের সময় বা আগে এমন কি বিজয়ের পরেও একবারও শেখ মুজিব স্বাধীনতার আহবান জানাননি। পাকিস্তান সরকার ৫ আগস্ট ১৯৭১ তারিখে প্রকাশিত খেতপত্রে এ সত্যের অবতারণা করেছে। ৪নং পাতায় এটা বলা হয়েছে : জনসমষ্টে আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচীর ঘোষণায় পাকিস্তানের সার্বভৌম কাঠামোর কোন পরিবর্তনের বা সংকোচনের দাবি ছিল না।

১৯৬ দাবিতে বলা হয়েছে যে, “সংসদীয় ও মুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার থাকবে” শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী প্রচারণায় বহুবার দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসন চান, দেশের অবস্থা এবং ইসলামী বৈশিষ্ট্য ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাননা। ১৯৭০ সনের ২১ ফেব্রুয়ারী, নাগরণগঞ্জে এক জনসভায় শেখ মুজিব বলেন, “ছয় দফার প্রোগ্রাম আদায় হবে এবং সে সঙ্গে দেশের অবস্থা ও ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ ঢাকায় এক জনসভায় তিনি ‘নির্বাচনকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বাসনের পথে গণভোট বলে চিহ্নিত করেন। সিলেটে অন্য এক জনসভায় ৬ নভেম্বর ১৯৭০ তারিখে তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের ছয় দফা প্রোগ্রাম “কেবল সংবিধানের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বাসনের অধিকার নিশ্চিত করে পূর্ব বাংলার স্বার্থ রক্ষা করাই।” আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলেছিলেন।

এ সবে প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তান সরকার রাজনৈতিক অগ্রগতি সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করেও জেনেছে যে আওয়ামী লীগের নীতি দেশের সংহতির জন্য হমকি ছিলনা, এ ধরনের আশংকা করারও কোন ভিত্তি ছিলনা যে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের উপর আধিপত্য বিভাগ বা অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করবে। তথাপি এ ইয়াহিয়া খানের এ ধরনের কোন ইচ্ছা ছিল না। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের পতন। কৌশল হিসাবে পরিষদ বসার আগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গধে সাংবিধানিক সমস্যা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করা যা আগের মতই রাজনৈতিক যতভেদকে বাড়িয়ে দেবে। প্রেসিডেন্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহজ অন্ত ও সুবিধাজনক পরিস্থিতি উভয় দেখতে পেলেন। অথমটি ছিল জুলফিকার আলী ভূট্টোর ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা। তাকে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিশেষ কৌশলে ব্যবহার করা

যাবে। আৱ দ্বিতীয়টি হলো পৱিষ্ঠদেৱ আকাৰ প্ৰকাৰ। সাধাৱণ নিৰ্বাচনে আওয়ামী সীগ পশ্চিম পাকিস্তানে দুটি অনিষ্টকৰ মনগড়া যুক্তিকেই বজবে এবং নিয়ন্ত্ৰিত সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰা হচ্ছিল এবং সৱকাৰীভাৱে সৱকাৰেৰ পক্ষ থেকে ইয়াহিয়া খান নিজে শেখ মুজিবকে নিৰ্বাচনেৰ পৰে ১৯৭১ সালেৰ জানুয়াৰীৰ মাঝামাবি তাৰেৰ প্ৰথম সাক্ষাৎকাৱে প্ৰশ্ন রেখেছিলেন যে “পাকিস্তান পিপলস পাটিৰ সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসুন।” স্পষ্টতাৰে নিৰ্বাচনেৰ ফলাফল এড়িয়ে গিয়ে পূৰ্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানেৰ মধ্যে দন্ডেৰ পট সৃষ্টিৰ প্ৰস্তুতি চলছিল। আমি আগেই বলেছি এসবেৰ উদ্দেশ্য ছিল একটি রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি কৰা যা প্ৰেসিডেন্টকে সংবিধানেৰ প্ৰশ্নে আৱেকৰাৰ প্ৰতাৱণা কৰাৰ সুযোগ দেয়। যাতে তিনি তাৰ আধিপত্য ও সামৰিক প্ৰাতিষ্ঠানিক স্বার্থ রক্ষা সুনিশ্চিত কৰতে পাৱেন। তা'ছাড়া পূৰ্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানেৰ মধ্যে দন্ড সৃষ্টিৰ অন্য কোন অজুহাত ছিল না।

আমি পৱে দেখাৰ যে, দেশেৰ ঐক্য আবশ্যিকীকৰণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ৰেও কিভাৱে এই দন্ড বাঢ়ানো হচ্ছিল। প্ৰেসিডেন্টেৰ বেসৱকাৰী সাংবিধানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক জি, ডক্ট্ৰিউ চৌধুৱী লন্ডনেৰ বক্তৃতায় এ অভিযোগ প্ৰকাশ না পেলেও কিন্তু লক্ষণে তাৰ যথেষ্ট আলামত ছিল যে, পূৰ্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানেৰ মধ্যে দন্ড ঘটেছে।’ ফলস্বৰূপ রাষ্ট্ৰীয় ভৱানীৰ ঘটেছে। এজন্য আওয়ামী সীগ নয়, ইয়াহিয়া খানই উভয় পৱিষ্ঠিতিৰ জন্য দায়ী।

নিৰ্বাচনেৰ পৱে প্ৰেসিডেন্ট পৰ্দাৰ অন্তৱলে থেকে সুকৌশলে ও উদ্যমেৰ সঙ্গে চাল দিতে থাকেন। কিন্তু জনসমক্ষে তিনি কিছুই কৱেননি, এমন কি বহু আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় পৱিষ্ঠদেৱ আধিবেশন বৈঠকেৰ তাৰিখ পৰ্যন্ত তিনি নিৰ্ধাৱণ কৱেননি।

সারা ডিসেম্বৰ মাস এবং ১৯৭১ সালেৰ প্ৰথম দশ দিন জনগণ যুব কৌতুহলেৰ সঙ্গে লক্ষ্য কৰছিলেন যে, ইয়াহিয়া খান দৃশ্যাত ক্ষুদে পাখি শিকাগীৰ মত মন্ত রয়েছেন। এজন্য তিনি কৱাচী, লাহোৱ, হায়দ্ৰাবাদ, ভাওয়ালপুৰ এবং ভুট্টোৱ আবাসভূমি লাৰকানা এসব স্থানে সিকি ভূমীদেৱ দারা মহোৎসবে আপ্যায়িত হচ্ছেন। যদিও সংবাদপত্ৰ এবং বিভিন্ন ক্লাৰ নানা ধৰনেৰ অন্তৰ গুজবে পূৰ্ণ ছিল। সাধাৱণ জনগণ মোটেই জানতে পাৱল না যে প্ৰেসিডেন্ট একটা বড় খেলাৰ পেছনে ছুটছেন।

ইসলামাবাদেৱ স্টেট ব্যাংক মিলনায়তনে জাতীয় পৱিষ্ঠদেৱ বৈঠক বসাৱ জন্য অষ্টোবৱ-নভেম্বৰ মাসে কাঠ মিঞ্চি, বৈদ্যুতিক মিঞ্চিৰ কাজ এবং আসবাৰপত্ৰেৰ কাজ দ্রুততাৰ সঙ্গে অনেক আগেই শেষ হয়েছে। ঐ চেমাৱে বক্তৃতা বিবৃতি দেয়াৰ জন্য আধুনিক সকল সৱকামাদি এবং সে সঙ্গে বাংলা, উৰ্দু ও ইংৰেজীতে তৰ্জমাৰ ব্যবস্থা ও কৰা হয়েছিল। শুধু একটি জিনিসেৱই অভাৱ ছিল তা হল পৱিষ্ঠদেৱ বৈঠকেৰ জন্য প্ৰেসিডেন্টেৰ ঘোষণা। আমৱা পৱে দেখাৰ এই ঘোষণা ১৩ই ফেব্ৰুয়াৰীৰ আগে

ঘোষিত হয়নি। যখন শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়ে সময় সীমা বেঁধে দিয়ে প্রেসিডেন্টকে বাধ্য করে, তার দু'দিন আগে এ ঘোষণা দেয়া হয়।

এ সময়ে প্রেসিডেন্টের প্রধান কাজ হল আঞ্চলিক বিরোধকে বাড়িয়ে দেয়া যাতে ভূট্টোকে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে মুজিবের অগ্রগতিকে বাধা দেয়া যায়। এ ব্যাপারে ভূট্টোও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে স্বেচ্ছায় আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

আমি বহু বছর ধরে ভূট্টো সাহেবকে জানি। তাঁর আকর্ষণীয় রাজনৈতিক সৌভাগ্যের পরিবর্তন খুব কাছে থেকে অতিরিক্ত প্রীতির সঙ্গে জেনেছি। আমি সব সময় চতুর রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁকে দেখেছি। কিন্তু তিনি অতিরিক্তভাবে উচ্চাকাঞ্চনী ও ঔর্ধ্বর্য হয়ে পড়েছেন। রাজনৈতিক স্নায়ুতে প্রাথমিকপর্বে অনিবার্যরূপে তিনি সুবিধাবাদীর অঢ়েল রঙে নিজেকে গাড়িয়েছেন।

আইয়ুব খানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে গঠিত আমলা-সামরিক প্রাতিষ্ঠানিক চক্রকে উৎখাত করতে গণঅভ্যুত্থানকে ভূট্টো সাহেব সাহসের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তারপর আজাবিরোধী হলেও জনতার সঙ্গে আরেকবার বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য তিনি ইহুদীদের ছাগলের ভূমিকায় নিজেকে ব্যবহৃত হতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে মহড়ের উপাদান ছিল। সুবিধাবাদই তাঁর ভৱান্বিত ঘটিয়েছে। এর জন্য তাঁকে শাস্তি পেতে হচ্ছে।

নির্বাচনের পরিসংখ্যানে পাঞ্জাবের বিজয় প্রেক্ষিতে তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের নিরক্ষুণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার স্বাতের মুখে ভূট্টো সাহেব অসহায় বোধ করলেন। তিনি বুঝলেন যে ঘটনার স্বাভাবিক নিয়মে তিনি বড় জোরের পাঞ্জাব ও প্রাদেশিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ পেতে পারেন। কিন্তু কেন্দ্রে এবং জাতীয় পরিষদে তাঁর ভূমিকা হবে সামান্য। সম্ভবতঃ বিরোধী দলের নেতার ভূমিকা পালন করতে হবে। এটা এমন জিনিস যা তিনি কখনো হজম করতে পারবেন না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রধান হিসেবে তিনি নাসেরের মত তাঁর ভূমিকা মনশক্তে দেখতেন।

ভূট্টো সাহেব সভামণ্ডে দাঁড়িয়ে যে গণতান্ত্রিক অনুশীলনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন— তিনি যদি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তা মেনে চলতেন তা'হলে এক সংময়ে তিনি তাঁর কামনা পূর্ণ করতে পারতেন। শেখ মুজিবুর রহমান অবশ্যে সব সমস্যার সমাধান করতে পারতেন না। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিব বিরোধী দলের সমালোচনার শিকার হয়ে পড়তেন। তখন ভূট্টো তাঁর বিপ্লবী আর্থনীতিক কর্মসূচী নিয়ে অংসর হতে পারতেন। কিন্তু অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য তাঁর ছিল না।

ভূট্টো সাহেব চতুরতার সঙ্গে উপলক্ষ করলেন, যে তাঁর ব্যক্তিগতের সঙ্গে নামরিকচক্রের স্বার্থের মিল রয়েছে। সুতরাং তিনি যদি হাতের তাস ঠিক মত চালতে

পারেন তা হলে দেশের শীর্ষপদ তীরবিদ্ধ করতে পারবেন। আমি নির্বিধায় ধরে নিতে পারি যে ভূট্টো সাহেব শুরু থেকেই ইয়াহিয়ার সব কৌশল জানতেন। তিনি এই ভাস্ত ধারণা পোষণ করতেন যে, এইসব কিছু তিনি তাঁর স্বার্থে লাগাবেন এবং অবশ্যে প্রেসিডেন্টকে পর্যুদন্ত করতে পারবেন। অতিরিক্ত আওয়াবিধাস কিংবা নিজের সম্পর্কে অতিশয় শুরুত্ব দানের জন্য ভূট্টো সাহেব বুঝতে পারেননি যে শেখ মুজিবুর রহমানের পতন ঘটাবার জন্য গণতান্ত্রিক প্রতিযাকে যেভাবে প্রতারণা করতে হচ্ছে তা একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে তার মর্যাদাকেও স্কুল্প করবে এবং প্রেসিডেন্টের কুমতলৰ হাসিল হলে তিনি আর ভূট্টোকে ব্যবহার করবেন না।

ঘটনা যাই হোক, নির্বাচনের পর ভূট্টো অতি বেশী উৎসাহী হয়ে পড়লেন এবং বিরাট একটা কিছু ইওয়ার স্বপ্নে তখন তাঁর মন বিভোর ছিল, বৈধভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের মনে যে স্বপ্ন থাকতে পারত সম্ভবতঃ তার চেয়েও বেশী। এ হেন অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতা প্রথমবারের মত ভূট্টোর সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। যিনি শেখ মুজিবের বাণী ভূট্টো সাহেবের জন্য বয়ে নিয়ে গেছেন তিনি আমাকে প্রথম বারের মতো এই ঘটনা বলেছেন, এই বিশেষ দৃত ছিলেন লভনস্ত একজন বাঙালী ছাত্র, তিনি ঢাকায় খড়কালীন সফরে ছিলেন। তিনি উভয়ের কাছেই খুব পরিচিত। আমি এখানে তাঁর নামের উল্লেখ করিনি। এটা করিনি শুধু তাঁর নিরাপত্তা ও অনুরোধের কারণে। নির্বাচনের তিনি সংগ্রাহ পরে তিনি যখন শেখ মুজিবুর রহমানকে ভূট্টো সাহেবের সৌজন্য সাক্ষাতের অভিপ্রায়ের সংবাদ জানালেন, প্রত্যুক্তে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব বলেন, ‘ভূট্টো সাহেবকে বলো, তিনি যদি উচ্চ পদ দাবি করেন আমি তা’ দিতে প্রস্তুত আছি। তবে তিনি যদি আমার ছয় দফা গ্রহণ করেন।’” শেখ মুজিব ভূট্টো সাহেবকে চেয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সামরিকবাহিনীকে রাজনীতি থেকে বের করে সেনাছাউনীতে ফেরত পাঠাতে।

শেখ মুজিবের বাণী যথারীতি করাচীতে বয়ে নেয়া হল। ভূট্টো সাহেব লারকানা থেকে সবে তখন ফিরেছেন এবং তাঁর ক্লিফটনের মনোরম বাসভবন যথারীতি শুলজার করছিলেন। সেখানে মোসাহেব ও বঙ্গদের ভীড়, সে সঙ্গে নবনির্বাচিত উভয় পরিষদের ক'জন সদস্যও রয়েছেন। ভূট্টো সাহেবের খাস মহলে বাঙালী ছাত্র নেতাকে আমন্ত্রণ করা হল। সেখানে তিনি একগ্লাস ছইক্সি পানের ফাঁকে গোপনে তাঁর দৃতলিবাণী পৌছে দিবেন।

ভূট্টো সাহেব ভাবাবিষ্ট হলেন, তিনি স্বার্থ জড়িত দুটি বড় চোখের ঔৎসুক্যের চাহনি দিয়ে জিঞ্জেস করলেন, সত্যি কি তিনি (শেখ মুজিব) একথা বলেছেন? যখন বার্তা সত্য বলে জানলে, ভূট্টো সাহেব তাঁর শুরুবারের বিশেষ সহচর বাবুকে সরাসরি আলাপের জন্য শেখ মুজিবের টেলিফোনে সংযোগ দিতে বললেন। কিন্তু আওয়ামী

লীগ নেতাকে বাসায় ও পার্টি অফিসে টেলিফোনে পাওয়া গেল না। ভূট্টো সাহেব দমে গেলেন না। তিনি বললেন আমার বার্তাবাহক শেখ সাহেবের কাছে যাচ্ছেন, “তাঁকে বলবেন, আমি ক'টা উপনির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। এখন সাক্ষাৎ করতে পারছি না। কিন্তু আমি মোস্তকা খারকে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে পাঠাচ্ছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে ছয় দফার বিরোধী নই, তবে আমার সঙ্গে আমার পার্টিকেও নিতে হবে।”

এই বার্তা পর দিনই টেলিফোনে শেখ মুজিবকে জানিয়ে দেয়া হয়। একদিন পরে ভূট্টো সাহেবের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মোস্তকা খার ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রধানের কাছে অভিনন্দন বার্তা পৌছে দিলেন।

এ ঘটনা থেকে কিছু এসে যায় না, তবু এ ধরনের রোমহুন সে সময়ের পাকিস্তানের রাজনৈতিক অভ্যন্তরীণ রহস্যময় অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। ভূট্টো সাহেব তখন ক্ষমতার শীর্ষ পদ দখলের চিন্তায় বুঁদ হয়ে আছেন, তিনি আঁঁচাহের সঙ্গে একজনের প্রস্তাবে প্রলোভিত হলেন, কেননা ব্যক্তিটি পরিষদে তাঁর সব পাওয়ার সুযোগ করে দিতে পারেন। এ তথ্য থেকে ব্যাখ্যা দেয়া যায় যে, ভূট্টো সাহেবের পরবর্তীকালে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের প্রতি বুঁকে পড়ার কারণ, যখন তিনি দেখলেন প্রেসিডেন্ট কোনক্ষেই শেখ মুজিবকে তারপক্ষে চলতে দিতে দৃঢ়ভাবে নারাজ। কিন্তু শেখ মুজিব কি আত্মিকভাবে সচেতন ছিলেন? না কি তিনি দানা ছড়াচ্ছিলেন? (দানা অর্থ খাদ্য শস্য, এখানে সিন্ধু ও পাঞ্জানের ছেঁদো রাজশীতিবিদের ফাঁদে ফেলতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে)।

শেখ মুজিবের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব এবং তাঁর মানসিকতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে খুব কাছ থেকে জানার অভিজ্ঞতা আমাকে তাঁর আত্মিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিত করেছে। এটা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দৃশ্যতঃ প্রধানমন্ত্রী পদের শুরুত্বহ্রাস করেছে। শেখ মুজিব নিজেই বলেছেন যে, তিনি ঐ পদের জন্য উদ্বাহন নন বরং তিনি নিজ প্রদেশের উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।

অন্যটি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে দলীয় গঠনতত্ত্ব ও ছয় দফা কর্মসূচী ভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের প্রশ্নে সরকার অনুমান করে পূর্বেই ব্যর্থ করে দেবে এ বেদনাদায়ক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। পূর্ব বাংলায় ও পরিষদে অনবদ্য অবস্থান সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয়ী ছিলেন শেখ মুজিব। তিনি যথার্থ দূরদৃষ্টি দিয়ে উপলক্ষ্মি করেছিলেন যে কি ভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে অস্বিধা সৃষ্টি'র জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। ভূট্টো সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি জেনারেলদের দিকে চাল ঘুরিয়ে দিয়ে থাকবেন। এ হেন পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট দেশের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যর্থ করে দিলেন, জনগণ ও সামরিক শাসকচক্রের মধ্যে সরাসরি লড়াই বেঁধে

যাবে। এটা আইয়ুব খানের পতনের সময় গণ-অভ্যুত্থানের মতো তীব্র হতে পারে এবং পরিসমাপ্তিও একই রকম হবে।

এইসব পরিস্থিতিতে, ভূট্টো সাহেবকে উচ্চ পদের প্রস্তাব ছিল সুচিত্তি প্রথম চাল এবং এ জন্য সামান্য মূল্য দিয়ে সামরিক বাহিনীকে রাজনীতি থেকে বিদায় দিয়ে ব্যারাকে ফিরিয়ে দেয়া। এটা প্রচেষ্টার জন্য বার্থ হয়নি। ইয়াহিয়া খানের নির্বাচনোত্তর প্রহসনের এক ধাপ অংগতির কারণেই তা হয়েছে। তাছাড়া ভূট্টো সাহেবের মনে প্রেসিডেন্টের সামরিক বাহিনীর পৃষ্ঠপোষকতা ও নিয়ন্ত্রণের প্রভাবের জন্যই তা ব্যর্থ হয়েছে।

১৩ জানুয়ারী নির্বাচনের ঠিক ছয় সপ্তাহ পরে ইয়াহিয়া খান বহু বিস্তৃত শিকার ত্যাগ করলেন এবং জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসলেন। প্রেসিডেন্ট অবশ্য আগেই লারকানায় ভূট্টো সাহেবের সঙ্গে আলোচনা সেরেছেন। এটাকে বর্ণনা করা হয়েছে আকস্মিকভাবে মত বিনিময়ের আলোচনা, কেননা প্রেসিডেন্ট তখন ঐ এলাকায় সফরে ছিলেন। কিন্তু যতই এটা নৈমিত্তিক বলে চালান হোক না কেন আওয়ামী লীগের এটা দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

সংবিধান প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদের শীত্র অধিবেশনের আহবান জানিয়ে বারবার শেখ মুজিবুর রহমান ব্যর্থ হচ্ছিলেন। শেখ মুজিব নিজের অবস্থান দ্রু করার জন্য আওয়ামী লীগ সদস্যদের দলীয় গঠনতাত্ত্বিক ছয় দফা কর্গসূচীর প্রতি অবিচল আনুগত্য প্রকাশের কারণে জনসমক্ষে শপথ গ্রহণ করালেন। এ ঘটনা পশ্চিম পাকিস্তানে দুর্ঘজনক প্ররোচনা হিসাবে গৃহীত হল। এই সব জটিল বিষয়গুলি আরো ত্বরান্বিত হল পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় সংবাদপত্রে শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাত করছেন না এই সংবাদ প্রকাশের ফলে। কিন্তু তিনি তার বাসভবনের নির্ধারিত বৈঠকে করতে চেষ্টা করছেন মর্মে সংবাদ প্রচারিত হল। এ ধরনের বানোয়াটি গুজব যা দুর্দশির কৌশল হিসেবে চালান হচ্ছিল। এটা এমন এক পর্যায়ে পৌছলে শেখ মুজিব জনসমক্ষে তা অঙ্গীকার করতে বাধ্য হলেন। আওয়ামী লীগ প্রধান স্পষ্ট করে জানালেন প্রেসিডেন্ট যখন ঢাকায় সফরে আসবেন তখন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান হবে, শুধু তাই নয় তিনি স্বয়ং বিধায়ীনভাবে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হবেন।

এতকিছু ঘটে যাওয়ার পরেও প্রেসিডেন্ট ও আওয়ামী লীগ প্রধানের মধ্যে বৈঠক কোনোরূপ মনোমালিন্য ছাড়াই আস্তরিক পরিবেশে সমাপ্ত হয়। সংবিধান সংস্করণে তার ধারণার বিশদ আলোচনা না করেও শেখ মুজিবুর রহমান প্রস্তাবিত আদেশিক স্বায়ত্ত্বাসননের কাঠামোতে সামরিক বাহিনীর অবস্থান সম্বন্ধে প্রেসিডেন্টের কতগুলো ভুল ধারণা দূর করতে চেষ্টা নিয়েছিলেন। আমি জানি যে শেখ মুজিব ইয়াহিয়া

খানকে আগামী দু'বছরের সামরিক বাজেট অপরিবর্তিত থাকবে মর্মে আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এই সাক্ষাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে ১৭ই এপ্রিল ১৯৭১ এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ প্রধানের একান্ত বিশ্বস্ত সহচর এবং বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ বলেনঃ “জেনারেল ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের গৃহীত কর্মসূচী শপথনামার অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং এ সবের নিহিতার্থ সম্বন্ধে অবগত থেকেই আশ্বস্ত হয়েছেন। কিন্তু আশার বৈপরীত্যে, ইয়াহিয়া খান সংবিধান সংক্রান্ত তাঁর ধারণা কথনই প্রকাশ করেননি। জেনারেল ইয়াহিয়া খান এমন হাবভাব দেখালেন যে ছয় দফায় আপত্তিজনক কিছু দেখতে পাননি, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টির সঙ্গে সমরোতায় আসার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন।”

প্রেসিডেন্ট রাওয়ালপিংডির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগের পূর্বে সাংবাদিকদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তায় শেখ মুজিবকে দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বললেন। বাঙালীরা এতে উৎফুল্ল ও বিস্মিত হলো।

প্রেসিডেন্ট কি আন্তরিক ছিলেন? এতে আমার সন্দেহ রয়েছে। যদি তা হতেন প্রেসিডেন্ট তাহলে শেখ মুজিবের ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার দাবি মেনে নিতে ততটা আপত্তি করতেন না। পক্ষান্তরে, ইয়াহিয়া খান কথন জাতীয় পরিষদ বসবে তার কোনো ইঙ্গিত দিলেন না বরং ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) সঙ্গে সমরোতায় আসতে চাপ সৃষ্টি করছিলেন। ভুট্টো সাহেবকে আগে থেকেই শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি রেখেছিলেন। এ ঘটনা পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মধ্যের বিরোধকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহৃত হলো।

২৭ জানুয়ারি ১৯৭১ ভুট্টো সাহেব যখন দলের লোক লক্ষ্য ও উপদেষ্টাদের নিয়ে ঢাকা পৌছলেন তখন তাঁর মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ডিসেম্বরের শেষের দিকে শেখ মুজিবের বার্তা পেয়ে যতটা আগ্রহের ভাব দেখা দিয়েছিল এখন তা নেই। যদিও ভুট্টো আওয়ামী লীগ প্রধানের সঙ্গে আধ ঘন্টা অন্তরঙ্গ একান্ত বৈঠক করেছেন কিন্তু তাতে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের সঙ্গে হাত মেলানোর কোন লক্ষণই ভুট্টো পরিকল্পনা করে দেখাননি। পরম্পর ছয় দফা গঠনতন্ত্রের তিনি ব্যাখ্যা চেয়েছেন। তাঁর মনোভাব সর্বতোভাবে শেখ মুজিবের জন্য হতাশাজনক ও হতবুদ্ধিকর ছিল। তাজউদ্দিন সাহেব এ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ।

“ইয়াহিয়ার মতো ভুট্টো সাহেবও সংবিধানের গঠন সম্বন্ধে কোন বাস্তব প্রস্তাবনা দিতে পারেননি। তিনি এবং তাঁর উপদেষ্টারা প্রধানতঃ ছয় দফার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনাতেই উৎসাহী ছিলেন। যেহেতু তাঁদের অভিব্যক্তিই ছিল নেতৃত্বাচক এবং

তাঁদের নিজস্ব কোন যুক্তিও এখানে দাঁড় করাননি সে কারণে দুটি দলের মধ্যে কোন আন্তরিক সমরোতা সৃষ্টিতে বা উভয় দলের মধ্যে বিদ্যমান শূন্যতা পূরণে আলোচনার কোন সম্ভাব্য অগ্রগতি হয়নি। এ থেকে বোঝা যায় যে ভূট্টো সাহেবের তখন নিজের কোন আনুষ্ঠানিক অবস্থান ছিল না যা দিয়ে তিনি সমরোতার আলোচনা চালিয়ে যেতে পারতেন।

তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের উপসংহারে আমি একমত হতে পারছি না। ভূট্টো অতটো বোকা ছিলেন না। তিনি কী চাইছেন সে সম্পর্কে তাঁর কোন নির্দিষ্ট ধারণা নেই এটা ঠিক নয়। আসলে বিষয়টি দাঁড়াল এই, ইয়াহিয়া খান ও ভূট্টো চক্র শেখ মুজিবকে অবরোধ করার জন্য আগে থেকে গোটহড়া বেঁধে রেখেছেন। আওয়ামী লীগের কাছে অকালে দাবি তুলে তাঁরা তাঁদের অভিসন্ধি ফাঁস করে দিতে চাননি। সেটা পরে আসবে। তখনকার মতো আলোচনার গতি রক্ষা করে জনগণ ও আওয়ামী লীগ উভয়কে প্রতারণা করাই যথেষ্ট ছিল। এবং আগামীতে অভিযোগ উপস্থাপনের ভিত্তি প্রস্তুত করা হচ্ছিল। এই ঘোর দৌরাত্যাপূর্ণ প্রসঙ্গের প্রথম পদক্ষেপ হল প্রেসিডেন্টের শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার আর দ্বিতীয়টি হলো ঢাকায় দুই সপ্তাহ পরে ভূট্টো শেখ মুজিবের আলোচনা।

অন্যান্য পদক্ষেপের পর্যায়ক্রম নির্দলণভাবে বিশ্বাসকরঃ ২৯ শে জানুয়ারী : ভূট্টো সাহেব শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা অমীমাংসিত রেখে ঢাকা ত্যাগ করলেন। তিনি যাওয়ার সময় ঐকমত্য প্রকাশ করেন যে আলোচনার দরজা প্রস্তুতভাবেই খোলা রয়েছে, তিনি আবার আলোচনার জন্য আসবেন। কিংবা আলোচ্য বিষয়গুলি পরিষদের লবিতে বা কমিটিগুলিতে উপস্থিত হবে।

১১ই ফেব্রুয়ারী : মুলভানে দুদিন ব্যাপী দলীয় প্রতিনিধিদের সভার পর ভূট্টো সাহেব সাংবাদিকদের বলেন যে, পি পি পি'র খসড়া সংবিধানের কাজ শেষ পর্যায়ে এসে পৌছেছে।

১২ই ফেব্রুয়ারী : ভূট্টো রাওয়ালপিণ্ডিতে গিয়ে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় মিলিত হলেন এবং খসড়া সংবিধানের বিষয়ে তাঁর মতের আপেক্ষিক পরিবর্তন হলো।

১৩ই ফেব্রুয়ারী : ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঢাকায় দুরা মার্চ বসবে। ভূট্টো পেশোয়ার ফিরে গেলেন। ঐ রাতেই এক ককটেল পার্টিতে ভূট্টো সাহেব গ্লাস হাতে হঠাৎ যে কথা বললেন তাতে সবাই বিদ্যুৎ ঝলকের মতো চমকে উঠলেন।

“ভূট্টো আরেকবার ঘোড়ার জিনে পা রেখেছেন ক্ষমতাসীনেরাও তাই চায়। মুজিবকে বার করে দেয়া হয়েছে। আমিই হবু প্রধানমন্ত্রী।”

১৪ই ফেব্রুয়ারী ৪ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রধান ওয়ালী খানের সঙ্গে ভূট্টো সাহেবের দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছে। ভূট্টো সাহেব চাচ্ছেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে বিরোধিতা করতে, ওয়ালী খান সাহেব তার সঙ্গে হাত মেলান। যখন ওয়ালী খান প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন, ভূট্টো সাহেব সঙ্গে পনে তাঁকে বললেন, ‘আমার দলও জানে না যে আমি ঢাকায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যাচ্ছি না।’

১৫ই ফেব্রুয়ারি ৪ পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভূট্টো সাহেব বলেন যে তিনি ঢাকায় পরিষদ অধিবেশন বয়কট করবেন যদি না পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ সংরক্ষণে সংবিধানের রূপরেখায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পূর্বাহ্নে একমতে পৌছানো যায়। ভূট্টো সাহেব হমকি দেন, ‘পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোন সদস্য পরিষদে যোগদানের চেষ্টা করলে ‘পা ডেসে দেয়া হবে।’

২১শে ফেব্রুয়ারী ৪ ইয়াহিয়া খান তাঁর অসমারিক মন্ত্রিসভা বাতিল করেন এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে সামরিক গর্ভর্ণ ও সামরিক আইন প্রশাসকদের একটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। যদিও কোন সরকারী ঘোষণা দেয়া হয়নি, শহর গুজবে পূর্ণ ছিল, কেউ বলছে পরিবর্তন আসন্ন, অন্যরা এমনও বললেন, প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিব্রত হয়ে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকারের আন্দোলন স্থগিত রয়েছেন।

২৪-২৮শে ফেব্রুয়ারী ৪ ভূট্টো সাহেবের হমকি সন্দেশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ন্যূনতম ৩৬ জন পরিষদ সদস্য উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদানের জন্য ঢাকায় আসার টিকিট বুক করেছেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী ৪ ভূট্টো সাহেব জনসমক্ষে পরিষদের অধিবেশন স্থগিত রাখার আহ্বান জানান।

১লা মার্চ ৪ ইয়াহিয়া খান সংব্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা না করেই জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন অনিদিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। অজুহাতে বলা হলঃ পূর্ব পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব বা বিরোধ এবং পিপিপি দলের অধিবেশন বয়কট, এসবের কারণ হিসেবে বলা হলঃ “পাকিস্তানে গভীরতম রাজনৈতিক সংকট।”

আমি রাজনৈতিক ঘটনাবলির কাঠামোর প্রধান দিকগুলো পেশ করেছি কেননা এগুলো পরিকারভাবে দুর্কর্মের ধারাবাহিক সংযোগসমূহ এবং নির্বাচনপূর্ব প্রহসনের নয়নার বিষয়েই প্রকট করে তোলে।

থ্রিত, শাসকচক্র ভূট্টো সাহেবের সক্রিয় সহযোগিতায় সুপরিকল্পিতভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে। তারপর এই বিরোধকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন এবং এর সংবিধান প্রণয়নে বাধা দেয়। এসব করা হয়েছে দুর্বল যুক্তির অজুহাতে এবং সত্ত্বের স্পষ্টতম বিকৃতি ঘটিয়ে।

পরিষদের অধিবেশন বর্জনের ঘোষণার সময় ভৃট্টো সাহেবকে এ ধারণা দিয়েছিল যে পরিষদ হবে শুধুমাত্র সংবিধান অনুমোদনের জন্য, যা আওয়ামী লীগ আগেই প্রণয়ন করেছে এবং যার কোন শব্দের এক ইঞ্জিন সরানো যাবে না। ভৃট্টো সাহেব আওয়ামী লীগের খসড়া সংবিধান দেখেননি বা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সঙ্গে বিকল্প প্রস্তাবাবলি নিয়ে আলোচনাও করেননি। ১৭দিন আগে যথন তিনি ঢাকা ত্যাগ করলেন তখন এ ধরনের অচলাবস্থার সামান্যতম ইঙ্গিত দেননি। তিনি বিশেষভাবে আভাস দিয়েছিলেন যে তিনি আবার শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি আবার কোন যোগাযোগ রক্ষা করেননি, সুতরাং কখন অচলাবস্থা সৃষ্টি হল?

শেখ মুজিবুর রহমান আলোচনার জন্য নিজেকে উন্মুক্ত বেখেছিলেন, একটি বিষয়ে তিনি জোর দিতেন তা হল গণতন্ত্রের প্রয়োজনে জাতীয় পরিষদে বর্তকের মাধ্যমে সংবিধান গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। পরিষদের বাইরে গোপনশালার সংবিধান প্রণীত হওয়া উচিত নয়। তিনি এ. মনোভাব কখনও দেখাননি যে, তিনি শক্তির মাধ্যমে পরিষদকে ব্রাবার ষ্ট্যাম্প হিসাবে ব্যবহার করে সংবিধান পাশ করিয়ে নেবেন। নিশ্চিতভাবে এ কথা তিনি কখনই বলেননি যে আওয়ামী লীগের প্রণীত খসড়া এক ইঞ্জিন এন্ডিক বা ওদিক নড়ানো যাবে না? সুতরাং ভৃট্টো সাহেবের ধারণা হলো আচর্যজনক। হয়ত তাঁর কৌতুহলোদীপক অতীন্দ্রিয় কল্পনামূর্তি রচনা করার ক্ষমতা ছিল যা দিয়ে তিনি অদৃশ্য বস্তু দেখতে পেতেন অথবা তিনি বিশেষ কর্মসূচী নিয়েই ও সব কাজকর্ম করছিলেন। যাহোক তিনি অতিশয় ধীশক্তি সম্পন্ন হবেন, তাই বলে তিনি সুদূরে মন বীক্ষণ করতে পারেন, সে দাবি করতে পারবেন না। সুতরাং যে ধারণা হয়, তা হল তিনি বিশেষ কর্মসূচীর আকর্ষণেই এসব কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। ঘটনার পরম্পরায় তাতেই যুক্তিসংস্কৃত সমর্থন মেলে। ফেরুয়ারী মাসের মাঝামাঝি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ সংঘামের কর্মসূচীই প্রেসিডেন্টকে ১৩ ফেব্রুয়ারীতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের জন্য একটি তারিখ ঘোষণা করতে বাধ্য করে। এটাও ইঙ্গিতহীন ছিল না, প্রেসিডেন্ট রাওয়ালপিণ্ডিতে এক নাগাড়ে ভৃট্টো সাহেবের সঙ্গে আলোচনার একদিন পরই ঐ ঘোষণা দেয়া হয়।

ভৃট্টো সাহেব মাত্র ৭২ ঘটনার মধ্যে জনসমক্ষে তাঁর আকস্মিক সম্পূর্ণ মত পরিবর্তন করলেন, তা সহসা ঘটনা সমূহের যুগপৎ সংঘটন ছিল না। ১১ই ফেব্রুয়ারী মূলতানে তিনি পিপিপির খসড়া সংবিধানের চূড়ান্ত পর্যায়ের কথা বলেছেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী তিনি আওয়ামীলিপিভিতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। ১৪ই ফেব্রুয়ারী পেশোয়ারে তিনি পরিষদ অধিবেশন বর্জনের কথা ওয়ালী খান সাহেবকে বলেছেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ককটেল পার্টিতে শাসকচক্রের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভৃট্টোর হঠকারিতার

কথাও ভুলবার নয়। এসমস্ত প্রমাণ থেকে আর মাথা ঘামানো প্রয়োজন হয় না কে কার সঙ্গে এবং কি উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করেছেন।

একই সময়ে শেখ মুজিব কি করছিলেন? নিচয়ই ভূট্টো সাহেব কিংবা খোদ প্রেসিডেন্টের মত তিনি ক্ষতিকর কিছুই করেননি। জানুয়ারী থেকেই বিদেশী পত্রিকার সংবাদদাতা উল্লেখ করছিল যে, আওয়ামী লীগ নেতা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন। এটাকে অপরিহার্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই বিরক্তিজনক কারণেই পরিষদের অধিবেশন আহবানে বিলম্ব হয়।

ভূট্টো সাহেব পরিষদের অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা সত্ত্বেও শেখ মুজিব উত্তেজিত হননি। আমার ধারণায় শেখ মুজিবের একমাত্র ভুল হল, তিনি পশ্চিম পাকিস্তান নির্বাচনের সফরে যাননি। করাচী, লাহোর ও রাওয়ালপিংডিতে যদি তিনি স্বল্পস্থায়ী সফরে বক্তৃতা দিতেন, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি অনেক শুভকাঙ্ক্ষী গেতে পারতেন। তাহলে কায়েমী স্বার্থান্বেষী দলগুলো তাঁর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক যে প্রচার চালাচ্ছিল তাও ব্যর্থ হত।

ইয়াহিয়া খান পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তাও অর্থহীন। ১৯৭১ সালে ১লা মার্চে প্রদত্ত তাঁর বেতার ভাষণে তিনি বলেছেন :

‘গত কয়েক সপ্তাহে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে কয়েকটি আলোচনা বৈঠক বাস্তব ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, যে একটা মতেক্ষে পৌছানোর পরিবর্তে আমাদের কোন কোন নেতা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছেন। এটা হল সবচেয়ে দৃঢ়জনক পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি জাতির উপর বিষণ্ণতার ছায়া ফেলেছে। পরিস্থিতি সংক্ষেপে হল এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং আরো কয়েকটি রাজনৈতিক দল এমন মনোভাবের কথা ঘোষণা করেছে যে তাঁরা তুরা মার্চের ৭১ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হবেন না। উপরন্তু তারত কর্তৃক সৃষ্টি সাধারণ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সমগ্র পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। সে কারণে, আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পরবর্তী তারিখে আহবানের জন্য মূলতবী রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এই ভাষণে আরো যুক্তি দেখাতে গিয়ে ইয়াহিয়া খান বলেন, “আমি জেনেছি যে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকে প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে যদি তুরা মার্চ পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের কাজে অঘসর হই তাহলে পরিষদের সংহতি বিনষ্ট হতে পারে এবং আমার পূর্বঘোষণা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।”

পাকিস্তানের ইতিহাসের গতি পরিবর্তনকারী রূপে চিহ্নিত এই ভাষণ আসল ঘটনা বর্জনের জন্য এবং তার চেয়েও কৌতুহলীদপক যুক্তি ও সত্য ঘটনার ডাহা বিকৃতির জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, প্রেসিডেন্ট পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধ বা দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন এবং আওয়ামী লীগের উপর দোষারোপ করেছেন। ভূট্টো সাহেবের সমালোচনা তিনি একেবারেই করেননি।

দ্বিতীয়ত, ভূট্টোর অধিবেশন বর্জনের কারণে পরিষদের সংহতি বিনষ্ট হবে এমন আশংকার পেছনে ইয়াহিয়া খানের কোন যুক্তি ছিলনা। ১লা শার্ট পশ্চিম পাকিস্তানের ৩৬ জন সদস্যসহ পরিষদের দুই ভূট্টীয়াংশ-এরও অধিক সদস্য সশরীরে ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। উদোধনী অধিবেশনের নির্ধারিত তারিখে আরো কয়েকজন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উদোধনী দিন অর্থাৎ তৃতীয় মার্চের মধ্যে আকাশপথে ঢাকায় আসবেন বলে আশা করা গিয়েছিল।

সব প্রদেশের প্রতিনিধিই ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন, এমন কি সিঙ্গু এবং পাঞ্জাব থেকেও। সেগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে বলে ভূট্টো সাহেব দাবি করেন। কেবল পিপিপি ও কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগের সদস্যগণই অনুপস্থিত থাকতেন। এগন কি এই দুই দলের সকলেই অনুপস্থিত থাকতেন না, কেননা এই দুটি দলের কয়েকজন সদস্য বিদ্রোহের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এবং সম্ভবতঃ শেষ মুহূর্তে তাঁরা ঢাকায় এসে হাজির হতেন।

তৃতীয়ত, প্রেসিডেন্টের যদি সদিচ্ছা থাকতো তাহলে তিনি সামরিক আইন আদেশ বলে সংবিধান প্রণয়নের পথে বল প্রয়োগ, বিশৃঙ্খলা ও প্রতিবন্ধকতা নিয়মিত করে অধিবেশন বর্জনের চেষ্টাকে সহজেই দমন করতে পারতেন। ভূট্টোর ঠ্যাং ভেঙ্গে দেওয়ার হ্যাকি সামরিক আইন অপরাধের আওতায় পড়ে। যে আইনগত কাঠামো আদেশের বিধানের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে তাতেও পরিষদ বর্জনের হ্যাকির বিরুদ্ধে আরো প্রতিকারের বিধি ব্যবস্থা ছিল। আইনগত কাঠামো আদেশের ১১ অনুচ্ছেদে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটা নির্দিষ্ট ছিল। স্পীকারের কাছে আবেদন না করে যদি কোন সদস্য পরপর ১৫ দিন পরিষদের অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তাঁর আসন শূন্য বলে বিবেচিত হবে।” এবং “যদি কোন সদস্য তাঁর নির্বাচনের পর পরিষদের প্রথম অধিবেশনের সাত দিনের মধ্যে অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী শপথ গ্রহণে ও তাতে সম্মতিজ্ঞাপনে ব্যার্থ হন তাহলে তাঁর আসন শূন্য বলে বিবেচিত হবে।”

ভূট্টো যখন তাঁর অধিবেশন বর্জনের কথা ঘোষণা করলেন, তখন জনগণ প্রত্যাশা করেছিলেন যে, সাতদিনের শর্তের নির্দিষ্ট সময়ের কারণে হয় তিনি পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবেন, নতুন পরিষদের সদস্য পদে থারিজ হতে বাধ্য হবেন। তাঁৎপর্যপূর্ণভাবে ভূট্টোর এ ব্যাপারে কোন বিবেকের তাড়া ছিল না। তিনি সাংবাদিকদের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরে বলেন, ‘অপেক্ষা করুন এবং দেখুন।’ পেছনের

দিকে দৃষ্টিপাতে প্রমাণ পাওয়া যায়, সদস্য পদের অযোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর ভয়ের কোন কারণই ছিলনা। কারণ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আগেই সে ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন। প্রেসিডেন্টের অনুরোধেই অধিবেশন বর্জনের হ্রাসকি দেয়া হয়েছিল এবং প্রেসিডেন্টও অধিবেশন মূলতবী করে ভূট্টোকে তাঁর প্রতিদান দিয়েছেন। আমি বিশেষ সূত্র থেকে জেনেছি যে প্রকৃতপক্ষে ভূট্টো সাহেব কয়েকজন রাজনীতিবিদদের কাছে পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার কথা ২৪শে ফেব্রুয়ারী '৭১ বলেছিলেন। ভূট্টো প্রেসিডেন্টের অসন্তোষের মুখে তাঁর গৃহীত ব্যবস্থার শিকারে পরিণত হতেন। তিনি জাতীয় পরিষদের তাঁর আসনকে কেনক্রমেই বিপন্ন করে তুলতেন না।

চতুর্থত, অধিবেশন বর্জনের ঘোষণা প্রেসিডেন্টকে মোটেই বিশ্বিত করেনি। ভূট্টোর সঙ্গে স্পষ্ট বন্দোবস্তের কথা ছেড়ে দিলেও একথা জানা গেছে যে, প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগতভাবে করাচী, পেশোয়ার ও লাহোরের কয়েকজন মৌলবাদী সদস্যকে পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে নিষেধ করছিলেন। সে সময় এ সমস্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে এমন একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ব্যক্তিগত শপথ করে আমাকে একথা বলেছেন। ১৭ই এপ্রিল সাংবাদিকদের কাছে প্রদত্ত তাজউদ্দিন আহমদের বিবৃতিতেও এর দৃঢ় সমর্থন রয়েছে। তিনি বলেছেন, ভূট্টোর হাত শক্ত করবার উদ্দেশ্যে জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার চেয়ারম্যান ইয়াহিয়ার একজন ধনিষ্ঠ সহযোগী লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওমর ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিম অঞ্চলের কয়েকজন নেতাকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন।"

অধিবেশন মূলতবীর কারণ হিসাবে ইয়াহিয়া খান যে ভারত কর্তৃক উত্তেজনা সৃষ্টির কথা বলেছেন সে সবের ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। শীনগর ও জমুর মধ্যে চলাচলকারী একটি ভারতীয় ফকার ফ্রেডোশীপ বিমান ছিনতাই এবং এর পরপরই বিমানটি যে লাহোরে ২৯শে জানুয়ারী '৭১ ধ্বংস করে দেয়া থেকেই এসবের সূত্রপাত হয়। যদি বিমানটিকে নিরাপদে ভারতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হত তা হলে কোন বিপদ বা উত্তেজনার সৃষ্টি হতো না এবং পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার জন্য একটি অজুহাত সৃষ্টি হতো না।

এটা গোপন নেই যে, পাকিস্তানের মধ্যে থেকেই ছিনতাই রচনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, একজন বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছে এবং উড়োজাহাজটি লাহোরের মাটি স্পর্শ করার আধিক্যটা আগেই করাচীর সংবাদ মাধ্যমে খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে লোকটি টেলিফোন করেছিল সেখবর দিয়ে দাবি করেছে যে, সে একজন কাশীরের যুক্তিযোগ্য। এই পরিবর্তনকে লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। কাশীর সমস্যার পুনর্জাগরণ ঘটানোর জন্য একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়েছিল যাতে এ সমস্যা আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে প্রথম পাতায় গুরুত্ব পায়। ছিনতাইকারীদের এই উদ্বেগজনক ঘটনা

কেন্দ্রবিন্দুর ঘালরে পরিণত করা হবে : তারা উড়োজাহাজটি উড়িয়ে দেবে কি দেবে না ?

তারপর একটা মীমাংসার প্রস্তাব করা হবে। উড়োজাহাজটি জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেলারেল উথান্টের বা বিশিষ্ট প্রতিনিধির উপযুক্ত নিশ্চয়ভাবে প্রেক্ষিতে হস্তান্তর করা হবে। যা থেকে কাশীরকে নিরাপত্তা পরিষদে নতুনভাবে বির্তকের বিষয় করা হবে। সে পরিকল্পনা ভেঙ্গে যায়—কেননা স্থানীয় পাঞ্জাবীদের মধ্যে মতান্বেক্য দেখা দেয়। একজন মধ্যস্থতাকারী ছিনতাইকারীকে 'বঙ্গ হিসেবে আহবান করে। যিনি উড়োজাহাজের ভিতর থেকে টেনে বের করে আনলে, তিনি একজন অত্যুৎসাহী কনষ্টবল। ভেতরে এই লোকটি জাহাজ উড়িয়ে দেবে বলে আতৎকের সৃষ্টি করেছিল। সেই বিক্ষেপণ পাকিস্তান বিদেশ দফতরের ভিত্তি কাপিয়ে তুলেছিল।

কিন্তু রাজনৈতিকভাবে ঘটনাটির অন্ততঃ একটি উপশমের যুক্তি ছিল। এতে শেখ মুজিবুর রহমান তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করলেন, পরবর্তী কালে এটি একটি অভিযোগ হিসাবে ব্যবহার করে শেখ মুজিবকে এই গর্মে হেয় প্রতিপন্থ করা হল যে তিনি শুধু ভারতের প্রতি 'নরম মনোভাবই পোষণ করেন না' তিনি একজন বিপজ্জনক ব্যক্তিত্ব যা থেকে এ ঘটনার নেতৃত্ব পেতে পারে।

কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রধানকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের অজুহাতের প্রয়োজন ছিলনা। প্রেসিডেন্ট সিন্ধান নিয়েছেন যে পরিষদের অধিবেশন বসবে না যতক্ষণ না আওয়ামী লীগ তার সূত্র মোতাবেক খসড়া সংবিধান আগে পেশ না করবে। তারপর যা কিছু হল তা শুধু প্রতারণা করার জন্য অজুহাত দেখানো, যে কোন অজুহাত সৃষ্টি করে প্রতারণা করা।

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢালু পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার ভয়ংকর প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

## সামরিক বাহিনীর অভিযান

যিনি তার নিজের গোপনীয়তা রক্ষা করেন, তিনি গন্তব্যের শীর্ঘে আরোহণ করেন—আল-কোরআন (কুমিল্লাস্থ পাকিস্তান সেনা বাহিনীর ১৬ ডিভিশনের প্রধান দণ্ডরের ওপি এস কঙ্কের বুলেটিন বোর্ডে উৎকীর্ণ বাণী)।

সময়টা ছিল ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অকান্ত পরিশ্রমী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে বড়াল ইন্দুরের খেলা খেলছিলেন। জুলফিকার আলী ভূট্টো সাহেব সহজ উপায়ে শীর্ঘস্থানীয় পদ অর্জনের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন, কেননা ১৯৭০ সনের ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনের পর থেকে প্রেসিডেন্ট তা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। পেশোয়ারে পিপিপি নেতার পরিষদের অধিবেশন বয়কট করার ঘোষণা ছিল দেশের নতুনভাবে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টির পরিকল্পিত ফাঁদ। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সাংবিধানিক সমস্যা কেন্দ্র করে যে বিশেষ সৃষ্টি হল তা পূর্বে অতটা ছিলনা। এতে গণতান্ত্রিক নেতা হিসেবে ভূট্টো সাহেবের বিশ্বাসযোগ্যতা একবাক্যে বিনষ্ট হল। একদিকে এই তরুণ সিদ্ধি নেতা আকস্মিক ও সম্পূর্ণ মত পরিবর্তন করে অন্য দিকে শেখ মুজিবের সঙ্গে যোগ দিয়েও সামরিকচক্রের দিকে টেবিলের মোড় ঘুরিয়ে দিতে তাঁর কোন বিপদের মুখোমুখি হতে হয়নি।

তিনি যতদূর দেখতে পেরেছিলেন, তা হল, ইয়াহিয়া খান সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং তাঁর পদে তিনি ঠিকমতই অধিষ্ঠিত থাকছেন। তিনি যা ভাবেন, তাই করতে পারছেন। তাঁর ফন্দিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে শেখ মুজিবকে বর্ষ করে দিয়েছেন। কিন্তু অন্য একটি কাজের প্রথম পরিকল্পনার প্রয়োজন।

এখনই সামরিক বাহিনীর অভিযানের সময়। এসবের জন্য সুস্পষ্ট কারণও ছিল এটার জন্য পূর্ব বাংলার পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর শক্তির বিশেষ সংখ্যায় বৃদ্ধি করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় কর্তৃত্ব বাঙালীরা সব সময় প্রতিরোধ করে এসেছে। সেজন্য পরিযদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা দিয়ে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ পরিষদ সদস্যদের মনে ব্যাপক অতিক্রিয়া সৃষ্টিতে উক্তানী দেয়া হয়েছিল।

নাগরিক জীবনে বিশৃঙ্খলা এবং পাক-ভারতের মধ্যে লাহোরে ভারতীয় যাত্রীবাহী

উড়োজাহাজ ছিনতাই উত্তেজনার গভীরতা অবশ্যদ্বাবীকৃতপে বাঢ়িয়ে দিল। সে অনুসারে প্রেসিডেন্ট সিঙ্কান্ত নিলেন যে, পূর্ব বাংলায় পঞ্চম পাকিস্তানের সামরিক শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। যাতে উভয় দিকের সীমান্তের বিপদ সামলে নেয়া যায়।

ইয়াহিয়া খানের সামরিক বিচার বুদ্ধি সঠিক ছিল। তাঁর একটি বিষয়ে ক্রিটিক ছিল, তা হল বাঙালীদের এসবের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ভুল হিসেব অবশ্য, এ ব্যাপারে তাঁর মতে তিনি ঠিকই ছিলেন। ঔপনিবেশিক মানসিকতা সম্পন্ন প্রশাসনের বাঙালীদের প্রতি অঙ্গ আক্রোশ—সব সময়ের স্বাভাবিক ক্রিটিক ছিল।

ইয়াহিয়া খান গণরাজ্যকে অস্থীকৃতি জানাতে সামরিক বাহিনীর সক্রিয় সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেছেন। কেননা, যা কিছু ঘটেছে তা প্রেসিডেন্ট ভবনের অভ্যন্তরীণ চক্রের সাহায্যেই ঘটেছে, সে সব আমি আগেই বলেছি। এই গোপন চক্রে প্রধান সেনাপতি ও চার তারকা পদে পদোন্নীত জেনারেল হামিদ খান; প্রেসিডেন্ট-এর প্রধান স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীরজাদা; কোর কমান্ডার টিক্কা খান জেনারেল স্টাফের প্রধান লেং জেনারেল গুল হাসান; জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল ওমর এবং আজৎসার্ভিস গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালক মেজর জেনারেল আকবর। সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে আরো দু'জন বেসামরিক ভদ্রলোকও ছিলেন, একজন হলেন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ও পাকিস্তানের জাঁদরেল আমলা জনাব এম. এম. আহমদ আর অন্যজন হলেন বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক জনাব রিজভী। এসব ভদ্রলোকেরা স্পষ্টত: ইয়াহিয়া খানের বিশ্বস্ত ও তাঁর অত্যন্ত অনুগত ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা ভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের প্রচেষ্টাকে বানচাল করার ধারণাই সে সময়ে বড় যুক্তি হিসাবে কাজ করেছে। এই ধারণাকেই সামরিক বাহিনীর উচ্চ পদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে চাতুরিপূর্ণ খেলার প্রচেষ্টা চালালেন। এরা হলেন পাঁচ প্রদেশের সামরিক গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকবৃন্দ এবং বিমান ও নৌবাহিনীর সেনাপতিগণ। তাঁরা ছিলেন মোটামুটি সৎ এবং বৃদ্ধিমান। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঞ্চকা বা বেসামরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপে তাঁদের স্বাভাবিক অনীহা ছিল। এরা হলেন লেং জেনারেল আতিকুর রহমান, তিনি অবিভক্ত পঞ্চম পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর এবং বর্তমানে পাঞ্জাবের গভর্নর। আর অন্য জন হলেন লেং জেনারেল রাখমান গুল, সিঙ্কুর বর্তমান গভর্নর। আমি এঁদের খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমি এঁদেরকে বাস্তববাদী ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তি বলে জানি। এঁরা অনেক দুর্গহ কাজ ও প্রসংশনীয়ভাবে সম্পন্ন করে থাকেন।

অন্যেরাও তাঁদের মতই ছিলেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এঁদের বাইরে

যে লোকগুলো ছিলেন তারা হলেন অন্য জগতের লোক। তারা এসব সামরিক গভর্নরের ধাঁচের বাইরে এমন কি রাওয়ালপিণ্ডির মূল সামরিক প্রশাসন কেন্দ্রের লোকদের চেয়েও ভিন্ন থ্রুতির। এইখানে লর্ড এটন-এর অনুশাসনবাক্য এংদের উপর ফিরে এসেছে। অভ্যন্তরীণ চক্রের কয়েকজন অফিসার সম্পর্কে নানা ধরনের কাহিনী শোনা যাচ্ছিল। পাকিস্তানের রাজধানীর কূটনৈতিক মহলের জন্য এরা ছিল একটা জনপ্রিয় বৈঠকখানার খেলার মতো।

সমস্ত সামরিক বাহিনীর উপর প্রেসিডেন্ট এর বিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত ছিল একটি বিচক্ষণতার কাজ। যাহোক এতে যতই শর্করার প্রলেপ দেয়া হোক না কেন, অনিদিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবী রাখার অভিপ্রায়, বেসামরিক সরকার গঠনের আন্দোলনের মতো বিপরীতধর্মী পথে এগিয়ে গেল। এটা সে সময়ের কতিপয় সামরিক গভর্নরের ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার আগ্রহের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর মনোভাবের মৌলিক পরিবর্তন ছিল। তখন ঐ ধরনের অভিযানে সাফল্য অর্জনের জন্য সামরিক প্রশাসনের সহযোগিতার আবহান জানানো হয়েছিল। তা না হলে মতবিরোধ দেখা দিত। এমন কি বিপজ্জনক বিদ্রোহও দেখা দিতো যাতে প্রেসিডেন্টও বিপদমুক্ত থাকতে পারতেন না।

ইয়াহিয়া খান এ কাজ করতে পুরোপুরি সামরিক কায়দায় অন্তর হলেন। প্রথমত, তিনি বেসামরিক মন্ত্রিসভা বাতিল করলেন। এসব মন্ত্রীদের শুধু উপদেষ্টার ভূমিকাই ছিল। মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে তাদের ভূমিকা পালনে কোন অসুবিধা হল না। বিদেশীদের চোখে দোকানের জানালায় সজ্জিত পথের মতো এদের ব্যবহার করা হলো। এরা প্রেসিডেন্ট ভবনের বাইরে বিভাস্তিকর তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করলেন। মন্ত্রিসভা বাতিল কেবল গোপনীয়তাকেই নিশ্চিত করেনি, বরং সংশ্লিষ্ট কায়েমী শ্বার্থবাদী মহলের কাছেও সামরিক বাহিনী যে কর্তব্য পালন করছে সেটাও বুবিয়েছে।

এ কাজটি করার পর ইয়াহিয়া খান বিমান ও নৌ-বাহিনীর প্রধান ও সামরিক গভর্নরবৃন্দ, সামরিক প্রশাসকবৃন্দকে রাওয়ালপিণ্ডিস্থ প্রেসিডেন্ট ভবনের অন্দরমহলে আনুষ্ঠানিক তলব জানালেন। আলোচনার পুরো বর্ণনা এখনও গোপন রয়েছে। তবে লক্ষণে অনুমান করা যায়, পূর্ব বাংলার গভর্নর অ্যাডমিরাল আহসান ও পূর্ব বাংলার প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সাহেবজাদা ইয়াকুব জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার বিরোধিতা করেন এবং এ থেকে ড্যাক্ট পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যার পরিণতি হবে আরো মারাঞ্জাক সে সম্পর্কে সাবধান করে দেন।

এরা দুজনেই অকুশ্লে ছিলেন এবং বাঙালীদের আত্মরিকভাবে জানতেন কিন্তু তাদের কথার গুরুত্ব দেয়া হল না। সে সময় ছড়িয়ে পড়া গুজবের সত্যতা ছিল

এ্যাডমিরাল আহসান পদত্যাগ করেছেন কেননা তিনি এ ধরনের বিশ্বী ঘটনায় জড়িয়ে পড়তে চাননি, কিংবা এ খেলার পরিণতি দেখতে পেরেছিলেন। তিনি ভারাক্রান্ত মনে রাওয়ালপিণ্ডি ত্যাগ করেন। ঢাকাগামী একটি ফ্লাইট ধরার দু'মিনিট আগে তিনি করাচী থেকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ পেলেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, তাঁকে গর্ভর পদে থাকার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছিল। কেননা এতে সামরিক প্রশাসনের ভাঙনের লক্ষণ মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। সরকার সেই পরিস্থিতিকে এড়িয়ে থেকে চেয়েছেন।

পান্ডিত্যসূলভ ব্যক্তিত্ব সাহেবজাদা ইয়াকুব খান যার সঙ্গে শেখ মুজিবের ছিল সৌহার্দ্য। তিনি স্পষ্টভৎ: ঘটনার ভয়াবহ পরিণতি বুবাতে পেরেছিলেন। ২৩ মার্চ, ১৯৭১ অকস্মাত এন্দের দুজনকেই পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহৃত দেয়া হল। ইয়াহিয়া খান এবার তাঁর অভিপ্রেত কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ঢুকান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন।

ঐদিনের প্রেসিডেন্ট ভবনের বৈঠকে যা কিছু হোক না কেন, এটা স্পষ্ট বোবা যায় ইয়াহিয়া খান সামরিক বাহিনীর প্রশাসনের কাছ থেকে যা করতে চেয়েছেন তার সর্বাত্মক সহযোগিতা পাননি।

স্পষ্টভৎ: সামরিক বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মনে এ ধরনের ধারণা বাস্ত করানো হল যে, আওয়ামী নীগের ছয় দফা ভিত্তিক সংবিধান যেটা শেখ মুজিবুর রহমান, চাচ্ছেন, প্রণীত হলে সামরিক বাহিনীকে পঙ্ক করে দেবে এবং দেশকে বিপন্ন করে তুলবে। কৌশলকে যতটা দুর্বোধ্য ভাবা হয়েছিল আসলে ততটা হলো না। সবকিছুই ইয়াহিয়া খানের অনুকূলে যাচ্ছিল। একটা বিষয় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর প্রধান শক্তি হিসাবে বিবেচনা করতে ভারতকে। এ দেশটির বিরুদ্ধে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সেনাবাহিনী নৌ ও বিমান বাহিনী সর্বদা সজাগ ছিল।

উড়োজাহাজ ছিনতাইয়ের ঘটনা থেকে দুই অঞ্চলের প্রতিরক্ষা কঠিনতর হয়ে পড়ে এবং এ বিষয়ে সর্বাধিক প্রস্তুতির প্রয়োজন দেখা দেয়। সে সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের ঘৃণিত শক্তি ভারতের সঙ্গে একটা সমবোতায় পৌছানোর জন্য প্রকাশ্যভাবে আহবান জানান। বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের প্রকাশ সমালোচনা ছাড়িও তিনি একথা জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর বিবেচনায় দেশ বর্তমান সামরিক সংস্থার ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। যদি নির্বাচনী অভিযানকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রূতি অনুযায়ী সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি দেশের পক্ষে সত্ত্ব সত্ত্ব কাম্য হয়। উভয় দিকের বিবেচনায় মুজিবুর রহমান সেনাবাহিনীর ক্ষমতা ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যাপারে মারাত্মক বিগদরূপে দেখা দিলেন। শিথিলভাবে সংযুক্ত প্রদেশগুলির ফেডারেশনের উপর আধিপত্যকরা একটি বিরুদ্ধাচারী সরকার গঠিত হবে, এমন কল্পনাও এই চক্রান্তকারী ব্যক্তিগুলোর নিকট আঞ্চাতী পরিণতি বলে মনে হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে যত সহজে হওয়া উচিত ছিল, ঘটনার উপস্থাপনা অত সহজ হওয়ার পর আগার সন্দেহ নেই যে সৎ ও বিচক্ষণ নয় এমন অফিসারগণ প্রেসিডেন্টের পরিকল্পিত কর্মপদ্ধাকে সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করবে না। তা সত্ত্বেও এই যুক্তি প্রদর্শন করা যেত যে, প্রেসিডেন্ট কেবল একটি শক্তিশালী সামরিক কাঠামো এবং একটি ক্ষমতাশালী কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন।

পাকিস্তানের কোন সৈনিক স্পষ্টকাপে দেশপ্রেমমূলক এ পরিকল্পনার দোষ ধরতে পারেন কি? নিজের ক্ষমতার ভিত্তিকে নিরাপদ করার পর ইয়াহিয়া খান ও তাঁর দল দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতে লাগলেন। বড় ঘটনা ঘটবার আর মাত্র ছয়দিন বার্ষী, কাজেই অপচয় করার গত সময় নেই। জেনারেল হামিদ, ঢিক্কা খান ও উমরকে বিভিন্ন কাজে ঢাকা, নাহোর ও করাচীতে পাঠানো হল। বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপ্রতিদের তাঁদের চাকরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পৃথক পৃথক দায়িত্ব দেয়া হল। করাচীর সংবাদপত্রের সম্পাদকদের কোন বাখ্য ছাড়াই নির্দেশ দেয়া হল যে আন্তঃসার্ভিস জনসংযোগ দফতরের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের গতিবিধির খবর প্রকাশ করা চলবে না। এই আদেশ সম্পর্কে কৌতুহলী দৃষ্টি ছিল, কিন্তু কোন মন্তব্য ছিল না। যদি থাকতো তা'হলে তা'হত ইয়াহিয়ার পক্ষে বিপজ্জনক কিন্তু দেশের জন্য কল্যাণকর।

একই সময়ে দেশের সর্বত্র সেনাবাহিনীকে নতুনভাবে সতর্ক অবস্থায় রাখা হল। এর অভ্যন্তর ছিল ভারতের সঙ্গে উত্তেজনাকর সম্পর্ক। একই কারণে বেলুচী রেজিমেন্টের এক ব্যাটালিয়ন সৈনা ও বিপুল পরিমাণের সমরোপকরণ জাহাজে বোঝাই করে ঢাকাস্থ পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ড হেড কোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার জন্য আদেশ দেয়া হলো। প্রথমে যে জাহাজটি পাওয়া যায়, তা ছিল এম ভি সোয়াত নামে একটি মালবাহী জাহাজ, যা সিংহল হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত দীর্ঘ অব্যবের জন্য প্রস্তুত ছিল, রাতের অক্ষকারে সেনাবাহিনী ও যুদ্ধোপকরণ বোঝাই করার জন্য সেটি বিকুঠিজেশন করা হয়। তরা মার্চ যখন জাহাজটি চট্টগ্রামে দেখা যায়, তখন বাঙালীরা তাদের নির্বাচনের বিজয়ের ফল থেকে তাদের বন্ধিত করার উদ্দেশ্যে বড়ুয়ান্ত্রের ফলশ্রুতি হিসাবে প্রেরিত এই সৈন্যদের উপস্থিতি দেখে বিস্মিত হয়েছিল।

পরবর্তী কয়েকদিন বিমান বাহিনীর সি-১৩০ বিমান অন্যান্য সেনাদল এবং আরো অধিক রণস্থার নিয়ে ঢাকার দিকে একে একে পাড়ি জমাতে থাকে। বিমানগুলো পুরোগাত্রায় পর্যাপ্ত পাকিস্তানী সামরিক ইউনিটসমূহ বহন করে আনে এবং বাঙালী ইউনিটগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা থেকে সরিয়ে ও পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করে সেখানে নবাগতদের বহাল করা হয়।

পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার সঙ্গে বিমান পথে সেনাবাহিনী পাঠাবার

বন্দেবস্তু করা হয়। করাচী বিমান বন্দরে কর্মরত লোকদের কাছ থেকে হজ্জ টার্মিনালে আকস্মিক সামরিক তৎপরতার খবর জানা যায়। টার্মিনালটি সম্ভবত হজ্জের সময়ের বাইরে নির্জন থাকে। সোটি সামরিক বাহিনীর অতিক্রমণ কেন্দ্রে পরিষ্ঠ হয় এবং ২৩ থেকে ২৪শে মার্চের মধ্যে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার বাণিজ্যিক ফ্লাইট সিংহল হয়ে ঢাকা পর্যন্ত ৬০০০ মাইল আকাশ পথ অতিক্রম করে ১২০০০ সেনা বহন করে আনে। সিংহলের কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ করতে পারেননি, কেননা বিমানগুলো কেবল যথার্থক্রমে টিকেট কাটা সামরিক অসামরিক যাত্রী বহনের ভাব করতো এবং স্পষ্টভাবেই এগুলোকে সেভাবেই দেখানো হতো।

করাচীর নৌবাহিনী থেকে বহু বদলীর খবর শোনা গেল। এ সমস্ত জাহাজে শতকরা ৭০ জন বাঙালী নাবিক ছিল। শীঘ্ৰই সে সমস্ত জাহাজে তাদের স্থান অবাঙালীরা দখল করল। এ সমস্ত টর্পেডোবাহী ক্ষুদ্র নৌ-বহুর তাদের কর্তব্য পালনের জন্য পূর্বাঞ্চলের চট্টগ্রাম ও চালনার দিকে ধাওয়া করল। করাচীর জনপ্রিয় সমুদ্রভীরো নিকটস্থ মৌরীপুর বিমান ঘাঁটিতেও বহু তরুণ বাঙালী জঙ্গী বৈমানিক দেখতে পেল যে, তাদের অন্য কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

ঢাকায় পূর্বাঞ্চলীয় ক্যাম্যান হেডকোয়ার্টারে কর্মরত বাঙালীরা ব্যাপকভাবে মানুষ ও মালপত্রের স্থানান্তর লক্ষ্য করে হতভম্ব হয়ে যায়। কিন্তু তাদের মোটামুটি কিছুই জানতে দেয়া হয়নি। সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের তাড়াতাড়ি ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং দূরবর্তী অসামরিক কেন্দ্রগুলোতে সাধারণ কাজে নিয়োজিত করা হয়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ইউনিট ঢাকার পিলখানাস্থ পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের আবাসিক এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য রংপুর ও ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত ট্যাঙ্ক রাখা হয়েছিল, সেগুলো ঢাকায় নিয়ে আসা হল, ঢাকায় আনার এক ঘন্টার মধ্যে সেগুলো বিভিন্ন শহরে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হল।

২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শহরে সামান্য উত্তেজনা দেখা দিল, যখন একজন মালী এ সংবাদ প্রচার করল যে, পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব তার চাকরদেরকে মালপত্র বাধা-ছাদার জন্য আদেশ দিয়েছেন। লেঃ জেনারেল টিক্কা খান সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণের পর তুরা মার্চ এই সেনাধার্ম ঢাকা ত্যাগ করেন। এতে মনে হয় দেশে কি হতে যাচ্ছে তা তিনি জানতেন।

লক্ষ্য করা গেছে যে, পূর্ব বাংলার অন্যান্য কেন্দ্রস্থ পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক অফিসারদের ছেলেমেয়েদের সাময়িকভাবে ক্ষুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। তাদের পরিবারবর্গকে গোপনে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এবং যে বিমানে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনী আনা হতো সেই বিমানে করে তাদের পরে করাচীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এসব ঘটনা থেকে বোকা যায় যে, ফেড্রুয়ারীর ত্তীয় সপ্তাহে রাওয়ালগিডিতে অনুষ্ঠিত সামরিক বৈঠকটিই পরিবর্তনের সূচনা করে। তথাপি এটা অপেক্ষাকৃতভাবে অলঙ্খিত ছিল। একথা স্পষ্ট যে, সামরিক সংস্থা মনোভাব গোপন রেখেছিল। কিন্তু ১ মার্চ তারিখে পরিষদের অধিবেশন মূলতবী ঘোষণা পর্যন্ত জানা যায়নি, কী অন্যায়ভাবেই না সামরিক কর্তৃপক্ষ বাঙালী অনুভূতির প্রচলতা সম্পর্কে অবৌজ্ঞিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল। তখন সমস্ত পরিকল্পনা ভেঙে থান থান হয়ে গেল এবং সময় নেওয়ার জন্য এই ঘটনা হঠকারী সংগ্রামে পরিণত হয়। এই ঘটনায়ও ইয়াহিয়া থান নিজেকে একজন ধূর্ত সেনানায়ক হিসাবে প্রমাণ করলেন। তিনি রাজনীতিবিদদের অবিরাম আলাপ-আলোচনায় আবক্ষ করে তাঁদের সন্দেহ দূর করলেন, ইতাবসরে পূর্ব বাংলায় সামরিক শক্তি দ্বিগুণ করা হল তারপর নিজের পছন্দমত সময়ে ও স্থানে তিনি ঘৰণ আঘাত হানলেন।

কুমিল্লায় মেজর বশির অপারেশনের ক্রোড়পত্র সরবরাহ করেন। তিনি খোলাখুলিভাবে শুন্দা মাঝা বিস্ময়ের সঙ্গে বলেন, আমি কখনও আপনাদের কাছে বলতে পারিনি, কৌভাবে এই মহৎ লোকটি আমাদের রক্ষা করেছেন।

## অবিস্মরণীয় পাঁচিশ দিন

'এমন কি গাজীজী ও বিশ্বিত হতেন?'

-খান ওয়ালী খান।

পূর্ব বাঙ্লার অন্যান্য দিনের মতন ১৯৭১ সনের ১লা মার্চ দিনটিও গতানুগতিকভাবে অতিবাহিত হচ্ছিল। ঢাকার রাস্তা-ঘাটে প্রতিদিনের মত হকার, দোকানদার, ভিক্ষুকের ভিড় ছিল। অপরিহার্য সাইকেল, রিঞ্জা এবং অন্যান্য যানবাহনগুলো নির্বিকার আমেজে চলাচল করছিল। বৃড়িগঙ্গা নদীর তীরে সদরঘাটে দেশী নৌকা এবং লঞ্চগুলো বাস্ত্রযাত্রী পারাপারের হৈ চৈ-এ মন্ত ছিল। ঢাকা ক্লাবের লাউঞ্জগুলোতে বুট সার্ট পরা ব্যবসায়ী আর লিলেনের স্যুট পরা সরকারী কর্মচারী আলুর চাট এবং মাছের সুস্বাদু খাবার হাতে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে গুলজারে মন্ত ছিল। শহরের রাস্তায় যেখানে সেখানে আনানস বিক্রেতা এক আনায় রসাল সুস্বাদু ফলের ফালি বিক্রি করছিল।

তখনই একটা বোমা পড়ল। এটা ছিল বাঙ্লাদেশের কাছে হিন্দুশিমার চেয়েও ভয়ংকর বোমা।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অনিধারিত সময়ে জাতীয় পরিষদ স্থগিত ঘোষণার বিবৃতি প্রচারিত হলো। এই প্রথম বারের মত এই অধিবেশন মাত্র দু'দিন পরে শুরু হতে যাচ্ছিল। বিবৃতিটি ছিল তালগোল পাকানো যুক্তি সর্বৰ, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা আর জাতির জনকের নামে আবেদন। কিন্তু এ ভাষণে পরিষদের অধিবেশনের কোন নতুন তাৰিখের উল্লেখ ছিল না। বিহবল বাঙালীদের কাছে এটা কোন ঘটনাই ছিল না। তারা এটুকু ভাবতে পেরেছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানীরা আরেকবার ওয়াদা ভঙ্গ করলো। এটা চৰম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ এবং এই কাজের পরিণতি হ'ল যুদ্ধ ঘোষণা করা। এটাকে যাই বলা হোক না কেন অনুভূতিতে এটা ছিল এই ধরনের। বাংলাদেশ একটা পৃথক গন্তব্য খুঁজে পেতে চায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানীরাও তাই-ই চাচ্ছেন।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত দোকান-পাট, অফিস-কাচারী, রেস্তোরাঁ, বাজার-ঘাট সব জনশূন্য হয়ে পড়ল। মিটিংয়ের কোন ঘোষণা ছিল না বা তার কোন সময়ও ছিল না। সারিবদ্ধ জনতাকে ঐতিহাসিক পল্টন যান্দানের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল।

জনতার মুখে আক্রোশের ছাপ, হাতে বাঁশের লাঠি, লোহার রড, ইকিষ্টিক, এমন কি নারকেলের পাতা বিহীন ডগা পর্যন্ত।

এই আক্রোশের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ দেখে বিদেশীসহ পঞ্চিম পাকিস্তানীরা বিশ্বিত হয়েছিল। এ আক্রোশের তীব্রতা এমন ছিল যে হাজার অরাজকতা সৃষ্টিকারীরা হাজার হাজার বাক্য বিষ ছড়ালেও অতটা বিশ্ময় প্রকাশ পেত না। ঢাকার এ বিক্ষেভ ও আক্রোশের ঘটনা প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও অনুরণন তুলেছে।

সেন্দিনই বিশুর্দ্ধ বাঙালীর হাদয়ে বাঙালাদেশের জন্য হল।

বিকেল সাড়ে চারটার মধ্যে ময়দানে পঞ্চাশ হাজার জনতা সমবেত হয়েছে। তখনও শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর সহকর্মীগণ হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী বৈঠকে আলোচনা করছিলেন।

ইয়াহিয়া ও ভূট্টোর নামে মুর্দাবাদ মুহর্যুহু শ্লোগানে মুখরিত ছিল। 'জয় বাঙলা' 'স্বাধীনতা না অধীনতা'- 'স্বাধীনতা স্বাধীনতা' শ্লোগানে চারাদিকের আকাশ বাতাস উদ্বেল হয়ে পড়েছিল। জনেক ছাত্র-নেতা মাঝে মাঝে উপরে উঠে স্বাধীনতা এবং 'ইয়াহিয়া ভূট্টোচক্রের বিশ্বাসঘাতকতা' সম্পর্কে জনতার উদ্দেশ্য উচ্চেস্থে জ্বালাময়ী বক্তব্য গ্রাহ ছিলেন।

ইতিমধ্যে পূর্বাণী হোটেলের বাইরের প্রাঙ্গণটি আক্রোশ ফেটে পড়া জনতায় ভরে গেল। তাদের মুখে ছিল বিভিন্ন শ্লোগান ও স্বাধীনতার দাবি। কোন একজন পাকিস্তানী পতাকা যোগাড় করে আনলে, জনতা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই সেটাকে পুড়িয়ে ফেললো। কাছের পিআইএ অফিসের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে ফেললো। কয়েকজন ফচকে ছোকরা হোটেলের প্রবেশ-পথে, পঞ্চিম পাকিস্তানীদের দোকান লুট করতে চেষ্টা করলো।

জনতার আক্রোশ নাগানের বাইরে যেতে চলেছিল। শেখ মজিবুর রহমান ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন। জনতা শান্ত হল। তিনি সংক্ষিপ্ত ও সুস্থত বক্তব্য গ্রাহ করলেন। ২৩ মার্চ ঢাকায় এবং পরদিন সারা প্রদেশে ধর্মঘট পালিত হবে। তিনি জনতাকে একথাও বললেন, ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেবেন এবং স্বাধিকার অর্জনের জন্য কর্মসূচী ঘোষণা করবেন। একথা স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য বারবার আহবান করা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান তা'মেনে নেননি বরং জনতার আহবান তখনও এড়িয়ে গিয়েছেন।

সে রাতে ঢাকা শহরের সর্বত্র উচ্ছ্বেল জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হ'ল। কিছু সংখ্যক অবাঙালী ও তাদের সম্পত্তির উপর আক্রমণের ঘটনাসহ কয়েকটি অগ্নি সংমোগের ঘটনার কথা জানা গেল। আওয়ামী লীগের বেচাসেবকগণের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে গেলে ক্রুদ্ধ জনতার হাতে নাজেহাল হতে হয়। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী শিল্প শহর

নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত এই বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ল। সেখানে সংঘটিত ক'টা দুর্ঘটনার সংবাদ জানা গেল।

এটা হ'ল পঁচিশ দিনব্যাপী গণবিক্ষেপের সূচনা, তার নজির পাকিস্তানে মেলে না। সেনাবাহিনী কখনো এ জাতীয় গণবিক্ষেপের আশা করেনি। শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ধর্মঘট্টের আহবান জানালেন। পরদিন ঢাকা নগরী তাঁর আহবানে সাড়া দিল। জীবন-যাত্রা নিশ্চল হয়ে পড়ল। সমগ্র রাজপথ ধরে শুধু জনবিক্ষেপ ও বিশুরু জনতার সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান সেনানিবাসের কর্মকর্তাৰূপ ঘটনা মূল্যায়ন করে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেননা নিয়মিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এ ধরনের আন্দোলনের মুখোমুখি হওয়ার সামর্থ্য রাখতো না। সে কারণে সন্দেয় সাতটা থেকে বার ঘটনার কার্ফ্যু বা সান্দেয় আইন জারি করা হলো। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সেনাবাহিনী তলব করা হলো।

এ যেন বাঁশের ঝোপি দিয়ে বাড়ের গতি রোধ করা। ঢাকা শহরে সর্বত্রই সান্দেয় আইন লঙ্ঘিত হলো। টহলরত সেনাবাহিনীর সদস্যরা আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুলী চালালো। বেশ ক'জন মারা গেল কিন্তু নিরন্তর জনতা খালি হাতেই সামরিক বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়াল। বাঙালীরা এইবার তাদের সাহস ও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দেখাতে থাকলো।

তুরা মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশব্যাপী সাধারণ হরতাল এবং অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। ইতিমধ্যে প্রদেশের অন্যত্র এই বিক্ষেপের জোয়ার লেগেছে। দু'একটা বিচ্ছিন্ন ইংসাম্বক ঘটনা চলতে থাকলেও দেশের সর্বত্র জনগণ শেখ মুজিবের আহবানে সাড়া দেয়া, আন্দোলন আরো সংহত ও নিয়মতাত্ত্বিক পথে এগিয়ে চলালো। যখন কার্ফ্যু আর কার্যকর করা যাচ্ছে না তখন সেনাবাহিনী ফিরিয়ে নেয়া হলো, ঢাকায় আইন-শৃঙ্খলা ফিরে এলো। আওয়ামী লীগের নির্দেশে খাদ্যদ্রব্যসহ যাবতীয় সামগ্রী সরবরাহ সেনাবাহিনীর জন্য বক করে দিলে, সেনাবাহিনীও ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করতে লাগল।

ঐ রাতে কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রামে আগত এম ভি সোয়াত থেকে সৈন্য এবং গোলা বারুদ নামাতে চেটা করলে মারাত্মক গগগোল দেখা যায়। ডক শ্রমিকরা এই সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে দিল। শীত্রাই হাজার হাজার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও নাবিকদের সঙে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লো। গুরুগোল নতুনরূপ ধারণ করল, যখন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর একটি ইউনিট বাঙালী বিক্ষেপকারীদের উপর গুলী চালাতে অস্বীকার করলো। জানা গেল ৭ জনকে কোর্ট মার্শাল দেয়া হয়েছে এবং পরবর্তীকালে গুলী করে মারা হয়েছে। এই ঘটনা বাঙালীদের বিক্ষেপের তীব্রতা আরো বাড়িয়ে দিল।

অসহযোগ আন্দোলন বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির উপর আওয়ামী লীগের মনোভাব কঠোর হতে আরম্ভ করলো এবং উপর্যুপরি হরতালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেশের সকল কর্মসূচিতার পঙ্ক হয়ে গেল। ও মার্চ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে অপরাহ্ন ২টা পর্যন্ত অবিরাম হরতাল পালনের নির্দেশ দিলেন। সেই নির্দেশানুসারে প্রতিদিন এই প্রদেশের ঐ সময়ের জন্য সব কিছু বন্ধ হয়ে গেল। সরকারী অফিস, আদালত, ব্যাংকের দরজা হলো বন্ধ। এমন কি ডাক ও তার, বিমান, ট্রেন পর্যন্ত অচল হয়ে পড়ল। ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর ও অন্যান্য সেনানিবাসে রেশনের স্থলতার জন্য সৈন্যদের সরিয়ে নেয়া হলো। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বাঙালীরা কোন ক্রমেই সেনানিবাসের কাজে সহায়তা করতে রাজী নয়।

এমন পরিস্থিতিতে আকস্মিকভাবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অপসারিত গভর্নর আহসানের স্থলাভিয়ক্ত হতে লেঃ জেনারেল টিক্কা খান ঢাকায় এসে পৌছলেন। বিদ্রোহ দমনের বাপারে টিক্কা খানের পুরনো অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ইতিমধ্যে বেলুচিস্তানের কসাই নামে সুনাম অর্জন করেছেন। কয়েক বছর আগে তিনি কঠোর হাতে বেলুচিস্তানের বিদ্রোহ দমন করেছেন। এবার তিনি পূর্ব বাংলায় একই ধরনের কাজ করার জন্য দায়িত্বে এসেছেন। তিনি যা মুশী তাই করতে পারেন। সেজন্য গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক এই দৈত্য ভূমিকা তাকে দেয়া হয়েছে।

টিক্কা খানের উপস্থিতি যা হোক, সরকারের পক্ষে কোন উন্নতিই হলো না বরং এতে অবনতি ত্বরান্বিত হলো। বাঙালীর বিক্ষেপ ও অসহযোগ আন্দোলন তীব্রভাবে হলো।

সরকারী কাজকর্ম প্রদেশের সব স্থানেই বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষতঃ যে ঢাকা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু সেখানে সরকারের নিয়ন্ত্রণে কিছুই নেই। সরকারী দফতর এবং অন্যান্য বেসরকারী ভবনে পাকিস্তানী পতাকার স্থলে কালো পাতাক উড়জীন হলো। শেখ মুজিবের নির্দেশে ঢাকা রেডিও ও টেলিভিশন কেন্দ্রগুলোতে আদেশ অমান্য করে পাকিস্তানী জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তে বাংলা দেশাঘাবোধক গান প্রচারিত হতে লাগল। এই সকল দফতরের কর্মচারীগণ সরকারী চাকুরি বিধি লংঘন করে পর্যিম পাকিস্তানের উর্ধ্বাত্মন কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগ নেতার নির্দেশ মেনে চলতে লাগল।

প্রতিদিন বিকেল ২টা পর্যন্ত ধর্মঘট অতিবাহিত হওয়ার পর স্টেডিয়াম ও অন্যান্য জায়গায় জনসভা অনুষ্ঠিত হতে লাগল। এইসব সভায় ছাত্রনেতৃবৃন্দ ও আওয়ামী লীগের কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখতেন। এই বক্তৃতামূল্য থেকে শেখ মুজিবের আন্দোলনী তাদের মাধ্যমে ঘোষিত হতো। এক সুযোগে ৩৪১ জন কয়েদী ঢাকা জেল ভেঙ্গে

স্টেডিয়ামের জনসভায় এসে উপস্থিত হলো এবং কয়েদীদের উর্দি পরা অবস্থাতেই তারা রাস্তায় শোভাযাত্রা সামিল হলো। কর্তৃপক্ষ এ দৃশ্য অসহায় দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। আস্দোলনের গতি তীব্রতর হতে থাকলো, স্বাধীনতার দাবির ব্যাপকতা বেড়ে চললো। সে কারণে সকলের দৃষ্টি ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে নিবন্ধ থাকলো, যেখানে শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন বলে সকলেই আশা করছেন।

এসব ঘটনা রাওয়ালপিণ্ডির সামরিকচক্রকে অসহিষ্য করে তুললো। তারা স্পষ্টতঃ বাঙালীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে দৃঢ়ব্যবস্থার ভুল হিসেব করল। অতিরিক্ত সৈন্য পাঠানো সম্মেবে পূর্বাঞ্চলে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শক্তি প্রচল গণবিদ্রোহ দমনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তা'ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষের অভিত লক্ষণ দেখা দিয়েছিলো। এরাই পূর্ব বাংলায় সামরিক শক্তির চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে আসছে। সরকিছুর উদ্বের দেখা দিল স্বাধীনতার জন্য আসন্ন ঘোষণার হ্যাকি।

নিঃসন্দেহে এই সমস্যা সকল আশার মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। প্রেসিডেন্ট সত্ত্বর সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক বিশ্ফোরণ দমনের যে পরিকল্পনা ছিল যাতে রাজনৈতিক নেতৃবৃক্ষকে শক্তি প্রয়োগে বশীভৃত করবে, এখনকার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো নির্মমভাবে গণবিদ্রোহের মূলোৎপাটন করা। রাজনৈতিক বিকল্পগুলো প্রেসিডেন্টের মনকে এতকুকু ভারান্ত করেনি। কারণ সে সবের মধ্যে ছিল পরাজয়কে মেনে নেয়া। সেজন্য ইয়াহিয়া খানের পক্ষে আর পিছনে ফেরার উপায় থাকলো না। তিনি বৃহত্তর শক্তি প্রয়োগের তথা সামরিক সম্বাদনের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যার সুরাহার পথ দেখলেন।

গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানেরাও প্রেসিডেন্টের এই মনোভাবকে সমর্থন করলেন। অকৃত্ত্ব ঢাকায় যে বাস্তিটি ছিলেন সেই টিক্কা খান আরো উৎসাহী ও আগ্রহ দেখালেন। টিক্কা খান প্রেসিডেন্টকে জানালেন, “আমাকে আরো ক্ষমতা দিন, আমি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ওদেরকে ঠাড়া করে দেব।” প্রেসিডেন্ট এ যুক্তির কোন ক্রটি দেখতে পেলেন না। প্রেসিডেন্টের এটা ধারণার অভীত ছিল যে, বাঙালীরা দুর্ধর্ষ পাকিস্তানী সেনার বিরুদ্ধে রক্ষে দাঁড়ানোর শক্তি রাখে। অতএব দাবার চাল ছুড়ে দেয়া হলো। সামরিক বাহিনীকে যে কোন মূল্যে তার অবস্থান বজায় রাখতেই হবে। বাঙালীদের একটা উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হবে।

৫ই মার্চের বিকেলে ইয়াহিয়া খানের মনে ভবিষ্যৎ কর্মপত্রা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কর্মপত্রার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কৌশল হবে প্রয়োজনীয় সামরিক শক্তি ঘোগানো,

প্রস্তুতির জন্য সময় নেয়া এবং উপযুক্ত মরণ ছোবল দেয়া। সে অনুযায়ী তিনি আকাশ পথে রণসভার পাঠানোর নির্দেশ দিলেন। আনুষঙ্গিক যুদ্ধ আইন আদেশ জারি করা হলো। পরদিন তিনি বেতারে ঘোষণা করলেন যে যেহেতু পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার কারণে ভুল বুবাবুনি ও হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের চিকারে পরিণত হয়েছে, সেহেতু তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে এই দুর্ভাগ্যজনক অচলাবস্থার মীমাংসাকল্পে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন যে, ২৫ শে মার্চ পরিষদের অধিবেশনের নতুন তারিখ নির্ধারিত করা হ'ল।

আমার মনে হয় না যে, তিনি বা চার কোটি পাকিস্তানী শারা সেদিন প্রেসিডেন্টের ভাষণ শুনেছেন তাঁরা সেদিনকার সেই অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাবেন। বাস্তবক্ষেত্রে ইয়াহিয়া খান জনদাবির প্রত্যুষের এটা জানাতে পারতেন, কিন্তু বজ্রব্যে তিনি যে ধাঁচের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যে সুরে বলেছেন, তাতে তাঁর মনোভাবে দুরভিসংক্ষি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে একজন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধানের এ ধরনের রাজনীতিবিদের সৃষ্ট জটিলতা থেকে মুক্ত করার কথা হয়তো ভাবা যেত, কিন্তু প্রেসিডেন্টের মন্তব্যে আসল চাপটা সেদিকে ছিল না। তিনি বিস্কুট বাঙ্গালীদের অনুভূতির জন্য একটি কথাও বলেননি বা সামান্যতম সাত্ত্বনা বা লাঘবের উদ্যোগও নেননি। তাঁর পরিবর্তে তিনি শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তৈরি নিন্দাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি একহাতে যা 'দিতে চেয়েছেন অন্য হাতে তা'কেড়ে নিয়েছেন। আমার এক শুন্দাস্পদ সহকর্মীর উক্তি 'তিনি (ইয়াহিয়া) মোটেও আন্তরিক নন এবং তিনি পাকিস্তানকে জাহান্মামে পাঠাচ্ছেন'-এটা করাটাতে আমার সহকর্মী ও আমার অনুভূতিরই প্রতিক্রিয়া।

এ থেকে স্পষ্টতঃ বুবা গিয়েছিল যে রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের অস্ত্রকে ভোতা করে দেবার একটা প্রচেষ্টা। কেননা তিনি ভেবেছিলেন এই দিন শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন। এটা ছিল তাঁর একটা উদ্দেশ্যমূলক জুয়াখেলা। অন্ততঃ এবারে ইয়াহিয়া খান ভুল হিসাব করেননি।

শেখ মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং তাঁর দলের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ এই ফাঁদে আটকা পড়লেন। রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিব স্বাধিকার অর্জনের জন্য আইন ঢমান্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে বলেন এবং এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" বলে ঘোষণা দিলেন। জনগণের প্রত্যাশিত ঘোষণা সরাসরি পেল না সেজন্য অনেকে হতাশ হল। এই আন্দোলন ইয়াহিয়া খানের চক্রের কাছে যতই ধৰ্মসংগ্রাম ও অধিয় হোক না কেন, এটা সামরিক প্রস্তুতির জন্য তখনো আকারিক্ত সময় দিয়েছিল।

বিপুলী নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব যে সুনাম অর্জন করেছিলেন, তা দিয়ে তিনি চার মাইল দূরে পূর্বাঞ্চল সেনানিবাসের প্রধান দণ্ডের লক্ষ লক্ষ দৃঢ়চেতা বঙ্গলীদের নেতৃত্ব দিয়ে টিক্কা খানকে আঞ্চসমর্পণ করাতে পারতেন। বাঙ্গলীরা তা করতে প্রস্তুত ছিল, সামরিক বাহিনীকে উৎখাত করার জন্য কয়েক শত আঞ্চাছিতি ও দিতে প্রস্তুত ছিল। তা'হলে বাংলাদেশ সামান্য ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হতে পারতো। পরবর্তীকালে লক্ষ লক্ষ প্রাণের মৃত্যু, অজস্র লোকের বাঞ্ছহারা ও সামরিক নৃশংসতার শিকার হয়ে দেশত্যাগ করতে হতো না।

শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের অভ্যন্তরে পরিচয় এইবারাই শুধু একবার দেয়নি। তাদের চোখ ও কানের সম্মুখে অসংখ্য বেদনাদায়ক সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ইয়াহিয়া খানের চালে বোকা বনে 'ম্যাড হট্রো'র' নাচের 'সাংবিধানিক সূত্রের আলোচনায়' অংশ নিলেন এবং পরিণতিতে জনগণকে মেঘের মত কসাই পাকসেনার হাতে জবাই হতে হ'ল।

২৫ শে মার্চে চৰম আদেশ প্রদানের পর ইয়াহিয়া খান যখন করাচীতে ফিরে যাচ্ছিলেন এবং পঞ্চম পাকিস্তানে সেনাদল ঢাকা ও চট্টগ্রামে গণহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন একজন আওয়ামী লীগের পত্রবাহক শেখ মুজিবের স্বাক্ষরিত প্রেস রিলিজ দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের মধ্যে বিলি করছিলেন। এই প্রেস রিলিজের বক্তব্য ছিল যে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। ক্ষমতা, হস্তান্তর সম্পর্কে আমরা মতেক্ষে পৌছেছি এবং আশা করি প্রেসিডেন্ট তাঁর ঘোষণা দেবেন। (এখানে আচর্যবোধক চিহ্ন আমি ব্যবহার করেছি—কেননা এ ধরনের নির্বাক্তিতা সম্বন্ধে আমার কোন মন্তব্য নেই)।

তা থেকে ২৫ মার্চের বাঙ্গলী সেনারা তিনবার পৃথকভাবে শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে নির্দেশ চেয়েছেন, কেননা যা ঘটবে সে সম্বন্ধে তাদের কোন সংশয় ছিল না। প্রতিবারাই শেখ মুজিব বাঙ্গলী সেনাদের সঙ্গে সময়োপযোগী ব্যবহার করেছেন বা মামুলি ধরনের কথাবার্তা বলেছেন। আমার মনে হয় না ঐ সব সাহসী আজ্ঞায়গী ব্যক্তিগণ যাঁরা এখন স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা ঐ অভিজ্ঞতার কথা ভুলে যাবেন। যা হোক রাজনীতিবিদরা যতই তাদের পেছনে চাপার চেষ্টা করুন না কেন এই লোকগুলো এবং তাদের মত সাহসী ছাত্রবৃন্দ যাঁরা এখন তাদের সঙ্গে থেকে নড়ছেন তাঁরাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত বীরযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত থাকবেন এবং ঘটনাক্রমে এঁরাই নতুন প্রজাতন্ত্রের রক্ষক হবেন। ৭ মার্চের ক্ষমতা দখলের সুযোগের ব্যর্থতা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীতধর্মী কাজ। আমি তাঁকে বহু বছর ধরে কাছে থেকে জানি। ১৯৫৮ সালের গ্রীষ্মের দিনে ফ্লাগস্টাফ আরিজোনা, লস এঞ্জেলস এবং সান ফ্রান্সিসকো হোটেলের

কামরাগুলোতে একসঙ্গে থেকেছি। আমি তাকে হৃষি স্মরণ করতে পারছি, তিনি ১৯৫০ সালে একজন সাহসী ছাত্রেন্তো এবং ১৯৫৮ সালে ৭ই অক্টোবর বালুচ রেজিমেন্ট মেসে যেদিন আইয়ুব খান সামরিক বাহিনী নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্কিংনের শাসনভাব দখল করলেন ঐদিনে তার সঙ্গে আলোচনার কথা আমার বেশ মনে আছে।

পাঞ্জাবী রাজনীতিবিদদের শ্রেষ্ঠতায় অতিষ্ঠ হয়ে আওয়ামী লীগ ফিরোজ খান নুনের পক্ষ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে ভিন্ন পথে চলার সিদ্ধান্ত নেয়। শেখ মুজিব সেদিন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলেন, “আমাদের স্বাধীনতা পেতে হবে।” তিনি আরও বলেন, “আমাদের নিজেদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী থাকতে হবে। আমি অবশ্যই এসব দেখব।” ক'ঘন্টা পর যখন তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে আকাশপথে যাচ্ছিলেন আইয়ুব তখন দেশের ক্ষমতা দখল করেছেন এবং শেখ মুজিব শীগগিরই আবার কারাগারের প্রকোষ্ঠে নিজেকে দেখতে পেলেন।

১৯৭১ সালের মধ্যে এই তীক্ষ্ণধী বাঙালী নেতা, অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন, কিন্তু তিনি রাজনীতির চালে যে শক্তির বিরুদ্ধে লড়ছিলেন সেই পাক সামরিকচক্রের ভূমিকা সংঘত করার পরিবর্তে আলগা করে ছিলেন। আমি গোহাম্বদ আইয়ুবের মন্তব্য উল্লেখ করছি :

“মুজিবের ব্যর্থতার কারণ তিনি যে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তার মধ্যে নিহিত নয়, তা নিহিত রায়েছে বাস্তব পরিস্থিতির সম্পর্কে তার জ্ঞানের মধ্যে, যার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন—। এটা ছিল রাজনীতির সঙ্গে তার নিবিষ্ট-চিত্ততা, যা তাকে তৎপ্রবর্তিত আন্দোলনের ব্যাপকতর সামাজিক সংশ্লেষের বিচার থেকে তাকে নিবৃত্ত করেছিলো।” (বাংলাদেশঃ এ স্ট্রাগল ফর নেশনহড়; পৃষ্ঠা ৬২)।

এবার ৭ মার্চের কথায় ফিরে আসছি। সেদিনকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভা—বাঙালীদের সংগ্রামের একটি নাটকীয় মোড় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিন্তু জনগণ যা আশা করেছিল তা হয়নি। শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্ত্বাসন অর্জনের জন্য একটি কর্মসূচী দেয়ার প্রতিশ্রূতি দেন। কিন্তু সভায় উপস্থিত দশ লক্ষাধিক লোক জানতে এসেছিলেন অন্য কিছু : স্বাধীনতার ঘোষণা। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে সময় পূর্ব বাংলা আক্রমণে ফেটে পড়েছিল। ঢাকায় এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানের সভাগুলোতে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, বাঙালীরা পরিস্থিতির এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে, যেখান থেকে আয় ফিরে আসার পথ নেই। ছাত্রেন্তোগণ, বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি ছিলেন স্পন্দনশীল, তারা প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচারের কাজে বেরিয়ে পড়লেন। তারা প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত এবং অবশিষ্ট সকলের সঙ্গে সামিল হওয়ার জন্য চরমপত্র দিলেন এমন

পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবের বক্তৃতা শোনার জন্য জনসাধারণ রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হয়। এবং তাদের দৃঢ় সংকলনের কথা জানাতে তারা সঙ্গে শর্টগান, তরবারি, ঘরের তৈরী বল্লম, বাঁশের লাঠি প্রভৃতি বিভিন্ন অন্তর্শস্ত্র নিয়ে আসে। সেদিন একটি পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর কোন লোকও দেখা যায়নি।

সেনাদলের উপস্থিতির নির্দশন একটি মাত্র সবুজ পিঙ্গল বর্ণের হেলিকপ্টার, যা গাছের উপর দিয়ে অবিবাধিতভাবে উড়ছিল। সেনাবাহিনীর ঐরূপ উপস্থিতিতে কিছু লোককে বিচলিত করতে পারে এই আশায় হেলিকপ্টারটি উড়লেও জনগণকে মোটেই বিচলিত হতে দেখা যায়নি। সম্ভবতঃ সেদিনের জন্য হেলিকপ্টারের আরোহীরা আরো ভীত হয়ে পড়েছিল। নিরাপদ দূর থেকে সেদিন জনসমূহে যে দৃঢ় প্রতিবাদ তারা স্বচক্ষে দেখেছিল, তা তাদের মারাঞ্চক দৃশ্টিতার কারণ হয়েছিল। যদি এই জনসমূহ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান করত, তা'হলে ট্যাঙ্ক কিংবা কামান-বন্দুক নিয়ে তাদের নিষ্ঠন্ত করা সম্ভব হতো না। এই বিপদের কথা টিক্কা খান ভালভাবেই অবগত ছিলেন। হেলিকপ্টারটির চৰকৰ মারার কারণও ছিল তাই।

ময়দানে সমবেত জনসমূহের দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল সভামন্তের উপর, যেখানে যে কোন মূহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উপস্থিতি আশা করা হচ্ছিল। ('বঙ্গবন্ধু' বাঙালীরা সবাই শুন্দি ও আদরের সঙ্গে এ নামে শেখ মুজিবকে ডেকে থাকে), সভায় উপস্থিত হতে বঙ্গবন্ধু বিলম্ব করছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান তখন দলের ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভায় রত ছিলেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের জন্য প্রেসিডেন্ট যে নতুন তারিখ ঘোষণা করেছেন, তা বিবেচনার জন্য তাঁর বাসভবনে আগের দিন সন্ধ্যায় এই সভা আহ্বান করা হয়েছিল। জনগণ উচ্চেস্ত্রে দাবি করে আসছে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য সে বিষয়েও আওয়ামী লীগের সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও কথা ছিল। এর জন্য প্রবল চাপ দেওয়া হয়েছিল। একদিকে ছিল শক্তিশালী ছাত্র সংগঠনের হৃষকি আর চাপ দেয়া হচ্ছিল যে আওয়ামী লীগের উচিত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা। এদের সঙ্গে ছিল রাজপথে জনগণের দাবির চাপ-এ দাবির বিরুদ্ধে যুক্তি ছিল, স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কসাই টিক্কা খান পরিচালিত পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্ব বাঙালীয় বর্বরোচিত প্রতিশোধ গ্রহণের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে নিরীহ লোকদের জীবনহানি ঘটবে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা বিধ্বন্ত হয়ে যাবে। শেখ মুজিব রক্ষণাত্মক বিরোধী ছিলেন। তারপর তাদেরকে বিপদের ঝুঁকি না নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা কেননা জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পরিযাদের অধিবেশনের জন্য তারিখ নির্ধারণ স্পষ্ট আঘাসমর্পণ। এটা তাদের কাছে মনে হয়েছিল যে, দু'বছর আগে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের যে পরিণতি ঘটেছিল ইয়াহিয়া খানও

অনুরূপ পরিষ্কার শিকার হবেন প্রেসিডেন্ট সঠিকভাবে আগেই অনুমতি করতে পারছিলেন যে, যুক্ত মাত্রাই অন্যায় মনোভাবের লোকদের কাছে প্রবল আবেদন জাগাবে। কেননা তারা ব্যালট বাস্ত্রের মাধ্যমে বিজয়ের রসাখাদনের আশা করছেন।

সারা বাত এবং দিনের একটি বিরাট অংশ ধরে আলাপ-আলোচনা চলল। তথাপি আওয়ামী লীগ কেন সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারল না। স্পষ্টতঃ তারা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের বিরুদ্ধে কেননা তা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে। অবশ্যে মুজিব প্রকাশ্যভাবে বলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বললেন যে, তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে চার দফা দাবি পেশ করবেন এবং প্রদেশব্যাপী অহিংস আন্দোলনের দেত্তু দান করবেন, যা নিশ্চিতভাবে বাঙালীদের দৃঢ় সংকল্পের কথা প্রকাশ করবে।

এই চার দফা হলো :

- (১) অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে;
- (২) সামরিক বাহিনীর লোকদের অবিলম্বে ছাউনিতে ফিরে যেতে হবে;
- (৩) নিহতদের জন্য তদন্ত করতে হবে; এবং
- (৪) অবিলম্বে আর্থাৎ ২৫শে মার্চ পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

দাবিগুলো ছিল সম্মোতা জাতীয়। এগুলোর লক্ষ্য অপরিবর্তনীয় থাকবে— যেমন, জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার কিন্তু এর পদ্ধতি হবে অহিংস।

অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বাসের কারণ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, তার হাতে জনগণের ক্ষমতাকে প্রক্ষিপ্তালী অন্ত রয়েছে। প্রেসিডেন্টের অভিপ্রায়কে সঠিকভাবে বুবাতে তিনি হিসেবে ভুল করেছেন এবং সেজন্যাই তিনি তাঁর চরম অন্ত্রের ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলেন।

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি শেখ মুজিবের পরিকল্পনাকে অনুমোদন করতে দ্বিধা করেনি। স্পষ্টতঃ এই ব্যবস্থা আরেকটি মধ্যপথ খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিলো। কিন্তু বাইরে অপেক্ষমান ছাত্রনেতৃত্ব মে সিদ্ধান্তের কথা শুনে স্পষ্টত নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। রেসকোর্স ময়দানে যাওয়ার আগে শেখ মুজিব তাদের শান্ত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দৃশ্যতঃ তেমন ফল হয়নি।

শেখ মুজিব একজন বজ্রকণ্ঠী বক্তা। সেদিন রেসকোর্স ময়দানের বক্তৃতায় তিনি সবকিছুই ব্যবহার করেছেন—যথার্থ শব্দের মুর্চ্ছনা, তীব্র শ্রেষ্ঠ বজ্রকণ্ঠের মন্ত্রপূর্ণ আবহান কিন্তু তিনি যা বলেছেন, তার সঙ্গে সে সময়ের জনগণের প্রত্যাশার মিল ছিল না। বক্তৃতার সময় জনতা উত্তেজনায় মাঝে মাঝে করতালি দিচ্ছিল এবং যথার্থ স্থানে প্রশংসাধনি উচ্চারণ করছিল, তথাপি জনগণের যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল তা নিচয়ই

ঘটনার উপযোগী হয়নি। বজ্রতা শেষ করার পর তিনি কিছুক্ষণের জন্য নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বিগাট জনসমূহের দিকে তাকিয়ে জনতার নৈরাশ্যভাব উপলক্ষ করলেন। এবার তিনি আবার বঙ্গবন্ধু হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর দৃষ্টি উত্তোলন করে বজ্রকষ্ট উদাত্ত আহবান জানালেন : ‘আমাদের এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম শ্বাসীনতার সংগ্রাম।’ “জয় বাংলা।”

জনতা উত্তেজিত হয়ে পড়লো। তারা যে জন্য এসেছিল, ঠিক তা তারা পায়নি। কিন্তু শেখ মুজিব তো মুক্তি এবং শ্বাসীনতার কথা বলেছেন। এই মনোভাব নিয়েই তারা ময়দান থেকে চলে গেল এবং আওয়াজী লীগের আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচীতে পূর্ণ সমর্থন দেওয়ার সংকল্প গ্রহণ করলো।

পরদিন সেনাবাহিনীর ছাউনিগুলো ছাড়া পূর্ব বাংলার সর্বত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত শেষ হয়ে গেল। জনগণের শাসন প্রবর্তিত হল। জনগণ ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগে কর পরিশোধ করা বন্ধ করে দিল। তরা মার্চে প্রদত্ত শেখ মুজিবের নির্দেশে বাঙালী মালিকানাধীন দুটি ব্যাংকে যাবতীয় অর্থ জমা হতে লাগল। এখন সরকারী কাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রতি অবাধাতা লক্ষণীয়ভাবে বিস্তার লাভ করল। এই ব্যাপারে বাঙালীরা ছিল চরম মাত্রয় শৃঙ্খলাবন্ধ ও উৎসর্গীকৃত। প্রতিটি পুরুষ, নারী ও শিশু কেন্দ্রীয় সরকারকে অগ্রহ্য করাকে ব্যক্তিগত সম্মানের প্রশংসন হিসাবে ধরে নিয়েছিল এবং অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশাবলী পালন করছিল। এ জাতীয় শাস্তিপূর্ণ আইন অমান্যের দৃশ্য আর কখনও দেখা দেয়নি। একারণেই অঙ্গস আন্দোলনের আজীবন ভক্ত খান ওয়ালী খান বলেছেন “এমন কি গান্ধীজীও বিস্মিত হতেন।”

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের যে দশটি নির্দেশনামা জারী করা হয় সেগুলো নীচে দেওয়া হলো। কারণ এসব নির্দেশনামা থেকে আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপকতার একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠবে।

শেখ মুজিব বলেছেন :

- (১) সকল প্রকারের কর প্রদান বন্ধ থাকবে।
- (২) বাংলাদেশ সচিবালয়, সরকারী ও আধাসরকারী দফতরসমূহ, হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতসমূহসহ বাংলাদেশে হরতাল পালিত হবে। হরতালের আওতা থেকে যে সব বিষয় অব্যাহিত দেয়া হবে তা সময় সময় ঘোষণা দেয়া হবে।

- (৩) রেলওয়ে এবং পোর্টে কাজকর্ম চলবে, কিন্তু রেলওয়ে এবং পোর্টে সামরিক বাহিনীর চলাচলের মাধ্যমে যদি জনগণের উপর নির্বর্তনমূলক কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে কোন কর্মচারী সহযোগিতা করবে না।

- (৪) রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রে আমাদের বজ্রবেয়ের পূর্ণ বিবরণ প্রচার

করতে হবে। এবং কোনক্রমেই জনগণের আন্দোলনের সংবাদ চাপা দেয়া যাবে না। যদি তা করা হয় তাহলে বাঙালী কর্মচারীরা ঐসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না।

(৫) শুধুমাত্র স্থানীয় ও আন্তর্জেলা টেলিফোন ও ট্রাংকল যোগাযোগ ব্যবস্থা চাল থাকবে।

(৬) সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বক্ষ থাকবে।

(৭) স্টেট ব্যাংকের মাধ্যমে কোন ব্যাংক পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাচার করতে পারবে না।

(৮) সকল প্রতিষ্ঠানে বা ভবনে প্রতিদিন কালো পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

(৯) অন্যান্য ক্ষেত্রে হরতাল তুলে নেয়া হলো। তবে প্রয়োজনে পরিস্থিতি বিবেচনা করে আবার হরতাল ডাকা হবে।

(১০) প্রতোক ঘরে ঘরে, ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা, জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ (বিপ্লবী কাউন্সিল) গড়ে তুলতে হবে। (এটা সমগ্র প্রশাসনিক কাঠামো এমনকি নিম্নস্থানীয় এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল)।

৮ই মার্চ যখন এ নমস্ত নির্দেশ পালিত হলো, তখন পশ্চিম পাকিস্তানে দারুণ ভীতির সংগ্রাম হলো। করাচীর টক একচেঙ্গ বিশেষ করে যে সমস্ত কোম্পানীর মূল কেন্দ্র পূর্ববাংলায় সেগুলোর শেয়ার মূল্য দ্রুত গতিতে নেমে গেল। বড় বড় শেষ্ঠৱার অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা দিশেহারা হয়ে পড়ল। তারা এখন কি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা তাদের মিলনগুলো দেখা শুনার জন্য লোক পাঠিয়ে বিপদে পড়বে? নাকি পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার জন্য করাচীতে থাকবে। এদের দুই একজন পূর্ব বাংলায় সাময়িকভাবে চলে এলো। অন্যরা করাচীতে থেকে রাওয়ালপিণ্ডির সরকারের কাছে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আবেদন জানাতে লাগলো। একজন শেষ একজন বাঙালী কর্মচারীকে চারণ্ডি বেতন দিতে চেয়ে বললো পূর্ব বাংলায় গিয়ে আমার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্বস্তার সঙ্গে দেখাশুনা করো। এ ধরনের প্রস্তাব বিলয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে বলে আমি জেনেছি। আমার একজন বিশিষ্ট বাঙালী বন্ধু তার দুই ছেলে ঢাকায় নিয়ে যান যাতে তারা স্বচক্ষে ‘আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়, প্রত্যক্ষ করতে পারে’। ৮ই মার্চে পাকিস্তানের দৃশ্য ছিল এইরূপ।”

সরকারী অফিস ও ব্যাংকের প্রতি নির্দেশাবলী বোধগম্য কারণেই জনসাধারণের কাছে বেশ কঠোর কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং খাদ্যশস্য এবং অতি প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের চলাচলও মারাঘাকভাবে ব্যাহত হলো। রঞ্জনী, যা ছিল দেশের আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় তা বক্ষ হয়ে গেল। তাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠতম উপদেষ্টা (বিপ্লবী বাংলাদেশ

সরকারের প্রধানমন্ত্রী) ৮ই মার্চ জনসাধারণের অসুবিধা দ্বাৰা কৰার জন্য এবং পূর্ব বাঞ্ছলার অৰ্থনৈতিক ক্ষতি রোধ কৰার জন্য কতিপয় ব্যাখ্যা ও ছাড় দিয়ে জনগণের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা কৰেন।” এসৰ নির্দেশের মধ্যে ছিল ব্যাংকেৰ কাৰ্য্যকল মেয়াদ, সড়ক ও নৌ-পৱিবহন, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, সৱবৱাহ, খাদ্যদ্রব্য, ধান ও পাটেৰ বীজ, বিতৰণ, জনস্বাস্থ্যমূলক এবং বাঙালীদেৱ জন্য ট্ৰেজাৰী অফিসে কাজকৰ্ম চালু রাখাৰ কথা। ভাক ও তাৰ বিভাগকে কেবল পূৰ্ব বাঞ্ছলাৰ মধ্যে চিঠিপত্ৰ ও টেলিগ্ৰাম আদান প্ৰদানেৰ কাজ চালু রাখাৰ জন্য আদেশ দেয়া হয়। শুধু বৈদেশিক তাৱণ্যার্থৰ সংবাদ প্ৰেৰণেৰ জন্য ব্যতিক্ৰম রাখা হয়। এক্ষেত্ৰে তাৰ বিভাগেৰ একজন সাধাৱণ কৰ্মচাৰী শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগেৰ আইন অমান্য আন্দোলনেৰ সামান্যতম সমালোচনাৰ সংবাদও সেপৱ কৰে পাঠাতেন। তাজউদ্দিন সাহেবেৰ ব্যাখ্যা ও অব্যাহতি বা ছাড় বাইবেলেৰ উক্তিৰ ন্যায় মেনে চলা হলো।

এ সমস্ত কৰ্মসূচীৰ ফলে কেন্দ্ৰীয় সরকারেৰ সঙ্গে পূৰ্ব বাঞ্ছলায় একটি সমান্তৰাল আওয়ামী লীগ সৱকাৰ চালু হয়ে গেল। পাকিস্তানেৰ ইতিহাসে এই ঘটনা নজিৰবিহীন।

পূৰ্ব বাঞ্ছলায় বাঙালীদেৱ শক্তিৰ অমিত তেজে পশ্চিম পাকিস্তানীৱা আতঙ্কগত্ত হয়ে পড়ল। এখান থেকে চলে যাওয়াৰ জন্য কৰাচীগামী জাহাজেৰ চলাচলও বন্ধ হয়ে যাওয়াৰ জটিলতা বেড়ে গেল। সুতৰাং ঢাকা এয়াৱপোর্ট একটা পাগলা গাৰদ হয়ে উঠল। সেখানে সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানেৰ টিকিটেৰ জন্য কাঢ়াকাঢ়ি শুৰু কৰে দিল।

তাৰেৱ সাহায্য কৰতে সেনাবাহিনী এগিয়ে এলো কেননা, এখন তাৱা আৱ নিক্ৰিয় ছিল না। পাকিস্তান ইন্টাৱন্যাশনাল এয়াৱলাইসেৰ সকল আন্তৰ্জাতিক সাৰ্ভিস বাতিল কৰে সকল ফ্লাইট ঢাকা সৱকাৰী যাত্ৰী বহন কৰার কাজে ব্যবহৃত হলো। এ সমস্ত যাত্ৰী ছিল পূৰ্ব বাঞ্ছলার জন্য বেসামৰিক পোশাকে, সামৰিক বাহিনীৰ সদস্য। বিমানগুলো সাৰ্বক্ষণিকভাৱে যাতায়াত কৰছিল। ফেৱাৰ পথে ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানীদেৱ পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে আনা হচ্ছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানীদেৱ মধ্যে যে প্ৰচণ্ডভৌতি দেখা দেয়, তা ভিত্তিহীন ছিল না। শেখ মুজিবুৰ রহমানেৰ পৱিষ্ঠাৰ নিৰ্দেশাবলী এবং আওয়ামী লীগ শেছাসেবকদেৱ শান্তি রক্ষাৰ প্ৰচেষ্টা সন্তোষ অৰাঙালীদেৱ জড়িয়ে চট্টগ্ৰাম, খুলনা, ঢাকা এবং আৱো কঠোকৃতি স্ফুন্দৰ শহৰে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। আল্লাহ জানেন, কৰা গুজৰ রাটিয়েছিল যে, অৰাঙালীদেৱ শীঘ্ৰই জৰাই কৰা হবে যা শুনে তাৱা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এহেন ঘৃণা ও আতঙ্কজনিত পৱিষ্ঠিততে প্ৰতিটি স্ফুন্দৰ ঘটনাই অতিৱিভুত হয়ে নিষ্ঠুৰতম আচৱণেৰ পৰ্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

কিছু সংখ্যক অৰাঙালীৰ আসন্ন ভীতিৰ যথাৰ্থ কাৱণ ছিল। শোষকশ্ৰেণীৰ অংশ

হিসাবে তারা নির্দয়ভাবে বাঙালীদের সঙ্গে ঘৃণা আচরণ করেছে এবং তাদের রক্তপাত ঘটিয়েছে। উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার সময় এবং পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় যে সমস্ত বিহারী ভারত থেকে উদ্বাস্ত হিসাবে পূর্ব বাঙলায় আসে, তখন তাদের যারা আশ্রয় দিয়েছিল সেই বাঙালীদের কাছ থেকে তারা নিজেদেরকে সাধারণতঃ পৃথক করে দেখেছিল। তারা বাঙলায় কথা বলতে অঙ্গীকার করত। কথাবার্তায় তারা কেবল উর্দ্ধ বা ইংরেজী ব্যবহার করত। কিছু কিছু অবাঙালীর মনোভাব ছিল ভীষণ উক্ষানিমূলক। আমার এক সাংবাদিক বন্ধু গত শীত ঝাতুর মাসগুলো পূর্ব বাংলায় কাটিয়ে এসে সেখানকার একটি ঘটনায় তাঁর অপমানিত হওয়ার কথা আমাকে বলেছেন। সেখানে তিনি তাঁর বাড়িওয়ালাকে যিনি ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী, উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁর দরিদ্র বাঙালী চাকরদেরকে না খেতে দিয়ে উদ্বৃত্ত খাদ্য ডাস্টবিনে ফেলে দিতে দেখেছেন। এ ধরনের লোকদের যে কোন সমাজে তাদের কুকর্মের শাস্তিস্বরূপ তয় পাওয়ার কারণ থাকে। কিন্তু তাই বলে ২৫ই মার্চের রাতে সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যায়জ্ঞ শুরু হওয়ার পর অবাঙালী পরিবারদের উপর যে নিষ্ঠুরতা চালানো হয়েছে, তাকেও ন্যায়সংস্কৃত বলা চলে না।

১৫ই মার্চ আইন অমান্য আন্দোলনকে আরো কঠোর করা হল। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে গৌছলো যে, সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক আওয়ামী লীগের নামে কেবল করই সংগৃহীত হল না, পূর্ব বাঙলায় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সমগ্র শাসনযন্ত্রই আওয়ামী লীগের নির্দেশে চলতে লাগলো।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা কেন্দ্রীয় সরকারের সুষ্ঠু আজগ্রসাদ লাভের কথা বুবাতে পারল না। ইয়াহিয়া খান ব্যর্থ হয়েছেন এবং ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের মত তিনিও অন্য কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী করে যাবেন-এমন কথা যথেষ্ট শোনা গেল। এই গুরুত্ব তখন কে দায়িত্ব নেবেন সে সম্পর্কে জগ্ননা কঞ্জনার খেলায় পরিণত হলো। সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো খুব সর্তর্কতার সঙ্গে গোপনীয়তা রক্ষা করছিল। কেবল উর্ধ্বতন অফিসারগণই জানতেন যে, কি হতে যাচ্ছে, কিন্তু নগদ্য সংখ্যক অন্য কর্মচারী, যারা সামরিক বাহিনীর গতিবিধির অজস্র প্রমাণ পরীক্ষা করে এই খেলা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছিলেন কিন্তু তাদের সন্দেহের কথা কথনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি।

ইতিগধ্যে পূর্ব বাংলায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলো চৰম দুঃখ কষ্ট ও অবগাননার শিকারে পরিণত হলো। স্থানীয় বাজার থেকে সেনাদলকে খাদ্য-দ্রব্য ও নিত্যকার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিতে অঙ্গীকার করা হল, তারা বাজারে জিনিসপত্র কিনতে গেলে তাদের ব্যঙ্গ করা হত ও তাদের উপর থুথু ফেলা হত। কোন দোকানদারই তাদের কাছে কোন কিছু বিক্রি করতো না শীঘ্ৰই তাদের খাদ্যের

মান অতি সন্তার ডাল-কৃটির পর্যায়ে নেমে এল এবং কোন কোন সময় তাও আসত করাটী থেকে—মাংস, শাক-সজি সরবরাহের সঙ্গে বিগান বাহিনীর মালবাহী বিমানে করে।

ঐ সব কষ্টের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে কুমিল্লাখু পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীতে কর্মরত জনৈক পাঠান আমাকে বলেছেন যে, তাদের একটি দলকে কৌভাবে একদল বিক্ষেপকারী ছাত্র রাস্তায় পাকড়াও করেছিল। আমাদের প্যান্ট খুলে উলঙ্গ করে তারা আমাদেরকে ক্যাটলনমেটের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল। সে আরো বলল, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অনেকের পরনেই জাগিয়া ছিল। নতুনা আমাদের লজাকর অবস্থা হত আরো ভয়াবহ।

ঐ পাঠান ও তার বন্ধুরা হয়তো ২৫শে মার্চের পরে তাদের তরুণ উৎপীড়কদের ওপর মারাত্মক প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। তারা যা করেছে সে সব কথা স্মরণ করলে এখনও আমার মন গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

পঁচিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার কথা বলতে গেলে বহু কথা বলা যায়। পঁচিশ দিনের দুঃঘটনার কালে সেনাবাহিনীর অফিসারগণ তাদের সেনাদেরকে সংযত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। কৌভাবে তারা তা করেছেন, একথা কুমিল্লার একজন অফিসারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন : আহ আমরা তাদেরকে ধৈর্য ধারণের জন্য এবং অবস্থার উন্নতির প্রতি বিশ্বাস রাখার জন্য সব সময় বলতাম। এমন কি আমি নিজেও জানতাম না কি ঘটতে চলেছে। কিন্তু আমাদের সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের শান্তভাবে অপেক্ষা করার পেছনে যথার্থ কারণ রয়েছে এবং আমরা তাই করেছিলাম তখন ঐ জারজ সন্তানেরা আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করেছিল তার জন্য দুঃখ করছে।

সন্তুষ্টবৎ : বাঙালীদের হাতে চরমভাবে অপমানিত হন লেং জেনারেল টিক্কা খান নিজেই। এই সেনাধ্যক্ষ অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরে গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসকের দৈত ভূগিকা পালনের জন্য ঢাকায় আসেন। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আকস্মিকভাবে বরখাস্ত হয়ে গভর্নর আহসান বিদায় নেন এবং টিক্কা খান গভর্নর হাউজে এসে ওঠেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত তাকে শপথ গ্রহণ করানো হয়নি। মনে হয় সামরিক টুপি পরিহিত সেনাধ্যক্ষ প্রশাসনিক আদব কায়দার যথার্থতা সম্পর্কে উদ্বেগসহকারে খুবই ব্যক্ত ছিলেন। শেষে ৯ই মার্চ টিক্কা খান গভর্নর হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত নেন এবং শপথ গ্রহণের অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য পূর্ব বাংলার প্রধান বিচারপতিকে তলব করেন। বিচারপতি সিদ্ধিকী অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন। ঢাকা হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিও তাকে অনুসরণ করেন। শেখ মুজিবের নির্দেশাবলী সর্বোচ্চস্তরে পালিত হচ্ছিল এতে

টিক্কা খান ক্রুদ্ধ হলেও তাঁর করার কিছু ছিল না। যাই হোক, ব্যাপারটা সেখানেই চাপা পড়ে গেল। যে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা চালু ছিলো, তা বঙ্গবন্ধু কর্তৃক তাঁর ধানমন্ডিষ্ঠ ৩২ নং সড়কের ছোট দোতলা বাড়ি থেকে পরিচালিত হত। সেখানে অবশ্য সামরিক এলাকাও ছিল। তা সামরিক শাসনের প্রধান অফিসে পরিণত হয় এবং টিক্কা খান প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সরাসরি নিয়োজিত হয় ইতিমধ্যেই সেখানে এসে আসন গেড়ে বসেছিলেন কাজেই টিক্কা খানকে কেবল একটি সামরিক টুপি নিয়েই ২৭শে মার্চ পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকতে হল। যখন সেনাবাহিনী নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পৈশাচিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অগ্রসর হয় এবং তিনি প্রধান বিচারপতির চাকরির উপর আধিপত্য করার মত মর্যাদা লাভ করেন।

১৫ই মার্চ যখন আইন অমান্য আন্দোলন চৰম মাঝায় পৌছে তখন ইয়াহিয়া খান ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। প্রকাশ্যভাবে তাঁর ঢাকা আসার যে কারণ দেখানো হয়, তা'হল একটা রাজনৈতিক শীমাংসায় উপনীত হওয়া। অকৃত ঘটনা হল এই যে, সংকটময়কালে তিনি আরো অধিক সময় নষ্ট করতে চান। সে সময় এমন কি শেখ মুজিবের পক্ষেও স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি অপ্রতিবেদ্য হয়ে দাঢ়ায়। ইয়াহিয়া খানের জন্য এটা ছিল আলোচনাকালে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা শুরু করার সময়।

একটা শীমাংসা সম্পর্কে শাসকচক্রের যদি আন্তরিকতা থাকত তা হলে এ সন্দিকালে এসব তারা করত না। ১৪ই মার্চ তারিখে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলাপ আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্টের ঢাকা আসার আগের দিন টিক্কা খান এক সামরিক আইন আন্দেশ জারী করলেন যে, যেসব সরকারী কর্মচারী প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে বেতন পাচ্ছেন তাঁদেরকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কাজে যোগদান করতে হবে। আন্দেশে আরো বলা হয় কাজে যোগদানে ব্যর্থ হলে তাঁদেরকে শুধু বরখাস্তই করা হবে না বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁদের বিচার করা হবে। এই চৰম আন্দেশের মেয়াদের অবসানও প্রেসিডেন্টের আগমন যুগপৎ ঘটেছে। ঘটনাটিকে কেউই গ্রাহ্য করেনি। দু'দিন পরে একই আন্দেশের পুনরাবৃত্তি ঘটে, এবার তাঁদেরকে তিন দিনের মোটিশ দেয়া হল। এতে বলা হল দৃঢ়তিকারীদের হমকিতে কাজে যোগদানে বিরত থাকতে যাঁরা বাধ্য হয়েছেন তাঁরা তিনদিনের মধ্যে কাজে যোগদান করতে পারেন। শীমাংসা সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠীর যদি আন্তরিকতা থাকত তা'হলে স্পষ্টতই এহেন উক্খানি এড়িয়ে চলতেন। শেখ মুজিব এবং বাঙালীরা এ ব্যাপারে সাড়া দিতে পারতেন এবং তা তাঁরা দিয়েছেনও। তাঁরা এই আন্দেশ অগ্রহ্য করেছেন। ১৬ই মার্চে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শেখ মুজিবের বৈষ্টকের প্রথমেই এটাকে পাল্টা অভিযোগের বিষয়ে পরিণত করা হল।

প্রেসিডেন্টের দল এবং সরকারী আলোচনাকারী দল-এর মধ্যে আরো উক্ফানি দেওয়া হচ্ছিল, তা ছিল আলোচনায় জট পাকানোর উদ্দেশ্য। পূর্বোক্ত দলে ছিলেন বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক রিজড়ো। এই লোকটি ১৯৬৮ সালে কৃত্যাত আগরতলা ঘড়্যন্ত মামলায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৈরীর জন্য দায়ী ছিল। এই দলে ছিলেন আরেকটি মামদো ভৃত। যাকে বাঙ্গালীরা সবচেয়ে ঘৃণিত এবং অবাঞ্ছিত বলে জানে, তিনি হলেন আন্তঃগোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মেজের জেনারেল আকবর। এই দলের শোভাবর্ধক লেং কর্নেল হাসান, যিনি ছিলেন ঐ আগরতলা ঘড়্যন্ত মামলায় সরকার পক্ষের অন্যতম উকিল। তাঁকে এই দলের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য, যাতে এসব ব্যক্তি শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে পারে। তা'ছাড়া এই লোকটি সামরিক আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং সামরিক আইনবিধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কিছু জানার জন্য তাঁর প্রয়োজন। এই অজুহাতে তাঁকে দলভূক্ত করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সবচেয়ে সংকটপূর্ণ রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট এই দলের চেয়ে অধিক উক্ফানিদানকারী দল কোন রাষ্ট্রপ্রধান তার সঙ্গে নেয়ার জন্য মনেন্নীত করতে পারতেন না। আওয়ামী লীগ প্রধানের এ বৈঠক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীসূচক প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তাঁর প্রথম বৈঠকের সময় তিনি প্রেসিডেন্ট কক্ষের প্রবেশ-পথে এই লোকগুলোকে চলা ফেরা করতে দেখলেন। নিজের বাসভবনে ফিরে এসে শেখ মুজিব তাঁর এক বকুলে বললেন : ইয়াহিয়া তাঁর জালিয়গুলোকেও সঙ্গে করে এলেছেন। তিনি কি চান যে আমি এদের সঙ্গে কথা বলি।

তথাপি শেখ মুজিব অচলাবস্থান্তরণে শান্তিপূর্ণ পথে সমাধান খুঁজে পাওয়ার জন্য আলোচনা বৈঠকে বসেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর মর্যাদা হারাননি। সরকারী দলের সঙ্গে আলোচনার জন্য তিনি তাজডিন, ডঃ রেহমান সোবহান ও ডঃ কামাল হোসেনকে পাঠান এবং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শীর্ষ বৈঠকের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখেন।

আলোচনাসভাগুলো ছিল প্রহসন এবং স্মরণ করার মত কিছুই ছিল না। সেগুলো সফল হবে বলে কখনো আশা করা যায়নি। আলোচনাগুলো ছিল ঠিক রণকৌশলের মত, যা টিক্কা খানও সেনাবাহিনীকে পঁচিম পাকিস্তান থেকে প্রয়োজনীয় অভিযোগ সেনা ও রণসম্ভাবনার আনার জন্য আরো কিছু সময় দিয়েছে। সবচেয়ে লক্ষ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, আলোচনা কখনো ভেঙ্গে যায়নি। তার সমাপ্তি ঘটেছে ২৫শে মার্চ সামরিক বাহিনীর কর্ম ব্যবস্থাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে। শেখ মুজিব শেখ পর্যন্ত আলোচনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এমন কি প্রেসিডেন্ট যখন আকাশ পথে করাচী ফিরে যাচ্ছিলেন তখনও তিনি শীমাংসায় আস্থা পোষণ করছিলেন। 'পূর্ব পাকিস্তানে সংকট' শীর্ষক

সরকারী শ্বেতপত্র আলোচনা ভেঙে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে নীরব থাকার সুযোগ নিয়েছে। সরকার দলের চাতুরীর সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় শেখ মুজিবের সর্বশেষ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, তাতে তিনি বলেছেন— ক্ষমতা হত্তাত্ত্ব সম্পর্কে আমরা গভৈরে পৌছেছি এবং আমি আশা করি প্রেসিডেন্ট এখন তা ঘোষণা করবেন। বিদেশী সাংবাদিকগণ যখন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এই অকপট উক্তি হজম করছিলেন তখন সামরিক বাহিনীর লোকেরা যে কোন মুহূর্তের নোটিশে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিঃশব্দে তাদের ট্যাংক সঁজোয়া গাড়ীতে ও ট্র্যাকগুলোতে অপেক্ষা করছিল।

এসব থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বন্দি নিজেদেরকে ইয়াহিয়া খান ও তার অফিসারদের হাতে এভাবে প্রতারিত হওয়ার মত অবিশ্বাস্যরূপে নির্বোধ না হলেও বিশ্বাসকরূপে সরল ছিলেন। এই ধারণা আমি নিঃসন্দেহে পোষণ করতে পারি না। প্রয়াণাদি একথার উপর স্পষ্টরূপে সাক্ষা দেয় যে, ১৫ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ঢাকাস্থ গৰ্ভনিমেন্ট ভবনটি ছিল সম্ভূত আধুনিককালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক হেমালির নাট্যমঞ্চ। বাস্তবতার প্রতি আওয়ামী লীগের কৌতুহলজনক অঙ্গতা, আমরা যারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসল বিপদ দেখতে পাচ্ছিলাম, তাদের কাছে ছিল আরো অধিক বিরক্তিকর। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আমরা প্রতি মুহূর্তে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে খবর জানতে পারিনি। ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে সামরিক বাহিনীর প্রস্তুতির প্রমাণ আওয়ামী লীগ আগে থেকে ঘুরেছিল।

পি, আই, এ বোয়িং এবং পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সি-১৩০ বিমানগুলো নিয়মিতভাবে সাজ সরঞ্জামসহ যোদ্ধাদের বয়ে আনছিল। ঢাকা বিমান বন্দরটি মেশিনগান ও বিগান বিক্রিস্বী কামানে সজ্জিত হয়ে বিমান ধাটিতে পরিণত হয়েছিল। দূরবর্তী সীমান্ত জেলাগুলো থেকে টাঙ্গুলো শহরে নিয়ে আসা হলো। সেগুলোকে শহরের ব্যবহারেপোয়েগী করে নেওয়া হল। সেনাদলের নিয়মিত গতিবিধি চলতেই থাকল। পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী ও বাঙালী বেঞ্জিমেন্টে অফিসার ও লোকদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করা হল। কিছু লোককে করা হল নিরস্ত্র। নেতৃত্বন্দি এ সমস্ত খবর জানতেন। ১৯শে মার্চ ঢাকা শহর থেকে ২২ মাইল দূরে অবস্থিত জয়দেবপুরে চীন নির্মিত অর্ডন্যাপ ফ্যাট্রীতে পাহারারত পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর একটি দলকে নিরস্ত্র করতে গেলে পশ্চিম পার্কিস্তানী সেনাদল ও স্বাক্ষীয় জনগণের মধ্যে যারাওক সংঘর্ষ হয়। সরকারী হিসাব মতে দু'জন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়। আওয়ামী লীগ নিজস্ব হিসাব মতে সেনাবাহিনীর লোকদের গোলাগুলীর ফলে নিহতের সংখ্যা ১২০ জন।

২৪শে ফেব্রুয়ারীর আগেই শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর লোকদেরকে ইংশিয়ার করে দিচ্ছিলেন যে সংবিধান প্রণয়নের কাজ নস্যাং করার জন্য একটি কৃত্রিম সংকট তৈরী করা হচ্ছে—“এবং চক্রান্তকারী শক্তিগুলো পুনরায় আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পরিষদের অধিবেশন মূলতবী হয়ে যাবার পর এবং বাঙালীদের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে তুরা মার্ট শেখ মুজিব বলেন, “দুঃখের কথা এই যে সমস্ত বিমানের পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে আসার কথা ছিল, তার বদলে সেগুলো সামরিক বাহিনীর লোক ও অন্তর্শান্ত বহন করার কাজে নিয়োজিত হয়েছে—।”

এ সমস্ত অগুভ ইঙ্গিত থাকা সন্ত্রেও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে প্রেসিডেন্ট ও তার অফিসারদের সঙ্গে বিরামহীনভাবে আলোচনায় নিযুক্ত রেখেছেন। এতে তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সহজ বিজ্ঞতা ও ছিল না। ৭ মার্চ রেসকোর্স জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান “পূর্ব বাংলার প্রতিটি ঘরকে দুর্গে পরিণত করার” নির্দেশ দেন, প্রদেশব্যাপী সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। এই সহজাত প্রবৃত্তি ছিল যথার্থ, কিন্তু এ ব্যাপারে যে সমস্ত আদেশ দেয়া হয়েছিল, তা যথার্থভাবে কাজে পরিণত হয়নি। বস্তুতঃ ২৩ মার্চ পল্টন ময়দানে বাংলাদেশের তিন রঙা পতাকা উত্তোলনের ঘটনা ছিল উৎসাহব্যাঞ্চক। চারপাশে দুর্গ পরিখা খনন করার মত যে প্রজ্ঞা জনগণের ছিল আরো অধিক প্রত্যয় প্রদান করবে এবং পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত সামরিক ক্যাটনমেন্টে যে মুক্ত প্রস্তুতি চলছে তার সমরক্ষ না হলেও তারা তার বিরুদ্ধে রংখে দাঁড়াবে। বিলম্বে হলেও এই ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসের মোড় ঘূরিয়ে দেবে।

যতই এটা দেখানো হোক, আওয়ামী লীগের আইন অমান্য আন্দোলনে সাফল্য ততটা প্রয়োজনীয় সামগ্রীপূর্ণ ছিল না। সর্বাধিক চাপ প্রয়োগ এবং সবচেয়ে কম প্রস্তুতির ভাষ্টি হয় ক্ষতিকর। ফলতঃ পূর্ব বাংলা রেজিমেন্ট ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর মুষ্টিমেয় অফিসার ও জোয়ানদের বিশ্বায়কর সাহস ও সংকলনের দৃঢ়তা পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর লোকদের অভিযানকে প্রতিরোধ করেছে। সেই দিনে তাঁরাই বাংলাদেশকে রক্ষা করেছেন। প্রতিটি দেশের সাহসী মানুষ তাঁদের সালাম জানাবে।

## গণহত্যা

আমরা তাদেরকে ঝুঁজে ঝুঁজে খতম করছি ।  
—মেজর বশির, কুমিল্লা ।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। রাত আটটা ধানমন্ডি শ্রেণী সড়কের প্রবেশমুখে একটি গলিতে একটি পরিচিত রিআ দ্রুতগতিতে এসে থামলো। যে ভবনের বাইরে এসে থেমেছে সে ভবনটি হল শেখ মুজিবুর রহমানের বাস ভবন। রিআ চালক কাশছিল এবং হাঁপাচ্ছিল। সে বলল, 'বঙ্গবন্ধুর জন্য একটি জরুরী চিরকুটি নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থেকে রিআ চালিয়ে এসেছি। বাংলায় লেখা স্বাক্ষরবিহীন চিরকুটি বার্তাটি ছিল সংক্ষিপ্তঃ :

"আপনার বাসভবন আজ রাতে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে।"

সে সময়ে সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের একজন আমাকে বলেছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আসন্ন হামলার খবর ঐ চিরকুটে তাঁরা প্রথমবারের মত পেয়েছিলেন। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অধোধিত প্রস্থান আওয়ামী লীগ মহলে বেশ নাড়া দিয়েছিল। তারপরেই যখন সেনাবাহিনীর অঙ্গ গতিবিধির লক্ষণ দেখা দিল তখন শেখ মুজিব তাঁর সহকর্মীদের সতর্ক করে দিলেন এবং গা ঢাকা দেয়ার প্রস্তুতি নিতে বললেন। বঙ্গবন্ধু নিজে কোন সতর্কতা অবলম্বন করতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, 'আমর জায়গায়' অর্থাৎ নিজ বাড়ীতেই থাকবো। তখন থেকেই ক'জন বাঙালী তার খবর রেখেছেন। শেখ মুজিবের বেশ ক'জন অনুসারী আঘণ্টা পর পর তাঁর বাসায় টেলিফোন করে তাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কে খোজ-খবর নিচ্ছিলেন। তাঁর গৃহত্যা হ' হ্যাঁ' ধরনের জবাব দিয়েছিল। রাত দেড়টায়, আড়াই ঘন্টা পরে, গোলাগুলীর আওয়াজে আকাশ বাতাস উন্তাল। আগন্তের চোখ-ধাধানো শিখায় রাতের আকাশ যখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সে সময় শেখ মুজিবের বাসার টেলিফোনটি স্ক্রু হয়ে গেল। তীব্র আতঙ্কের ভেতরে একথা প্রচারিত হলো যে, সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে প্রে�তার করেছে।

একজন প্রতিবেশী তিনি সঞ্চাহ পরে বাড়ির দেওয়ালে বুলেটের গর্তের দিকে

অঙ্গুলী নির্দেশ করে কীভাবে শেখ মুজিব শাস্তি অবস্থায় প্রেফতারকারীদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেদিনের সে ঘটনা স্মরণ করে আমাকে সব বললেন।

তিনি বললেন, রাত দেড়টায় সেনাবাহিনীর দু'টি জীপ ও কয়েকটি ট্রাক ৩২ নং সড়কের সদর দরজায় এসে থামল। কয়েক মুহূর্ত পর পাক সেনারা পঙ্গপালের মত বঙ্গবন্ধুর বাড়ির বাগানে সমবেত হলো। বাড়ির ছাদ ও উপর তলার জানালা লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়া হলো। সেনাবাহিনীর লোকেরা সরাসরি আক্রমণ করেনি শুধু ভয় দেখাচ্ছিল। তখন এই গোলমালের মধ্যে শেখ মুজিব তাঁর উপর তলার শোবার ঘরে ছিলেন। সেখান থেকে বলতে শোনা গেল, ‘তোমরা অমন বর্বরের মত আচরণ করছো কেন? আমাকে তোমরা ডাকলেই তো আমি তোমাদের কাছে নেমে আসতাম।’ পাজামার উপর তামাটে লাল রঙের গাউন পরিহিত শেখ মুজিব সিডি বেয়ে নীচে নেমে এলেন, সেখানে একজন তরুণ ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে ছিল। আমার সংবাদদাতা আমাকে বলেছেন যে, এই অফিসারটি ছিল বিনয়ী ও ন্যূন স্বভাবের। সে দৃঢ় ও বিনয়ী কষ্টে বলল, আমার সঙ্গে চলে আসুন স্যার। তারপর শেখ মুজিবকে নিয়ে তারা সবাই গাড়িতে উঠে চলে গেল।

বেগম মুজিব ও তাদের শিশু পুত্র পাশের বাড়িতে পালিয়ে যাওয়ার এক ঘটনা পরে সেনাভর্তি আরেকটি ট্রাক ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়াল। এবার পাক সেনারা মোটেই ভদ্র ব্যবহার করল না। তারা নিচের তলার প্রতিটি জানালার কাঁচ ভেঙেগ গুঁড়ো গুঁড়ো করল। আসবাবপত্র, বিছানাপত্র ও পুস্তক রাখার আলমারিগুলো উল্টিয়ে পালিয়ে তচ্ছন্দ করে দিল। দেওয়াল থেকে আলোকচিত্র ও তৈলচিত্রগুলো বিছিন্ন করে ডেসেচুরে মেরোর উপর ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ফেললো। হালকা ঝুঁপালী ফ্রেমে আঁটা চীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং-এর স্বাক্ষরকৃত একটি ছবি তার মধ্যে ছিল। আমি ডেবে বিস্মিত হলাম শেখ মুজিব এ ছবি কি করে পেলেন। পাক সেনারা ঠিক কোন কিছুর খোঁজ করছিল না। তারা যেন শক্রকে হাতের মুঠোয় পেয়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করছিল যেমন আহত বাষ বৃষকে আক্রমণ করে।

এখিলের মাঝামাঝি সময়ে আমি যখন শেখ মুজিবের বাড়িতে যাই, তখন এসব কিছুরই প্রমাণ দেখতে পাই। সেখানে প্রাণী বলতে ছিল একটা ধূসর রঙের বড় বিড়াল, বিড়ালটি সেখানে এসে আমাদের দিকে শাস্তি দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো। আর ছিল আবর্জনায় ঠোকরাত তিনটি মুরগী ও ঘরের পার্শ্বে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ডজন খানেক কবতুর। বঙ্গবন্ধুর বাসভূমিটি পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছিল। ঠিক একপ বাড়ি আমি পূর্ব বাংলার অন্যান্য এলাকায় দেখেছি—সমগ্র গ্রাম ও শহরের সারিসারি বাড়ি শূন্য রেখে জনসাধারণ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গেছে। বাড়িয়ের ত্যাগ করার আগে তারা শুধু সমর দেবতাকে প্রসন্ন করার জন্য সবুজ ও সাদা রঙের

হাজার হাজার পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে রেখে গেছে। বর্বরতার বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা স্বরূপ এই পতাকাগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লোকদের খুব কমই কাজে লেগেছে। তা সত্ত্বেও সেগুলো সোনালী সূর্য কিরণে দুলতে থাকে, জনবিহীন ভৌতিক অবকাশ উদয়াপনের মত।

যারা সৌভাগ্যবান তারা সীমান্তের ওপারে ভারতে চলে যায়। এদের প্রায় সকলেই নির্যাতি নির্ধারিত ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। অন্যেরা শেখ মুজিবের মত ধরা পড়ে। জনগণের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়; এবং বেরোনেটের বৌঢ়ায় ও গুলির আঘাতে নিহত বিকৃত দেহগুলো স্ফীত অবস্থায় মাঠে, খানা-খন্দকে ও বাতাসে মৃদুভাবে আন্দোলিত নারকেল গাছপালার মাঝখানে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

এপ্রিল মাসে পূর্ব বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল খুবই আকর্ষণীয়। ইঁট উঁচু ধানের সবুজ কাপেট, মধ্যে মধ্যে কাঁচ স্বচ্ছ কুন্দু কুন্দু জলাশয়, দিগন্ত বিস্তৃত কুন্দু কুন্দু উঁচু কুটিরের সারি শোভা পাছিল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে লাল বর্ণের চোখ-ধান উজ্জ্বল চিত্র দেখে মনে হয় প্রকৃতির সৌন্দর্য মেন পূর্ণতা লাভ করেছে। আম কঁঠালের গাছগুলো ফলভারে নুয়ে পড়েছে। চাপা ফুলের মন মাতালো সৌরাতে বাতাস পরিপূর্ণ। প্রকৃতির ঘোন যেখানে থরেবিথেরে সাজানো, সেখানে হতভাগ্য কেবল মানুষগুলোই বিসদৃশভাবে ছিন্নবিছিন্ন।

মার্টের সেই ভয়ংকর রাতে শেখ মুজিবুর রহমানের নিরপায় নিশ্চেষ্টতা ছিল বিশ্য়াকর। এটা সহিংস সুন্তোষ রক্ষণাত্মক বিরোধী কাজ, যা রাজধানীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বাস করেছিল। যে মুহূর্তে পূর্বাঞ্চলীয় সেনানিবাসের প্রধান দণ্ডের ঘরের পৌছল যে, প্রেসিডেন্ট নিরাপদে কর্তৃতৈ পৌছেছেন, সেই মুহূর্তে পাক-সেনাবাহিনী কাজে লেগে পড়ল। এটা ঘটেছিল রাত সাড়ে এগারটায়। মাঝারাতের মধ্যেই পাক-সেনাবাহিনীর সব দলই তাদের ভয়াবহ কাজে লেগে গেল। ট্যাঙ্ক, বাজুকা ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেলসহ পিলখানায় পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীকে আক্রমণ করলো। একই সময়ে রাজারবাগসহ পুলিশের প্রধান কার্যালয়ও আক্রান্ত হলো। উভয় স্থানেই অপ্রস্তুত বাঙালীরা যাদের সংখ্যা হবে প্রায় পাঁচ হাজার। শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল বটে, তবে আগে থেকে প্রস্তুত থাকলে তাদের প্রতিরোধ আরো জোরদার হতো। যা'হোক এর পরিণাম ছিল সুস্পষ্ট। পাক-সেনাবাহিনীর ছিল আকস্মিক আক্রমণের আয়োজন, আর ছিল অধিক সংখ্যক সেনাবল, উৎকৃষ্টতর অস্ত্র ও গোলা বারংবারের সুবিধা। বাঙালী বাহিনীর লোকেরা স্তুত্য বরণের আগে পাক-সেনাবাহিনীকে জাহানামে পাঠিয়ে ছাড়ে। আমরা যখন আক্রান্ত এলাকা দেখতে গিয়েছিলাম তখন আমাদের সাহায্যকারী লোকটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করেছিল।

শহরের অন্যত্র পাক-সেনাবাহিনীর দলগুলো বাজুকা, অগ্নি নিষ্কেপকারী অস্ত্র, মেশিনগান ও স্বয়ংক্রিয় রাইফেল এবং সময় সময় ট্যাক্সসহ পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যস্থলগুলোতে আক্রমণ চালায়। তাদের একটি ইউনিট আওয়ামী লীগের পক্ষী পত্রিকা 'দি পিপল' এর অফিসে যায়। অফিসটি ছিল ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের ছাদে অবস্থানরত দলবদ্ধ ভীত বিদেশী সাংবাদিকদের দৃষ্টি সীমার মধ্যে অবস্থিত। ঐ সেনাবাহিনীর লোকেরা সংকীর্ণ গলিতে সরাসরি গুলি ছোড়ে। পত্রিকা অফিসের কর্মচারীগণ পালাতে চেষ্টা করলে তাদের নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। দালানের যা অবশিষ্ট ছিল তাতে গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এভাবেই সেনাবাহিনী একটি শক্ত নির্ধনযজ্ঞ সমাপ্ত করে। (বংশাল রোডসহ 'সংবাদ' পত্রিকাটি ও আক্রান্ত হয়। পত্রিকার ক'জন সাংবাদিকসহ প্রতিষ্ঠানটির সরকিছু পুড়িয়ে দেয়া হয়)।

শহরের অপর প্রান্তে একটি প্রসিদ্ধ বাংলা সংবাদপত্র 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর ভাগ্যেও একই দশা ঘটে। যখন প্রকাশ পেল যে কাজটি ভুল বশতঃ হয়ে গেছে তখন সেনাবাহিনী তা সংশোধন করল। পত্রিকা অফিস পুনর্নির্মিত হলো এবং কোন এক হালনের একটি পুরনো ছাপাখনা ধার করে পত্রিকাটি পুনরায় চালু করা হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের আবাসগুলোতে নিহত শত শত ছাত্র ও শিক্ষক কিংবা শাখারী পত্রি, তাতিবাজার অথবা বিরাট রেসকোর্স ময়দানের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো মন্দিরের চারপাশে অবস্থিত সারিসারি ঘরগুলোতে বসবাসরত হাজার হাজার নিহত হিন্দুদের জন্য কেউ চোখের জল ফেলল না। পাক-সেনাবাহিনীর লোকেরা শাখার পত্রির অপ্রশন্ত রাস্তার উভয় প্রান্ত অবরোধ করে ঘরে ঘরে হানা দিয়ে প্রায় আট হাজার নারী-পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছে।

টহলরত সেনাবাহিনীর আরেকটি দল নিউ মার্কেটের নিকটবর্তী লেফটেন্যান্ট কমান্ডার গোয়াজ্জেম হোসেনের বাড়িতে হানা দেয়। তিনি ছিলেন একজন নামী আওয়ামী লীগ কর্মী ও নৌবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। তিনি ১৯৬৮ সালের তথাকথিত আগরতলা ঘড়্যন্ত গামলায় শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সহ অভিযুক্ত ছিলেন। এই হতভাগ্য কমান্ডারকে ঘর থেকে টেনে বের করা হয় এবং তার সন্ত্রস্ত স্ত্রীর সম্মুখে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। চলে যাওয়ার নির্দর্শন স্বরূপ পাক সেনারা ঘরের বিভিন্ন অংশ লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। শহরের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাণ সংবাদ থেকে জানা যায় যে, অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা এবং ছাত্রনেতাদের উপর পাক সেনারা শিকারী কুকুরের মত ঝাপিয়ে পড়ে।

সামরিক বাহিনীর আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য ছিল মুসলিম ছাত্রাবাস 'ইকবাল হল' এবং এর নিকটতর্বী হিন্দু ছাত্রাবাস 'জগন্নাথ হল'। পাক সেনাবাহিনীর লোকেরা দু'টো হলই ঘেরাও করে এবং বাজুকা ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রাদির সাহায্যে কয়েক মিনিট

অফুরন্ত শুলি বর্ষণের পর অবরংক্ষ হলগুলোতে বসবাসরত ছাত্রদের নির্বিচারে হত্যা করে। নিহত হিন্দু ছাত্রদের হলের আঙিনার বাইরে তাড়াহড়ো করে কাটা একটি পরিখায় মাটি চাপা দেয়া হয় কিংবা হল ভবনের ছাদের উপর পচনের জন্য ফেলে রাখা হয়।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মূল অংশ হিসেবে পরিচিত শতশত অধ্যাপক, চিকিৎসক ও শিক্ষককে 'জিজ্ঞাসাবাদের' জন্য ডেকে নিয়ে কীভাবে রাতারাতি চিরতরে শেষ করে দেয়া হয়েছে, দেশ থেকে পলায়নরত বাঙালীরা তার বর্ণনা দিয়েছে। নিরপেক্ষ নির্দলীয় লোকদের কাছ থেকে প্রাণ সাক্ষ প্রমাণাদি তা' সমর্থন করেছে। ঠিক একইভাবে সেনাবাহিনী কর্তৃক গৃহীত ভয়ংকর 'শুন্দি অভিযানের' মাধ্যমে বাঙালী যুব সম্প্রদায়ের সর্বোৎকৃষ্ট অংশকে তন্ম করে খুঁজে বের করে শেষ করে দেয়া হয়েছে।

ঢাকায় ৪৮ ঘণ্টা ধরে রক্তস্নান চলে। ২৬শে মার্চের পূর্বাহ্নে প্রকাশ্য দিবালোকে কার্ফু বা সান্ধ্য আইন ভঙ্গের দায়ে কয়েকশ' নিরীহ নিরপরাধ লোককে নির্বিচারে শুলি করে হত্যা করা হয়। অথচ কার্ফু বা সান্ধ্য আইনের কথা ঘোষণার মাধ্যমে জনসাধারণকে আগে জানান হয়নি। আনুমানিক দশটার মধ্যে যখন এ কাজ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হলো, তখন পূর্ব নির্ধারিত শিকারদেরকে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে আটক করার জন্য সান্ধ্য আইনকে ব্যবহার করা হলো।

প্রায় সেই একই সময়ে পাক সেনাবাহিনী অন্যদিকে তাদের পৈশাচিক দস্ত দেখাতে লাগল। ভূট্টো সাহেবসহ যে সকল রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য ঢাকা এসেছিলেন, তাঁরাও জানতে পারেননি যে, ভূট্টো সাহেবে ২৫শে মার্চ সকালে চলে যাবেন। প্রকৃতপক্ষে সেদিন সক্যায় শেখ মুজিবের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের কথা ছিল। দৃশ্যাতঃ ভূট্টো অধিক জরুরী কাজে আটকা পড়ে শেখ মুজিবের কাছে বিকেল ছাটার দিকে এই মর্মে টেলিফোন করেন যে, তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চান বলে তাদের মধ্যেকার বৈঠক পরদিন পর্যন্ত স্থগিত রাখার প্রস্তাৱ করেছেন। শেখ মুজিব এর জবাবে তাঁকে বললেন, বৈঠক স্থগিত রাখতে তাঁর আপত্তি নেই কিন্তু তিনি কি করে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করছেন? তিনি তো ইতিমধ্যেই করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।' কয়েকজন ছাত্র নেতার প্রদত্ত প্রস্তাব থেকে জানা যায় যে, ভূট্টো এতে বিশ্বিত হন। তিনি প্রেসিডেন্টের ভবনে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে বলা হয় যে, প্রেসিডেন্ট এখন 'পূর্বাধূলীয় প্রধান সেনানিবাসে ডিনার' খাচ্ছেন। কাজেই এখন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে পারবেন না। মনে হয় ভূট্টো সংবাদটি পেয়েছিলেন। পরদিন তাঁকে প্রাসঙ্গিক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। করাচীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা

দেবার জন্য বিমানে ওঠার আগে তাঁর সামরিক প্রহরীগণ তাঁকে, সেনাবাহিনীর লোকেরা তখনও পর্যন্ত শহরের যে সমস্ত এলাকায় নৃশংসতা চালিয়ে যাচ্ছিল সে সমস্ত এলাকায় সংক্ষিপ্ত সফরে নিয়ে যায়। ভূট্টোর অনুসারীগণ বলেন যে, এর কোন তাৎপর্য ছিল না। কিন্তু অপর একজন রাজনীতিবিদ আমাকে বলেছিলেন যে, সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোন কাজ করলে, এর পরিণতি কি হবে তাঁর জুলত্ত প্রমাণ দেখানোর অভিযানেই এ ব্যবস্থা করা হয়। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ভূট্টো যা দেখেছেন সে সম্পর্কে তিনি অঙ্ক কিংবা অনুভূতিহীন থাকতে পারেননি। করাচী আগমনের পর 'পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে' বলে তিনি যে প্রকাশ্যে সেনাবাহিনীর নৃশংসতার সমর্থন করেছেন, তা' সম্ভবতঃ এই শতাব্দীর একজন জননেতার সবচেয়ে মারাত্মক উক্তি ও ভাস্তি। যা'হোক, ক্রমে ক্রমে হত্যায়ের দৃষ্টান্ত চোখে পড়তে লাগল। ভীত সন্ত্রস্ত বাঙালীরা সহসা বুবাতে পারল যে, পর্যবেক্ষণ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পূর্ব বাঙালায় গণহত্যা শুরু করেছে।

সারা প্রদেশ জুড়ে হত্যাকান্ডের সুবাবস্থার নমুনার সঙ্গে জেনোসাইড বা গণহত্যা শব্দটির আভিধানিক সংজ্ঞার হ্রবহ মিল রয়েছে। পরে আমি যখন কুমিল্লাহু ১৪ নং ডিভিশনের প্রধান কার্যালয় সফরে যাই, তখন জানতে পারি যে, বর্বরতা ও ব্যাপকতার সঙ্গে উক্ত অভিযানের জন্য সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা কার্যকর করা হচ্ছে।

গণহত্যার লক্ষ্যবস্তু ছিল এই :

- ১। ইট বেসল রেজিমেন্টের বাঙালী সৈনিক পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীর লোক, পুলিশ এবং আধা সামরিক আনসার ও মুজাহিদ বাহিনীর লোক।
  - ২। হিন্দু সম্প্রদায় "আমরা কেবল হিন্দু পুরুষদেরকে হত্যা করছি, হিন্দু নারী ও শিশুদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি। আমরা সৈনিক, নারী শিশুদেরকে হত্যা করার মত কাপুরুষ আমরা নই-। কুমিল্লায় আমি একথা শনেছি।
  - ৩। আওয়ামী জীবের লোক—নিম্নতম পদ থেকে নেতৃত্বহীনীয় পদ পর্যন্ত বিভিন্ন শরের লোক, বিশেষ করে এই দলের কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকগণ।
  - ৪। ছাত্র—কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তরুণের দল ও কিছু সংখ্যক ছাত্রী। যঁরা ছিলেন অধিকতর সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন।
  - ৫। অধ্যাপক ও শিক্ষকদের মত বাঙালী বুংজীবী সম্প্রদায় যারা 'সংগ্রামী' বলে সেনাবাহিনী কর্তৃক সব সময় নিদিত হতেন।
- ঢাকায় এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানে সেনাবাহিনীর লোকেরা যখন তাদের নৃশংসতা চালাত তখন তারা এই হতভাগ্য লোকদের তালিকা সঙ্গে নিয়ে যেত।

২৫শে মার্চের আগে সেই অবমাননাকর দিনগুলোতে অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই হতভাগ্য লোকদের তালিকা তৈরী করা হয়। তারপর সেনাবাহিনীর লোকেরা ভৱান্কর প্রতিশোধ নিতে শুরু করে।

হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে বের করা হচ্ছিল। কারণ শাসকগোষ্ঠী তাদেরকে মনে করত 'ভারতের অনুচর' তারা পূর্ব বাংলার মুসলমানদের কলুষিত করে ফেলেছে। বাঙালী সামরিক পুলিশ বাহিনীর লোকদের অনুসন্ধান করার কারণ তারাই একমাত্র শিক্ষাপ্রাণ দল, যারা সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ দিতে সমর্থ। অন্যদেরকে গণহত্যার আওতাভুক্ত করার কারণ তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঞ্চকাকে রাষ্ট্রের অবস্থাতার প্রতি প্রত্যক্ষ হমকি স্বরূপ মনে করা হচ্ছিল।

আমি চিন্তা করে দেখেছি যে, গণহত্যা ছিল 'শোধন প্রক্রিয়া' যাকে শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান বলে মনে করত। সেই সঙ্গে এই বর্বরেচিত উপায়ে প্রদেশটিকে উপনিবেশে পরিণত করাও ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিচ্ছিন্নতার হৃষকি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে চিরদিনের জন্য পবিত্র করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সেজন্য যদি বিশ লাখ লোককে হত্যা করতে হয় এবং প্রদেশটিকে তিরিশ বছরের জন্য উপনিবেশ হিসাবে শাসন করতে হয়, তবুও। কুমিল্লাস্থ ১৬ নং ডিভিশনের প্রধান কার্যালয়ে অভদ্রভাবে আমাকে একথা বলা হয়।

এই ছিল পূর্ব বাংলার সমস্যা সম্পর্কে সামরিক শাসকগোষ্ঠীর চূড়ান্ত সমাধান। হিটলারের পর থেকে এ পর্যন্ত এমন পৈশাচিক দৃষ্টান্ত আর এই বিশ্বে দেখা যায়নি।

কুমিল্লা অঞ্চলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমার স্বল্পকালীন অবস্থান কালে হত্যা ও অগ্নিশয়োগ অভিযানের ফলে যে প্রচন্ড ভীতি দেখা দেয় তা আমি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছি। সেখানে গ্রামে গ্রামে ও ঘরে ঘরে হানা দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু ও যারা সামরিক বাহিনীর চোখে অপরাধী ছিল তাদের ধরে এনে হত্যা করা হতো। আমি দেখেছি একটি পুলের ক্ষতি করা হলে তার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কীভাবে সমস্ত গ্রাম ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

আমি স্থানীয় সামরিক আইন প্রশাসকের হাতে বিশ্বাসকর আকস্মিকভাবে সঙ্গে একটি পেশিলের খোঁচায় সৃত্বাদও দিতে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আরেকজন হতভাগাকে চিহ্নিত করতে দেখেছি। রাষ্ট্রে সেনাবাহিনীর মেসে তথাকথিত ইজ্জতশালী বাক্সিদের, যারা সবাই ছিল ভাল লোক। দিনের বেলায় যে হত্যায়জ্ঞ তারা চালিয়েছে সে সম্পর্কে নথি প্রতিযোগিতার আলাপ করতে শুনেছি। আমি ১৯৭১ সালের ১৩ জুন সংব্যা 'সানডে টাইমস' পত্রিকায় এ সমস্ত খবর পাঠিয়েছি। তখন থেকেই গণহত্যার বিবরণ আরো অধিক বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে।

সারা বিশ্ব জানে যে, কেন বাংলাদেশের আশি লাখ পুরুষ, নারী ও শিশু সীমান্ত পার হয়ে ভারতে পালিয়েছে? কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ লোক গরেছে? কেন আরো অসংখ্য লোক এখন দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধির কারণে সম্ভাব্য মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছে?

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা অভিযানে পূর্ব বাংলার হাজার হাজার নিরস্ত্র বাঙালী পুরুষ, নারী ও শিশুর উপর অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার কথা ও সাধারণভাবে সকলের জানা হয়ে গেছে। কিন্তু একথা আমরা জানি যে, বাঙালীদের হত্যা, বলাত্কার এবং নারী ও শিশুদের বিকলাঙ্গকরণের মত ভয়াবহ কাজগুলো বৌধগম্য কর্পেই বাংলাদেশের যারা সংবেদনশীল গ্রানুষ, তাদের বিত্রিত করেছে। বাঙালীরা জীবনে এমন সত্যকে স্থাপন করেছে, যাকে অবহেলা করা যায় না, এই সত্য হলো বাংলাদেশের মুক্তি।

প্রতিটি হত্যার পোস্টমোর্টেম করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমি একটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া প্রয়োজন মনে করি, যা আমার জীবনের মোড় ঘূরিয়ে দিয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছিল এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে কুমিল্লায়। আমাকে সার্কিট হাউসের সবচেয়ে উপর তলার একটি অতিথি কামরায় থাকতে দেয়া হয়। সেখানে সামরিক আইন প্রশাসকের দণ্ডন ছিল। ১৯ এপ্রিলের ভোরে আমি এই মূল্যবান লোকটিকে কুমিল্লা জেলে আটক তিনজন হিন্দু ও একজন খৃষ্টান ‘চোর’কে আকস্মিকভাবে মৃত্যুদণ্ড দিতে দেখেছি। জানা যায় যে চোরটিকে এক হিন্দুর বাড়ি থেকে তার মালিককে দেয়ার জন্য একটি থলে নিয়ে যাওয়ার সময় হাতেনাতে ছেফতার করা হয়। বাড়ির মালিক শহরের অপর প্রান্তে লুকিয়ে ছিল। পেপিল দিয়ে চারবার দাগ কেটে সে রাতেই ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই লোকগুলোকে নিয়ে আসার জন্য একজন বিহারী দারোগাকে আদেশ দেয়া হলো। আমরা তখন গ্রাশ ভর্তি নারকেল দুধ খাচ্ছিলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় আমি জানতে পারলাম ‘ব্যবস্থা গ্রহণ’ কাকে বলে।

বিকেল খটায় সান্ধ্য আইন জারীর কিছুক্ষণ আগে একটি দড়ি দিয়ে শিথিলভাবে বেঁধে সেই খৃষ্টান ও তার তিন সঙ্গীকে রাস্তার উপর দিয়ে ইঁটিয়ে সার্কিট হাউসের আঙ্গিনায় আনা হলো। কয়েক মিনিট পর আমি তীব্র আর্তনাদ ও হাড়মাংসের উপর লাঠির সাহায্যে কিঞ্চ আঘাতের শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর আর্তনাদ বন্ধ হলো। যেন সুইচ টিপে তা’বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমার যন্ত্রণাজড়িত কানে আশি শুনতে পেলাম সেই নীরবতা সহসা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ আওয়াজে পরিণত হলো। সেই আওয়াজ লাখ লাখ বার প্রতিখনিত হয়েছে এবং তা এখনও আমার কানে আঘাত করছে।

অন্ধকার কামরায় আমি তখন তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলাম। আধঘন্টা

পরে আমি শনতে পেলাম জোয়ানরা হৈ চৈ করে তাদের রাতের খাবার থাচ্ছে। ব্যালকনির উপর তাকাতে আমার সাহস হলো না, কেননা সে রাতে মানুষকে দেখার কথা আমার মনেই হয়নি। তখন মন আলোকে পলায়নরত শিয়ালেরা এলো, বড় বড় কৃৎসিত বাঁদুড়কে শুক্রবার রাতের ভয়ংকর ছায়া ছবির রক্ত শোষক পিশাচের গত দেখাচ্ছিল, তারা ধীরে ধীরে সাকিট হাউসের পার্শ্বস্থ বিলের (স্কুল ক্লিম্বিং) উপর দিয়ে উড়ে গেল এবং ডানদিকে ঘুরে সন্নিকটস্থ আঘগাছে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য ফিরে এলো। আমার মন জানত যে রাতের এই ফলভূক প্রাণীগুলোকে রক্ত শোষক পিশাচ ও মত দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তারা তা ছিল না। প্রকৃত রক্ত শোষক পিশাচ ও দানবের দল তখন সাকিট হাউসের অপর পার্শ্বে ছিল। এরা পাকিস্তানের বর্বরতম সেনাবাহিনী। আমাকে পালাতে হ'লো।

এই হলো ‘রেইপ অব বাংলাদেশ’ এর বাস্তব ছবি। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যত অপপ্রচারই চালান হোক না কেন, তা’ এইসব যথার্থ তথ্যকে গোপন রাখতে পারে না। বাংলাদেশ লাঙ্ঘিতা থেকে উত্তৃত।

## গোয়েবলসের পুনরাবৰ্ত্তী

'...পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ হলেন গণহত্যার নীরব দর্শক.....।'

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ

১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

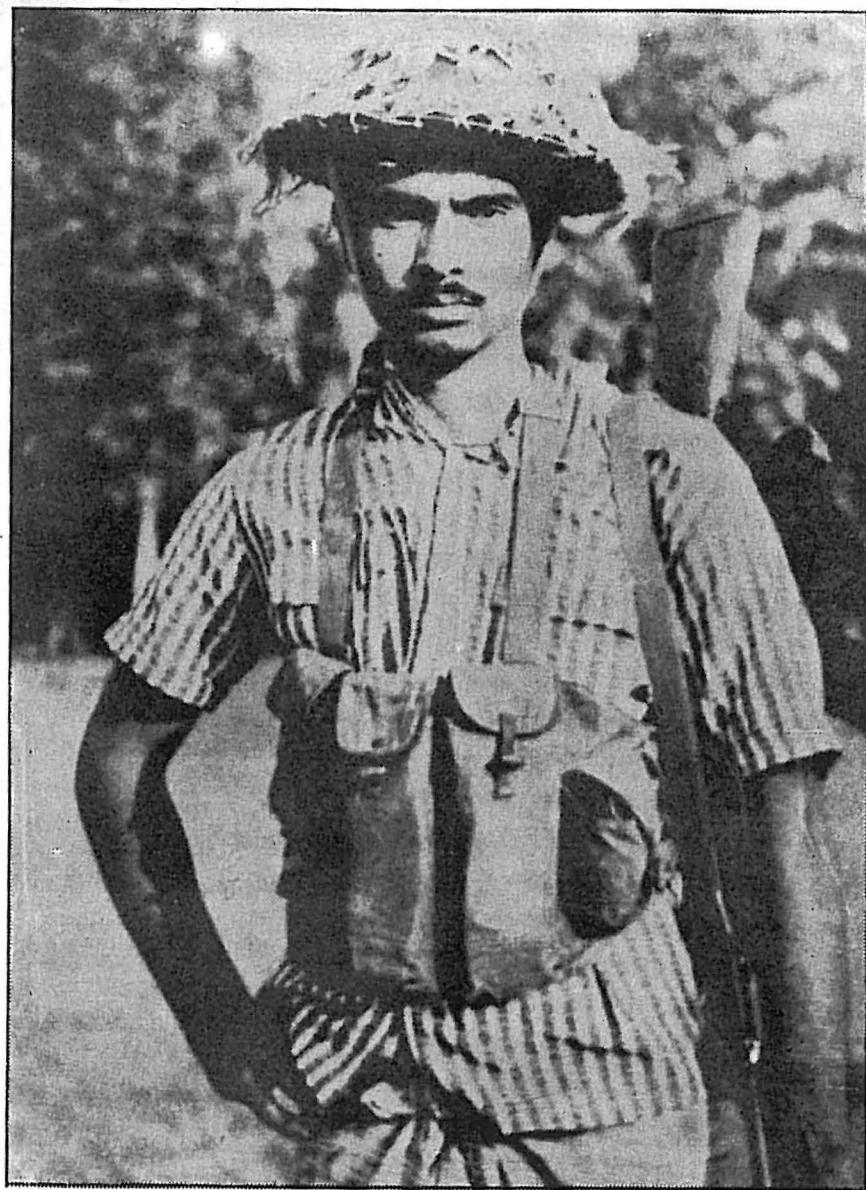
কোন পাকিস্তানী কোন বাঙালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে না, কিংবা কোন বিদেশী তা' করতে গেলে তাকে অভিযোগের মুখোযুথি হতে হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন একুপ উক্তি করেছিলেন। কেউ কি এই অপরিহার্য প্রশ্ন উত্থাপন করেছে অথবা আপনারা জানেন কি, এসব কি ঘটেছে? ১৯৭১ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ের আগে ঐ ধরনের অভিজ্ঞতা আমারও হয়েছে। শুধু আমারই বলি কেন, এ ধরনের অভিজ্ঞতা পশ্চিম পাকিস্তানী আরো ক'জনেরও হয়েছে। এন্দের মধ্যে বেশ ক'জন উচ্চদরের রাজনীতিবিদ রয়েছেন, যারা ২৫শে মার্চের রাতে পূর্ব বাংলায় সামরিক বর্বরতম অত্যাচার সংঘটনের পর বিদেশে গিয়েছেন তাদের সকলকেই ঐ নারকীয় ঘটনার জন্য প্রশ্নের মুখোযুথি হতে হয়েছে।

তাঁরা হয় নেতৃবাচক কিংবা ইতিবাচক উত্তর দিয়ে থাকবেন। কিন্তু একে পুরোপুরি আপাত বিরোধী সত্য বলা চলে না। পাকিস্তানে এসব ঘটনা এভাবেই ঘটেছে। এ বিষয়ে প্রচারণার জন্য যে উন্নাবনী ও কল্পনাপ্রবণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে—তার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ। এ জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে প্রোগ্রামভা বিভাগ বলা যেতে পারে।

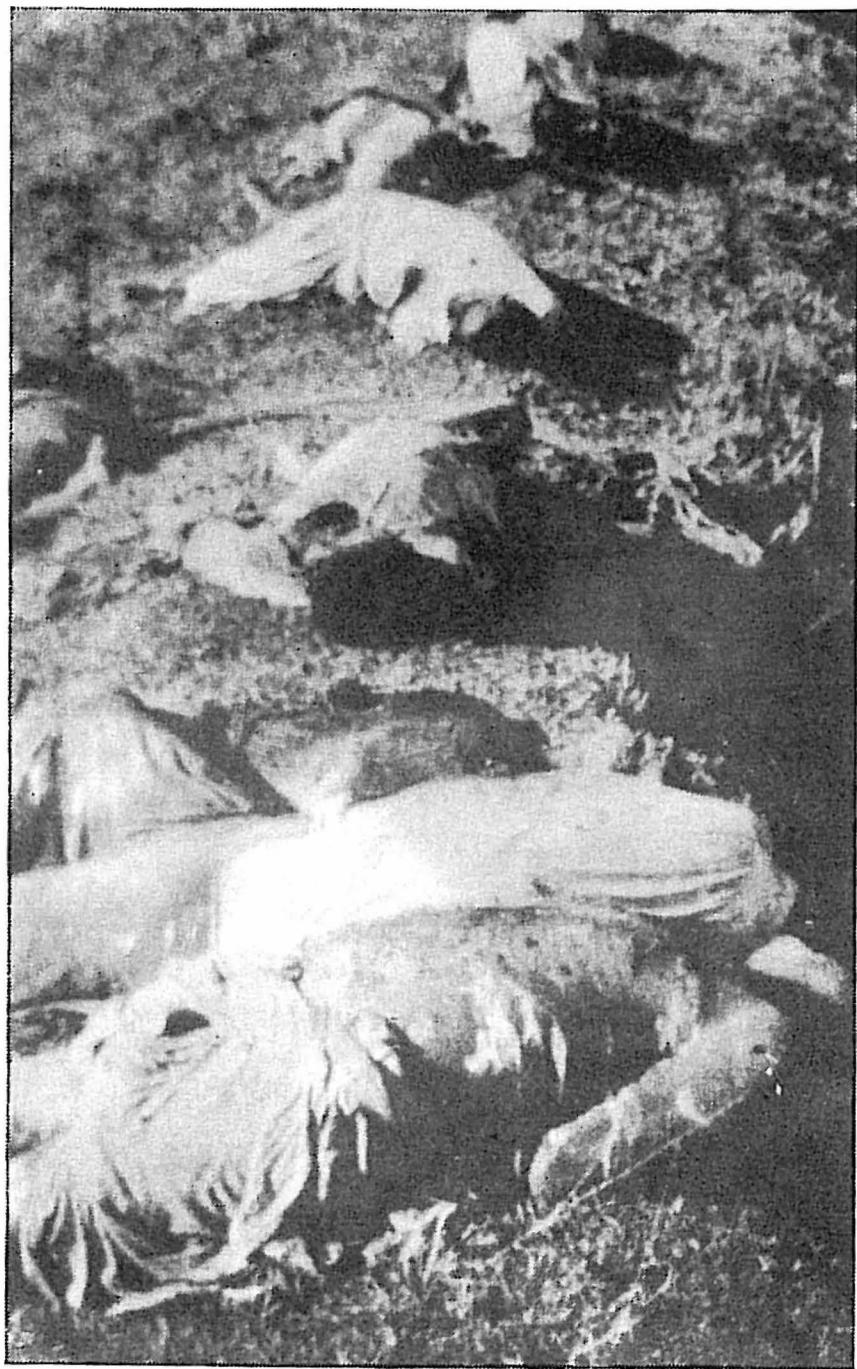
এসব প্রশ্নের উত্তর নেতৃবাচক বলা যায়, তার কারণ, ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের আগে পর্যন্ত পূর্ব বাঙালায় কি ঘটেছে সে সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব এলাকার নারকীয় ঘটনার কোন কিছুই জানতে পারেনি। ২৫ মার্চ সামরিক কর্তৃপক্ষ সংবাদের উপর কড়া সেসর জারী করেছিল। ২৫ মার্চ থেকে জুলাই মাসের শেষের দিকে যথারীতি সেসর তুলে নেওয়া হয়। এই সময়ে পূর্ব বাংলায় প্রকাশিত বাঙ্গলা পত্রপত্রিকাগুলোসহ পাকিস্তানের কোন সংবাদপত্রই পূর্ব বাঙালায় সামরিক বর্বরতার কোন খবরতো দূরের কথা, ঘটনার সঙ্গে সামান্য সত্তাতা আছে এমন খবরও প্রকাশ

করেনি। সরকারের নির্দেশও ছিল সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে ঐরূপ। ঘটনার প্রথম দুমাসে মাসের শেষের দিকে সংবাদপত্রে যে সব খবর প্রকাশিত হতো, তা খুব সতর্কতার সঙ্গে কাটছাট করে সামরিক কর্মকর্তা ও বেসামরিক তথ্য অফিসাররা সে সবের ইন্তেহার তৈরী করে দিতেন। পত্রিকাগুলো পূর্বপাকিস্তানে শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের পরে দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসার উপর জোর দিয়েছিল। এবং প্রচার করতো যে, 'ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী' এবং সংঘবদ্ধ দৃঢ়তিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী অভিযান চালাচ্ছেন। শেষোক্ত সংবাদগুলো সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি লাইন পড়লেও দেশে কি ঘটছে তার প্রকৃত চিত্রের কোন বিস্মৃতি চিহ্ন খুঁজে পাওয়া ছিল অসম্ভব। সে সব সংবাদে ঢাকা ও চট্টগ্রামে নারকীয়া সামরিক অভিযানে তখন পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার হত্যার লেশমাত্র উল্লেখ থাকতো না। কিংবা সংবাদ মাধ্যমে এই কথার উল্লেখ থাকতো না যে, শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ দুটি স্থানে কর্তৃত্ব বজায় রাখা ছাড়া প্রদেশের বাকী অংশ বাঙালীদের প্রতিরোধের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পাকিস্তানীরা জানতো না যে, পাকিস্তান বিমানবাহিনী বাঙালী প্রতিরোধ সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে থ্যাহ নিয়মিত বিমান আক্রমণ চালাচ্ছে। কিংবা তারা একথা জানত না যে, ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী আনসার ও মুজাহিদের মত পূর্ব বাঙালীর যাবতীয় সামরিক ইউনিটে বিদ্রোহ করেছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে সংঘামে লিঙ্গ রয়েছে। পূর্ব বাঙালী থেকে যারা শরণার্থী হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়েছে তারা তাদেরকে বাঙালীদের নৃশংসতার কাহিনী শুনিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে নারকীয়া গণহত্যা চালাচ্ছে তার কোন সংবাদই তারা দেয়নি। এমন কি সংবাদপত্রেও তারা দেয়নি। এমন কি সংবাদপত্রে ভাল জানানো সাংবাদিক ছাড়া প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে বিশ্বস্তার সঙ্গে কিছু বলা ও হয়নি। আমাদেরকে উচ্চ পদস্থ বেসামরিক কর্মকর্তা ও আন্তঃবাহিনী গণসংযোগ কর্মকর্তা শুধু কিছু ব্যবস্থা করিপায় বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দলের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছে—এতটুকু বলা হয়েছে, এছাড়া বাস্তব ঘটনার কোন সূত্রের আর কোন তথ্য দেয়া হয়নি।

সুচতুরভাবে ইন্তেহারগুলো জালিয়াতি করে সরকারী মালিকানাধীন রেডিও ও টেলিভিশনে ঐ সব সংবাদ প্রচার করা হয়েছে। টেলিভিশনে যে সব জনপ্রিয় প্রোগ্রাম থাকতো তার সঙ্গে দেখানো হতো দেশের কোথাও কিছু ঘটেনি। সংবাদ প্রচার করা হতো ও দেখানো হতো পূর্ব বাঙালীর শহরগুলোতে সবাদিক থেকে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। অবশ্য বিদেশী সংবাদ মাধ্যম বিশেষতঃ বিবিসি, আকাশবাণী এবং রেডিও অস্ট্রেলিয়া থেকে বিপরীত সংবাদই প্রচারিত হতো। উন্তেজনাকর এসব



ଏକଜନ ମୁଣ୍ଡଯୋଦୀ



পাক বাহিনীর হত্যা কান্ডের দৃশ্যাবলী



পাক হানাদার বাহিনীর বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত দালান কোঠা

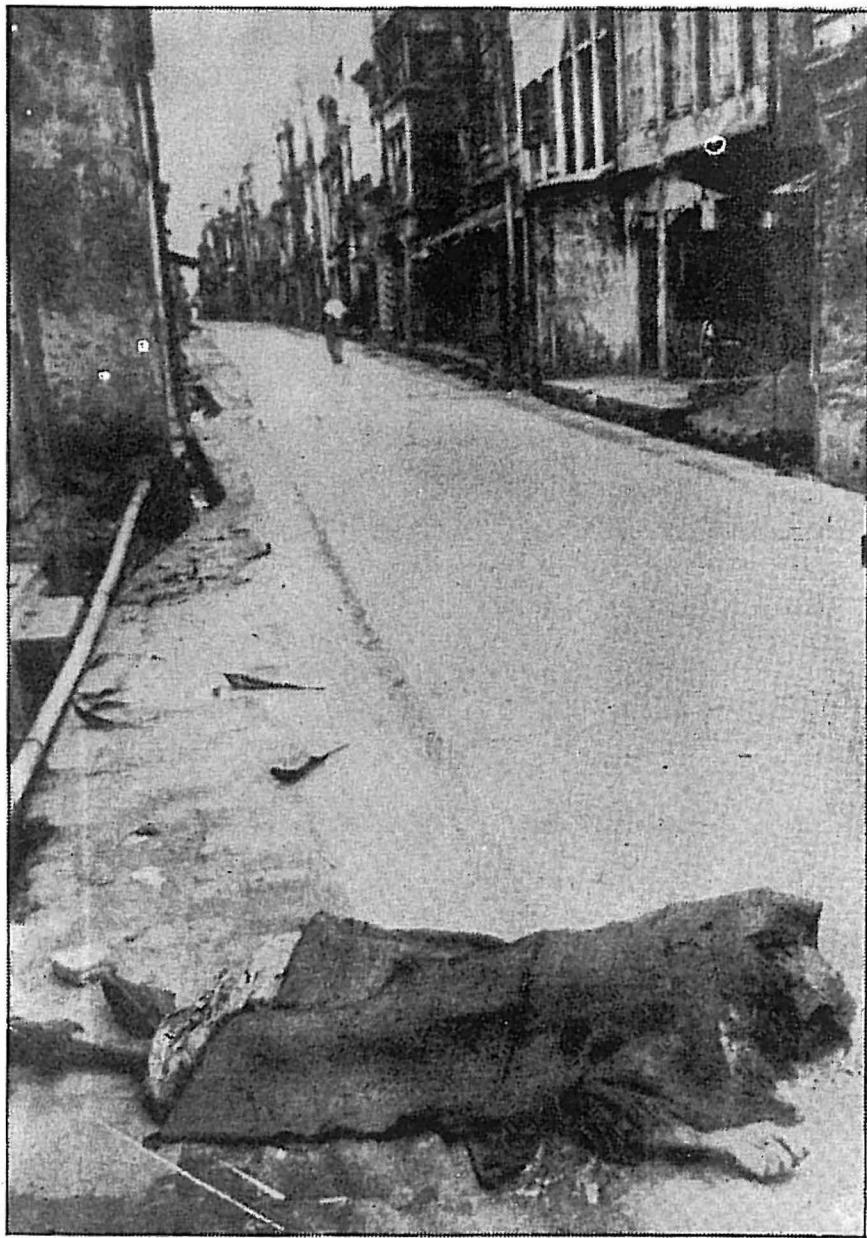




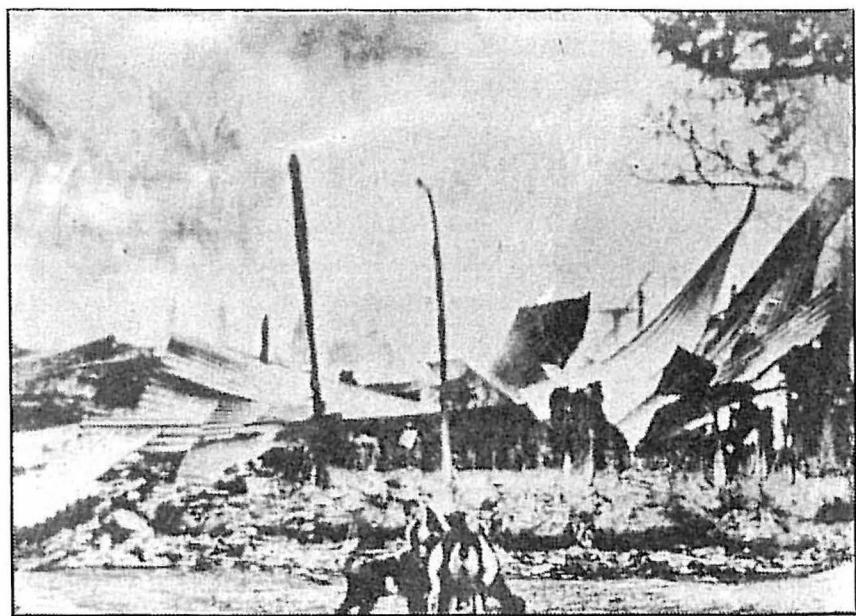
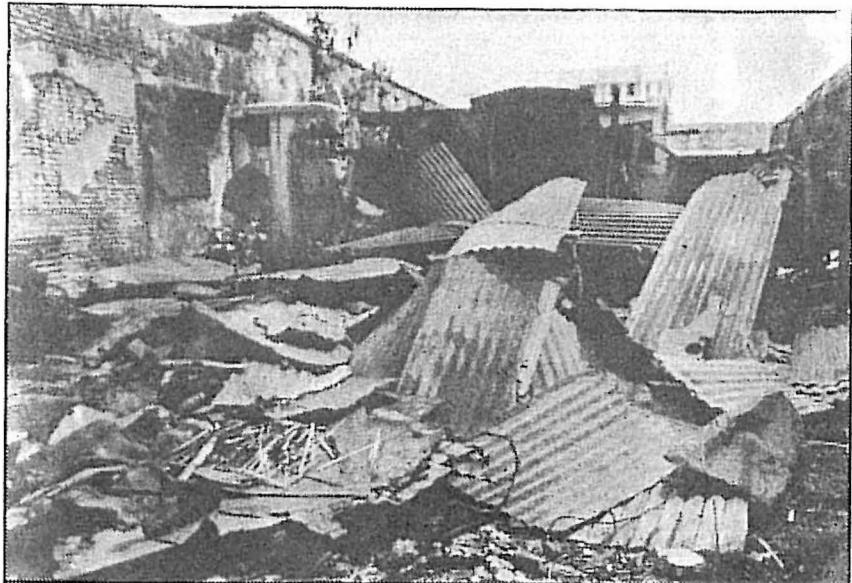
'୭୧-ଏଇ ଗପହତ୍ତା



ইয়াহিয়ার মাড়ের চোখ



৯ মাস যুক্তের সময় শোখারীবাজার এলাকার নিত্য দিনের দৃশ্য



পাক হানাদার বাহিনীর ধ্বংস লীলা

সংবাদ গভীর মনোযোগ দিয়েই বাঙালীরা শুনতো এবং আনন্দ পেত। পক্ষান্তরে পাকিস্তানী প্রচার সাধ্যমে বিদেশী বেতার কেন্দ্রগুলো যে সমস্ত সংবাদ প্রচার করত সেসব ভারত কর্তৃক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপথচার এবং অসত্য সংবাদ হিসাবে প্রত্যাখ্যাত হতো। সরকারী ইন্টেহারণগুলোতে এসব সংবাদের উপর বেশ জোর দেয়া হয়েছিল এবং এক সময় করাটী, লাহোর রাওয়ালপিণ্ডির সংবাদপত্রগুলোতে প্রচারিত সংবাদের ব্যাখ্যা ছাপা হতো কিন্তু কখনো ভুল সংবাদটি কি ছিল, তা ছাপা হতো না।

পাকিস্তানীরা গভীরভাবে দেশপ্রেমিক, তারা এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করতে পারে না যে তাদের সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবে এতবেশী ভুল সংবাদ পরিবেশন করতে পারে।

সরকারের এসব করতে কোন অসুবিধা হয়নি। তবে একটা জিনিস সব সময় দেশের মধ্যে বজায় ছিল তা হলো শক্তিশালী ভারতবিরোধী প্রবণতা। পাকিস্তানের জন্য হয়েছে এই উপমহাদেশের 'হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র আবাসভূমি'র জন্য মুসলমানদের বিদ্রোহের কারণে। এই হিন্দু বিদ্রে মনোভাব বছরের পর বছর লালিত হয়ে এসেছে। ১৯৬৫ সালের প্রাক ভারত যুদ্ধের পর তীব্রতা আরো বেড়েছে। আর একটি বিষয় হলো, সে সময় পূর্ব বাঙালীয় যা কিছু ঘটেছে সে সমক্ষে আকাশবাণীর সাহসী প্রতিবেদন সম্প্রচারে পাকিস্তানীদের মনে সন্দেহের উদ্বেক করে। এহেন পরিস্থিতিতে, ভারতবিরোধী সম্প্রচার তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সহজ হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে একটা আতঙ্কের ধারণা সৃষ্টি করা হলো যে, তারা আবার ভারতীয় আক্রমণের শিকার হতে যাচ্ছে।

সরকারের এই প্রচেষ্টা আরো জোরদার হলো, যখন জানা গেল যে, ইতিয়া ইনষ্টিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ বলেছে যে, ভারত আবার শতাব্দীর সুযোগ পেয়েছে যা থেকে উপ-মহাদেশের ভাগভাগিকে বানচাল করতে পারবে।

এই মর্মে একটি সংবাদ পাকিস্তানের পত্র-পত্রিকায় প্রধান শিরোনাম হল এবং রেডিও পাকিস্তানে বারবার সম্প্রচারিত হতে লাগলো। এই স্বাভাবিক ধারণার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করা হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলনের পেছনে ভারতের অনুপ্রেরণা রয়েছে। তা'ছাড়া ভারত অব্দি ভারতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাকিস্তান আক্রমণের পর্যায়ে পৌছেছে। এভাবে ইতিয়া ইনষ্টিউট অব স্ট্র্যাটেজিক এর পরিচালকের ছেলেমানুষী যুৱক উক্তি ভারতের কোন উদ্দেশ্যকেই সফল করেনি বরং পাকিস্তানী সরকারী প্রোপাগান্ডাকারীদের জন্য বেহেস্ত থেকে প্রেরিত সুযোগ হিসেবে কাজে লেগেছে।

সরকারী নির্দেশে এই খবর বিভিন্নভাবে কয়েকদিন ধরে রেডিও টেলিভিশন ও সংবাদপত্রগুলোয় প্রচার ও প্রকাশিত হতে থাকে। সে সঙ্গে পত্র-পত্রিকায় নেতৃবৃন্দের

গভীর চিন্তা প্রসূত এ প্রতিক্রিয়া ছাপা হয় এবং ঘৃণামিশ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রচার পেতে থাকে। এ সংবাদ দু'সঙ্গাহ ধরে প্রচার লাভ করে। এই দু'সঙ্গাহের মধ্যে পঞ্চিম পাকিস্তানীদের প্রায় সকলের মনেই এই বিশ্বাস বেশ দানা বেঁধেছে যে, 'ভারত ধর্মসাহার কাজে লিঙ্গ হয়েছে এবং একটি বিশেষ পত্রিকাসমূহ সকল পত্রিকাগুলোতে এই মর্মে উপদেশ দেয়া হল, দেশের এই নতুন জটিল সমস্যা সংকুল সময়ে প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিক-এর কর্তব্য সরকারকে সাহায্য করা।

একথা অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন, তখন পঞ্চিম পাকিস্তানীরা দুনিয়ার বাকি অংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কড়া সেসরশীপের জন্য পরিকল্পনা করে বিরুদ্ধ সংবাদ বহনকারী কোন বিদেশী সংবাদপত্র ও সাময়িকী দেশের ভেতরে আসতে দেয়া হত না। এ ধরনের পত্র পত্রিকায় যদি পূর্ব বাঙ্গলার ঘটনাবলীর সামান্য উল্লেখও থাকত, তাহলে তার প্রচার বক্ষ করে দেয়া হত। ঐ সব পত্র পত্রিকা পুড়িয়ে ফেলা হত। এ ব্যাপারে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমন সুশৃঙ্খল ছিল যে, যে সমস্ত যাত্রী, তারা পাকিস্তানীই হোক কিংবা বিদেশী হোক দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে শুক্র বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাদের সবাইকে তান্ত তান্ত করে পরীক্ষা করে দেখতেন। এসব যাত্রীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় পূর্ব বাংলার ঘটনার সামান্যতম উল্লেখ কোন সংবাদ পত্রে থাকলে তা বাজেয়াও করা হত।

পাকিস্তানের জনসাধারণের চোখ ও কান বিদেশী প্রভাবের বাইরে রাখতে সক্ষম হলে সরকার একটি উদ্ভাবনক্ষম প্রচারণা অভিযান শুরু করে। পূর্ব বাংলার প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে এবং ভারতের 'আসন্ন ইয়েকিকে সবচেয়ে বড় করে চতুর্ভুণ পর্যায়ে প্রচারণা প্রতিদিন চালানো হল। গোয়েবলসও এ কাজ এতটা দক্ষতার সঙ্গে করতে পারত না।

এপ্রিলের মাঝামাঝি কয়েকজন সহকর্মী সাংবাদিকসহ আমি যখন পূর্ব বাংলায় যাই তখন আমাদের নির্দেশ দেয়া হলো যে সেনাবাহিনীর কার্যকলাপকে বড় করে দেখাতে হবে এবং সব জায়গায় স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে এটা প্রচারে প্রাধান্য দিতে হবে। আমাদের আরো বলা হল যে, 'ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের কীর্তিকলাপ আমাদের দেখানো হবে। সে সময়ের সেনাবাহিনীর লোকেরা সবকিছু ছিমছাম করে ফেলেছে। কিন্তু বিশ্বস্ত রাস্তাগুলো ভরাট করতে কিংবা গোলাগুলির ধ্রংসের চিহ্নগুলো মুছে ফেলতে পারেনি। তবে আমরা যেসব বাঙালী বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত তাদের মুখ আটকে রাখতে পারেনি। সে কারণে ঢাকা সফর আমাদের জন্য সেই হৃদয়বিদ্রোহক ঘটনার উপলক্ষিতে চোখ খুলে দিল। আমরা এক সহকর্মী আমাদের দুদিন আগে ঢাকায় এসেছিল—সে ফিস ফিস করে আমাকে বলেছে, তারা হিন্দুদেরকে গণহত্যা করেছে আর বাঙালী বুদ্ধিজীবীদেরকে নির্মূল করেছে। তথাপি এই সাংবাদিক

যিনি একটা সংবাদ সংস্থার নামী সংবাদদাতা হয়েও করাচীতে ঘটনার উল্টো প্রতিবেদনই পাঠাতেন। রেডিও সংবাদদাতা এবং টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান ঐ একই কাজ করতেন।

এই ক্যামেরাম্যানদের মধ্যে এক তরুণ দেশপ্রেমিক যে আমার সঙ্গে কুমিল্লা সফরসঙ্গী হয়েছিল সে প্রচারণায় অনেক নিপুণ ছিল। সে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করতে পারতো। সে সেনাবাহিনীর প্রোপাগান্ডাকেও হার মানিয়েছিল। তার কাজই ছিল দেশের সবকিছু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে এই প্রমাণ করা। তার সঙ্গে কুমিল্লার অদূরে এক ছোট শহর লাকসাম সফরে যাই। শান্ত একদিন আগে সেনাবাহিনী শহরটিকে মুক্ত করেছে অথচ আমার কাছে পূর্ব বাংলার অন্যান্য শহরগুলোর মত এটাকেও একটা ভূতভাবে শহরের মতই মনে হয়। লাকসাম একটা গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন। এর কাজকর্ম ও ব্যস্ততা দেখানোর কাজে বকুটি লেগে গেল যদিও কোন রেলগাড়ি বাস্তবে চলাচল করছিল না। আমার ঐ ক্যামেরাম্যান বকুটি সেনাবাহিনীর সহায়তায় দুটি বগীওয়ালা রেলগাড়ি টেশনের বাইরে টেনে নিয়ে গেলেন এবং ঘটনাটি রেকর্ড করলেন। ঠিক একইভাবে “শান্তি কমিটির লোকজনের সাহায্যে তিনি এক বিরাট গণজয়মায়েত দেখালেন। আমরা যখন সেখানে পৌছলাম সেখানে এ ধরনের কোন জয়ায়েতের অন্তিম ছিল না। সে অঞ্চলের শুরু অভিযানের ভারপ্রাপ্ত মেজর কিন্তু যাদু জানতেন। একজন পুরানো ও অনুগত মুসলিম লীগ অনুসারী বৃক্ষকে লোক জয়ায়েত করতে বলা হলো। লোকটি সেনাবাহিনীর কাজে লাগতে পেরেছে বলে হাজার শোকর জানাতে লাগলো। সে বললো, এক খেকে দু’শ লোক জয়ায়েত করতে তার তিন চার ঘন্টা লাগবে। মেজর তাকে আধষ্টন্ত সময় দিলেন এবং সঙ্গে একজন জোয়ান পাঠিয়ে এর সাফল্যের সহায়তা করলেন। নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচমিনিট পরই অদূরে জনকলরব শোনা গেল। কিছুক্ষণ পরে বিভিন্ন পোশাক পরিহিত আবালবৃক্ষের একটি দল পাকিস্তানী পতাকা উড়িয়ে দেশাভিবোধক শ্বেগান দিতে দিতে এগিয়ে আসে। শান্তি কমিটির লোকগুলো এসে উপস্থিত হলো। এখানে বড়জোর পঞ্চাশজন আবাল বৃক্ষ উপস্থিত হয়ে থাকবে। ঐ টেলিভিশন ক্যামেরাম্যান খুব দক্ষতার সঙ্গে তার ক্যামেরা চালাতে পারতো কাজেই সে একটা খানার সামনে লোকগুলোকে জড়ো করলো এবং একটি বিরাট জনসভার ছবি তুললো। তারপর একটা সংকীর্ণ পথ খুঁজে বের করল। ঐ পথে লোকগুলোকে কয়েকবার আসা যাওয়া করিয়ে দক্ষতার সঙ্গে তার ক্যামেরাকে বিভিন্ন ভঙ্গীতে কাত করিয়ে ঘিছিলের ছবি তুলল। চারদিন পর করাচী টেলিভিশনে লাকসামে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে দেখানো হলো এবং এভাবেই চাঁদপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেটের অবস্থা একই পদ্ধতির অনুসরণে দেখানো হলো। চট্টগ্রাম ছাড়া অন্য শহরগুলো ছিল

পুরোপুরি ভৃত্যড়ে শহর। কেননা ওসব শহরের লোকগুলো গ্রামে-গ্রামে পালিয়ে রয়েছে। কিংবা সীমানা পার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।

এর পরবর্তী সঞ্চারগুলোতে পঞ্চিম পাকিস্তানী সাংবাদিকদের শাসকচক্র সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করে পূর্ব বাংলার অবস্থার অনুরূপ প্রতিবেদনের জন্য সফরে পাঠালেন। বাঙালী সাংবাদিকদের নেওয়া হতো না, কেননা তারা নির্ভরযোগ্য নন। এমনকি পঞ্চিম পাকিস্তানের পত্রিকায় সিনিয়র বাঙালী সাংবাদিকদেরকেও কাজ করতে দেয়া হতো না। আমাকে বলা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগ সাফল্যের সঙ্গে এন্দের মগজ খোলাই করে দিয়েছে। এজন্য এন্দের কোন সরকারী কাজে লাগানো যাবে না। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও বিচার-বুদ্ধি বৃত্তিকে এমন অপদস্থ হতে আমি আর কখনো দেখিনি।

সংবাদপত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ কোন নতুন ঘটনা নয়। ১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসনভার অধিক্ষেপণের পর থেকে সংবাদপত্রগুলো তথ্য মন্ত্রণালয়ের সম্প্রসারিত অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের একমাত্র নিরপেক্ষ দৈনিক পাকিস্তান টাইমস' সরকার দখল করে নিলে ইচ্ছা প্রণোদিতভাবেই এর অবলুপ্তি ঘটান হয়। অন্যান্য পত্রিকাগুলোতে কোন অসুবিধা ছিল না। অধিকাংশ সংবাদপত্রের মালিকানা ব্যবসা টিকিয়ে রাখার জন্যাই হোক বা অন্য যেসব ব্যবসা শুরু করেছেন সে সবের সাফল্যের জন্য সরকারের সুরে সুর মিলানোকে সুবিধাজনক মনে করলেন। সরকারের শীর্ষপদের সামান্যতম সমালোচনা কিংবা অসম্মানজনক সমালোচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কোপানলে পড়তে হতো। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌছালো যে প্রচারণা কাজে সম্পাদকবৃন্দ তথ্য মন্ত্রণালয়ের অভিপ্রেত প্রচার মাত্রাকেও অতিক্রম করলেন।

জাতীয় দৈনিক পত্রিকা চালাতেন এমন একজন সম্পাদকের কথা আমি হ্বহ মনে করতে পারছি, তিনি দু'টি রেজিষ্টার তাঁর দফতরে রাখতেন। একটি রেজিষ্টারে তিনি সরকার সমর্থক প্রতিবেদনগুলো তালিকাভুক্ত করতেন, আর অন্যটিতে ছিল বিরোধী দলের নেতাদের অসম্মানজনক প্রতিবেদন। ভূট্টো সাহেব ছিলেন দুই নম্বর তালিকার অস্তর্ভুক্ত। আমার ঐ বস্তুটি ঐ তালিকার খালি জায়গায় ধারাবাহিকভাবে ভূট্টো বিরোধী কাহিনীগুলো লিখে রাখতেন। এই রেজিষ্টারের মাসিক প্রতিবেদনগুলো লিপিবদ্ধ করে প্রেসট্রাই-এর চেয়ারম্যানের অবগতির জন্য পাঠাতেন। তিনি দৈনিক সরকার সমর্থিত কাহিনীগুলো চয়ন করে সংবাদকারে সম্পাদকের শুভেচ্ছাসহ যথাযথ সরকারী কর্তৃচারীর নিকট পাঠাতেন। নির্বাচন যখন আরেকবার ভূট্টোকে ক্ষমতাসীন করলো, তখন ঐ ভদ্রলোকটি যিনি এখন সরকার নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশনের একজন খ্যাতনামা রাজনৈতিক ভাষ্যকার, তার রেজিষ্টার ও মাসিক রিপোর্টগুলো উদ্ধার করতে কি কঠোর শ্রমই না করেছেন।

আওয়ামী লীগ তার নিজস্ব পথে চলতে থাকায় সরকারের জন্য প্রকৃত চিত্রটা বিকৃত করতে আরো সুযোগ দিল। একদিকে শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনোত্তর পশ্চিম পাকিস্তান শহরে যেতে কঠিনভাবে অস্থীকার করায় সরকার ঘটনাকে পশ্চিম পাকিস্তানবিরোধী ও বিছিন্নতাবাদী বলে শেখ মুজিবকে চিহ্নিত করার সুযোগ পায়। শেখ মুজিব যদি ঐতিহাসিক নির্বাচন বিজয়ের পর পর পশ্চিমাঞ্চলে সফরে যেতেন তাহলে সেখানে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গেই তাকে সংবর্ধনা জানানো হত এবং শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সরকারী প্রচারণার এ সাফল্যকে তিনি খড়ন করতে পারতেন। অপরদিকে মহান আইন অমান্য আদোলনের সময় আওয়ামী লীগ আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগের ফেত্তে নানা বিধিনিয়ে জারি করেন। এতে পূর্ব বাঙ্গলা বাস্তবক্ষেত্রে দেশের অন্য অঞ্চল থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ে। এবং বিছিন্নতাবাদী এই ধারণাটি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পূর্ব বাঙ্গলায় সেনাবাহিনী নারকীয় নৃশংসতার প্রথম ক'মাস এমনকি পশ্চিম পাকিস্তান যখন প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরেছে, তারপরও সরকারী প্রচার মাধ্যম নিপুণভাবে প্রচারকার্য চালিয়ে ছিল যে, যারা দেশকে টুকরো টুকরো করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা ছাড়া সরকারের গত্যত্ব নেই। এবং তারা বিশ্বাস করছে সরকারের যা কিছু করা হচ্ছে সরকার ভারতীয় দালাল ও অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে দেশপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ হয়ে জাতীয় একতা ও সংহতি বজায় রাখার কারণেই করছেন। এক্ষেত্রে জনেকা পাঞ্জাবী মহিলার প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করে বলতে পারি। এ অন্ত মহিলা আমার পরিবারের একজন শুভকাঞ্চনী। তিনি তাঁর পদমর্যাদা ও মানবিক সহমর্মিতার কারণে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। যখন আমি তাঁকে পূর্ব বাঙ্গলায় পাক বাহিনী কি ঘটিয়েছে তা বললাম তিনি মেজাজের সাথে উত্তর দিলেন, ওরা এটা পাওয়ার যোগ্য। তারা যদি স্বাধীনতা চায় তবে সৃত্যুর জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

এমন কি যারা আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তাঁদের প্রতিক্রিয়াও একই ধরনের। কেউ কেউ তো আমাকে ভারতীয় চৱ ও বিশ্বাসঘাতক বলে গালমন্দ করেছে। আমি যখন সানডে টাইমস্-এ এই গণহত্যার কাহিনী লিখলাম তখন তাদের কাছ থেকে অকথ্য, অশ্রাব্য ভাষায় চিঠি পেতে থাকলাম। তবে এটা ঠিক, তারা যেটা বিশ্বাস করতো, তার প্রতি তারা আন্তরিক ছিল। এছাড়া তাদের উপায়ও ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর প্রতিক্রিয়া হলো ভীতিজনক। তাছাড়া বাঙালীদের কথা ছেড়ে দিলেও পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছ থেকে এর চেয়ে ভাল ব্যবহার আর কী করেই বা আশা করি? আমি আবার বলছি গোয়েবলসও অতটা সূচারূপভাবে করতে পারতেন না যতটা পাকিস্তান সরকারের প্রোপাগান্ডাকারীরা করেছে।

তথাপি পশ্চিম পাকিস্তানে এমন লোক এখনও আছেন যারা বাঙালীদের প্রতি

সহানুভূতিশীল কিন্তু আমার সন্দেহ নেই যে, তাঁদের মতামত প্রকাশের কোন উপায় নেই। কেননা সরকারের কাজের সামান্যতম সমালোচনা জাহান্নামের দরজা খুলে দেবে। অর্থাৎ চরম নির্বর্তনমূলক ব্যবস্থাদির মুখ্যমুখি হতে হবে।

এমতাবস্থায়, পশ্চিম পাকিস্তানীরা নৌরবদর্শক হয়েই রইলেন। আমি তাঁদের নৌরবতার কোন যুক্তি খুঁজে পাই না। কিন্তু আমি এটার কারণ উপলব্ধি করি।

## কেন আশি লাখ লোক মারা যাবে?

'চিন্তাতীত অনুপাতের এক মানবীয় দুর্যোগ'

—বার্ণাৰ্ড ব্ৰেইন, এম পি

১৯৭০ সালের নভেম্বর থেকে এপ্রিল '৭১ পর্যন্ত এ ছ'মাসের মধ্যে পূর্ব বাঙলাকে দুটো বড় দুর্যোগের মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রথমটি হলো এ শতাব্দীৰ সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যখন এই দানবীয় ঘূর্ণিষ্ঠাড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাস-এ জনাকীৰ্ণ উপকূলীয় এলাকাগুলো গ্রাস করে এবং অগণিত প্রাণের অকাল মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় দুর্যোগটি মানুষের তৈরী, সামৱিক শাসকচক্র বাজনেতিক সমস্যাকে পঞ্চম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে দিয়ে অবিশ্বাস্য নৃশংস গণহত্যা অভিযান করে সমাধান খুঁজতে এ দুর্যোগের সৃষ্টি করেছে। আশি লাখেরও বেশী ছিন্নমূল বাঙালী দেশ থেকে পালিয়ো ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। আরো বহু সংখ্যক বাঙালী পালাবার পথে রয়েছে। কতলোক নৃশংসতার শিকার হয়েছে তার হিসাবও কখনো জানা যাবে না। হাজার হাজার লোক হারিয়ে গেছে চিৰতৰে, ঠিক যেমনটি গত নভেম্বর '৭০ সালে সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে হারিয়ে গিয়েছিল।

এখন এই দুর্যোগ তৃতীয়বাবের মতা আঘাত হেনেছে।

পূর্ব বাঙলা এখন প্রায় দুর্ভিক্ষের কবলে, ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশকে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ প্রাপ করেছিল এবাবের দুর্ভিক্ষ তার চেয়েও গভীর হ্মকিৱ কাৱণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে তিৰিশ লাখলোক মারা গিয়েছিল। এই দুৰ্ভিক্ষে পরিস্থিতিৰ কাৱণে সৃষ্টি দুর্ভিক্ষ পাকিস্তান ভাৱত উভয় দেশেৰ উপর সুদূৰপূৰ্বামৰী প্ৰভাৱ বিস্তাৱ কৱতে পাৱে। এতে আনুমানিক আশি লাখ লোকেৰ মৃত্যু ঘটবে কিংবা অকৰ্মণ্য হয়ে পড়বে। এটা বাস্তবক্ষেত্ৰে চিন্তাতীত অনুপাতের এক মানবীয় দুর্যোগ। দুর্ভিক্ষ যে বাস্তবে এসে গেছে—নাৰী পুৰুষ শিশুদেৱ শীৰ্ণদেহ দেখলেই তাৰ প্ৰমাণ মিলবে। বিশেষ কৱে যারা ভাৱতে পাড়ি দিয়েছে তাদেৱ অস্থিচৰ্মসাৱ দেহে বেদনাঘন পৱিষ্ঠিতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এসব শৰণার্থীদেৱ প্ৰথম দুটো দল ছিল নিঃশ্ব ও কংগ, তাৰপৰে যারা যাচ্ছিল তাদেৱ মত অতটা শীৰ্ণ ছিল না। পূর্ব বাঙলায় সামুদ্রিক

জলোচ্ছাস ও গৃহযুদ্ধের (স্বাধীনতাযুদ্ধ) অপরিহার্য পরিণতি স্পষ্টভাবে অনুভূত হতে শুরু করেছে। এই করণ দুর্ভিক্ষাবস্থা পাকিস্তান সরকার মেনে নিতে রাজী হল না। ফলে অনাহারী জনগণের মর্মাত্তিক দুর্দশাকে দ্বিতীয় বাড়িয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে এটা মেনে নেয়ার অর্থ হলো, অপরাধ স্বীকার করাই বোধাবে না বরং পূর্ব বাংলায় চলমান সামরিক বর্ষরতা মেনে নেবার পক্ষে আন্তর্জাতিক মনোযোগ দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। সে কারণে পূর্ব বাংলার লোকদের অবশ্যই মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে। চিরাচরিতভাবে অনুন্নত এলাকায় দুর্ভিক্ষের ছায়া নেমেছে, খাদ্যকে নাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কেন্দ্র যাতে করে ৬.৬ কোটি বাঙালীকে আনুগত্য স্বীকারে বাধা করা যায়। কৃষি উন্নয়নের একজন অবাঙালী অফিসারকে আমি বলতে শুনেছি, 'দুর্ভিক্ষ হলো আমাদের আয়োজিত ধর্মসাধক কাজেরই ফল। কাজেই ওরা অনাহারে মরুক। তখন বাঙালীদের চেতনা ফিরবে।' এই হলো সরকারী কর্মকর্তাদের মনোভাব, সে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খাদ্য ঘাটতির গভীর সংকটাবস্থা। তাতে সরকারী উদাসীনতা ও খাদ্যসংকট আরো জাটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনিতেই পূর্ব বাংলার ২৩টি জেলার মধ্যে ১৭টি জেলায় খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এমনকি শস্যের ফলন ভাল হলেও ১৫ লাখ টন খাদ্যশস্য বিশেষতঃ চাল আমদানি করতে হয়। অদূর অতীতে পূর্ববাংলা একের পর এক বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ায় আমদানীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে ব্যাপক পরিমাণে। পাকা ধানের মৌসুমে ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় মরণ ছোবল হানে। এ দুর্যোগ শুধু খাদ্যশস্যের ব্যাপক ক্ষতি করেনি, সে সঙ্গে জলোচ্ছাসে এসেছে লবণাক্ততা, যা গোটা উপকূলীয় বৃহত্তর অঞ্চলজুড়ে স্বাভাবিক ধান উৎপাদনকে অসম্ভব করে ফেলেছে।

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে রয়েছে চলমান গৃহযুদ্ধ। বিগত মার্চ মাসে সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে বাঙালীর গণঅভ্যর্থনে প্রদেশের সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছে যা কোন ঘূর্ণিঝড়ে অতটা ক্ষতি করতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে অবরুদ্ধ করে রাখার জন্য বাঙালী গেরিলাবাহিনীর সদস্যরা রাস্তা ও ত্রীজি উড়িয়ে দিয়েছে। এই নদী-মাতৃক প্রদেশের অনেকগুলো ফেরী চলাচল নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম সমূদ্র বন্দর থেকে খাদ্যশস্য শতাধিক বিতরণ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত প্রধান সড়কের চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম থেকে ফেরীর কাছ পর্যন্ত এই ৩০ মাইল পথে কম পক্ষে একশ' ধর্মসাধক তৎপরতা চালান হয়েছে। আমদানীকৃত খাদ্যশস্যের ৮০ ভাগ রেলপথে ও ট্রাকে পরিবহন করা হয়। বাকী ১৫ শতাংশ বার্জে নদী পথে বহন করা হয়। এদুটা পরিবহন ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সাপ্লাইয়ের কারণে সে সুযোগ সহজলভ্য নয়। ফলে চট্টগ্রাম বন্দরের সাইলো (খাদ্য সংরক্ষণকেন্দ্র)-গুলোতে খাদ্যশস্য স্তুপীকৃত হয়ে

রয়েছে অথচ প্রদেশের অন্যত্র ঘটতি চরমে উঠেছে। চট্টগ্রাম-কুমিল্লা প্রধান সড়কের অনেক ক্ষেত্রে মেরামত করা হয়েছে, এখনো যে কোন সময়ে গেরিলা আক্রমণের শিকার হতে পারে। বাভাবিক যানবাহনের একটি নগণ্য অংশ চলাচল করছে।

প্রদেশের অন্যত্র একই ধরনের বাধাবিপন্তিও রয়েছে। গত ত্রৈশ্বে একটি আন্তর্জাতিক জরিপ থেকে জানা যায় যে, দেশের ৬০ শতাংশ খাদ্যশস্য দক্ষিণাঞ্চলে গুদামজাত থাকে অথচ ঐ অঞ্চলের প্রয়োজন মাত্র প্রদেশের মোট চাহিদার ৩০ শতাংশ। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় খাদ্য চলাচল ব্যাহত হচ্ছিল বিশেষত পোড়ামাটি নীতি চলতে থাকায় রেল ও নদীপথ ব্যাপক ক্ষতির মুখোয়াখি হয়েছে। এমতাবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জন্য সরবরাহ বজায় রাখাটা সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ ও বেসামরিক প্রশাসনের মুখ্য দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য জিনিসপত্রের চাহিদা মেটানো হত যখন যতটুকু পাওয়া যেতো তাৰ ভিত্তিতে। অবশ্য ভৌতিকভাবে জনসাধারণের চাহিদার ঘাটতি থেকেই গেল।

সেপ্টেম্বর '৭১ সালে আরো দুটো উপসর্গ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজে যোগ দিল। প্রথমটি হলো আউশ চাবের জন্য বীজধান ও কৃষি উপকরণের অভাব। একদিকে প্রশাসন ভেঙে পড়েছে অন্যদিকে কৃষকদের অনীহার জন্য সেগুলো সুলভ ছিল না, তাছাড়া কৃষকেরা নিজেদের মজুত শস্য ফেলে রেখে অন্যত্র চলে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়টি হলো মজুতদারী। উৎপাদনকারীরা ঘাটতি বছরে চিরাচরিত নিয়মে মজুত করে থাকে। বোধগম্য কারণে তারা তাদের খাদ্যশস্য নিশ্চিত রাখতে চায়। এমনকি শহরের পয়সাওয়ালা শ্রেণীও তাই করে থাকে; তারা খাদ্যশস্যের যে কোন মূল্য দিতে রাজি থাকে।

তৃতীয়টি হলো অনাহারী লোকদের ক্রয় ক্ষমতা ক্রমাবয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এসব ক'টি উপসর্গ একত্র হয়ে ১৯৭১ সালের শীতের সময়টা আরো সংকটপূর্ণ সময় হয়ে দাঁড়াবে।

পাবিস্তানের তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাধীনকালে অর্থাৎ ১৯৬৬-১৯৭০ সালের মধ্যে পূর্ব বাঙ্গলা গড়ে প্রতি বছর এক কোটি আশি লক্ষ টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সত্ত্বেও, বার্ষিক, ঘাটতি ছিল ১২ লক্ষ টন। অদ্বৃত্ত অভীতে দুর্যোগগুলো অর্থাৎ ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরের বন্যা, নভেম্বরের ধূংসাঘাক ঘূর্ণিঝড়, ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে সামরিক বাহিনীর ধূংসাঘাক বর্বরতা এসবের সমন্বিত কারণে ১৯৭১ সালের প্রত্যাশিত উৎপাদনের ২০ শতাংশ হ্রাস পায়। পর পর দুটো বছরই খাদ্যোৎপাদনের অবস্থা খারাপ থাকায় খাদ্য ঘাটতির পরিমাণে এসে দাঁড়ায় ২২ লক্ষ ৮০ হাজার টন, অর্থাৎ ২৮ বছর আগে মহা আকালের বছরের পর এই বছরই সবচেয়ে কঠিন খাদ্য ঘাটতি দেখা দিল। এই সবকিছু মিলে অভিযোগ মানবীয় দুর্যোগ সৃষ্টি করলো। কিন্তু পাকিস্তান

সরকার তা শীকার করতে নারাজ। যার ফলে আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলো তাদের তৎপরতা সূচারূপভাবে করতে পারল না।

এহেন পরিস্থিতিতে ত্রাণ সামগ্রী যতটুকু পাওয়া যাবে তাও সৃষ্টি তদারকিতে অভাবে সেটুকু বালিতে পানি ঢালার মতো হারিয়ে যাবে। সেগুলো হয় পাক সেনাবাহিনী বা দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মকর্তা এবং বিবেক বর্জিত ব্যবসায়ীদের কালোবাজারে এ সব খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করে ফায়দা লুটবে।

আন্তর্জাতিক খাদ্য ত্রাণ সংস্থা আশানুরূপ উদ্দেশ্যসাধন করতে চান তাহলে এসবের তত্ত্বাবধানের কাজ আন্তর্জাতিক তদারকিতে হতে হবে, গৃহযুদ্ধে লিঙ্গ দলগুলোকেও তাদের সহযোগিতা করতে হবে। যাতে খাদ্য সামগ্রী পরিবহনে ও বিতরণে কোন বাধা সৃষ্টি না হয়। নতুনা যে কর্তৃণ দুঃখজনক পরিস্থিতির ছবি আঁকা হয়েছে আগত মাস ও বছরের কঠিন সময়ে তা বাস্তবে ঝুপলাভ করবে। এমন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ আগত দিনে পূর্ব বাংলাকে আঘাত হানবে যা অতীতের সকল দুর্যোগকে অতিক্রম করবে।

## পরিশিষ্ট-১

পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল বা যৌথরাষ্ট্র এবং ছয় দফা ফর্মুলার ভিত্তিতে এই ফেডারেশনের বা যৌথরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে পূর্ণ স্বায়ত্ত্বাসন দিতে হবে।

### অর্থম দফা

সরকারের বৈশিষ্ট্য হবে ফেডারেল বা যৌথরাষ্ট্রীয় ও সংসদীয় পক্ষতির; তাতে যৌথরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন হবে প্রত্যক্ষ এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচন জনসংখ্যার ভিত্তিতে হতে হবে।

### দ্বিতীয় দফা

কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় এবং তৃতীয় দফায় ব্যবস্থিত শর্তসাপেক্ষ বিষয়।

### তৃতীয় দফা

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা পারস্পরিকভাবে কিংবা অবাধে উভয় অঞ্চলে বিনিময় করা চলবে। অথবা এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একটি মাত্র মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে এই শর্তে যে, একটি কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যার অধীনে দুই অঞ্চলে দুটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে। তাতে এমন বিধান থাকতে হবে যেন এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ হস্তান্তর কিংবা মূলধন পাচার হতে না পারে।

### চতুর্থ দফা

রাজন্ব ধার্য ও আদায়ের স্ফুরণ থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজন্বের যোগান দেওয়া হবে। সংবিধানে নির্দেশিত বিধানের বলে রাজন্বের এই নির্ধারিত

অংশ স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে জমা হয়ে যাবে। এহেন সাংবিধানিক বিধানে এমন নিশ্চয়তা থাকবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারটি এমন একটি লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে যেন রাজস্বনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে থাকে।

### **পঞ্চম দফা**

মৌখিকাট্টের প্রতিটি অঙ্গরাজ্য যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে, সেই অঙ্গরাজ্যের সরকার যাতে স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে তার পৃথক হিসেব রাখতে পারে, সংবিধানে সেকাপ বিধান থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে, সংবিধান নির্দেশিত বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত অনুপাতের ভিত্তিতে অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে তা আদায় করা হবে। সংবিধানের বিধানানুযায়ী দেশের বৈদেশিক নীতির কাঠামোর মধ্যে, যার দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারগুলোর হাতে থাকতে হবে।

### **ষষ্ঠ দফা**

ফলপ্রসূভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কাজে সাহায্যের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলোকে মিলিশিয়া কিংবা আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে।

## পরিশিষ্ট-২

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় প্রদত্ত 'আমাদের বাচার অধিকার, 'ছয় দফা ফর্মুলা' শীর্ষক ভাষণের উপসংহারে 'আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের' প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের একটি আবেদন :

আমি আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি কথা চলতে চাই :

'প্রথমত, তাঁদের এই ধারণা করা উচিত হবে না যে, আমি (ছয় দফায়) যা বলেছি তা কেবল পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষাথেই বলেছি। এ কথা ঠিক নয়। আমার ছয় দফা কর্মসূচীর প্রতিটি দফা থেকে আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভায়েরাও স্বাভাবিকভাবে অনুরূপ লাভবান হবেন। এই দফাগুলো কার্যকর হলে তাঁরা অবশ্যই সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবেন।

বিত্তীয়ত, যখন আমি পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও কেন্দ্রীয়ভূত হওয়ার কথা বলি, তখন তদ্বারা আমি কেবল আঞ্চলিক কেন্দ্রীয়ভূতকরণের কথাকেই বুঝাই। তদ্বারা আমি একথা বলতে চাই না যে, এই সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের হাতে পৌছেছে। না, তা নয়। আমি তা বলতে চাই না বা বলতে পারি না। আমি জানি, পশ্চিম পাকিস্তানে এঘন লাখ লাখ লোক রয়েছে, যারা আমাদের মতই আর্থিক শোষণের হতভাগ্য শিকারে পরিণত হয়েছে। আমি একথাও জানি যে, দেশের যাবতীয় সম্পদ গুটিকয়েক পরিবারের হাতে কেন্দ্রীয়ভূত হয়েছে। পুঁজিবাদী ছাঁচে গড়া আমাদের সমাজ, এর পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকবে। কিন্তু তার আগে অবশ্যই আঞ্চলিক শোষণের অবসান ঘটাতে হবে। আমি কিন্তু এই আঞ্চলিক শোষণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণকে দায়ী করছি না।

তৃতীয়ত, এই ভবিচারের জন্য দায়ী দেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং অস্বাভাবিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যার পরিণাম দিন দিন ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপিত হত তাহলে এই আঞ্চলিক শোষণ উল্লেভাবে ঘটত। আমাদের রাজস্বের শতকরা ৬২ ভাগ যা আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ব্যয় হচ্ছে, এবং রাজস্বের শতকরা ৩২ ভাগ, যা কেন্দ্রীয় প্রশাসনে ব্যয় হচ্ছে, তা সবই পশ্চিম পাকিস্তানের পরিবর্তে

পূর্ব পাকিস্তানে বায় হত। 'সরকারের ব্যয় হল জনগণের আয় এবং সরকারের আয় হল জনগণের ব্যয়'—জাতীয় অর্থ সম্পর্কে এই সুপরিচিত প্রবাদ বাক্যটি পশ্চিম পাকিস্তানের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের বেলায় প্রযোজ্য হত। আমাদের মেট রাজস্বের এই ৯৪ শতাংশ, যা প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানে বায় হচ্ছে এবং এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের মূলধন গঠিত হচ্ছে, তা পূর্ব পাকিস্তানে বায় হত এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সম্পদশালী করে তুলত। সরকারের কর্মকেন্দ্র পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি প্রধান কার্যালয় এবং সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী শিশুদের দণ্ডন স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতৰাং সেগুলোর যাবতীয় খরচ সেই অঞ্চলেই হচ্ছে। সরকারের কর্মকেন্দ্র পূর্ব পাকিস্তানে থাকলে এ সমস্ত ব্যয় এখানেই হত। তাহলে পূর্ব পাকিস্তান সম্পদশালী হত এবং সেই অনুপাতে পশ্চিম পাকিস্তান দরিদ্র থেকে যেত।

এমতাবস্থায় আপনারা, পশ্চিম পাকিস্তানীরা, আঞ্চলিক ন্যায়বিচারে জন্ম আমাদের মতই দাবী তুলতেন, যার জন্য আপনারা আমাদের, পূর্ব পাকিস্তানীদের অসৎ অভিপ্রায়ের দোষ দিয়ে নিন্দা করছেন। 'অবস্থা এরূপ হলে আপনারা উপলক্ষ করতে পারতেন যে, আগ্রাক্ষণ ছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। সেই প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানীরা যদি আঞ্চলিক ন্যায়বিচারের দাবি তুলতেন তাহলে আপনারা কি জানেন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি হত? আমরা তৎক্ষণাত্ম সত্য বলে স্বীকার করে নিতাম যে, ন্যায়বিচার ও সমতা দাবি করার অধিকার আপনাদের আছে এবং তা করা আপনাদের কর্তব্য।

কেবল তাই নয়, আমরা আরো অগ্রসর হতাম। এসমস্ত দাবি আপনাদের উত্থাপন করা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতাম না। তার পরিবর্তে আপনাদের দাবি উত্থাপন করার আগেই আমরা আপনাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতাম। সত্যই আমরা ন্যায়বিচার, সমতা এবং ন্যায় ব্যবহারে বিশ্বাস করি। একটি রাষ্ট্র একটি বৃহৎ পরিবার ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কি একটি পরিবারের মধ্যে কোন একজন আহার করলেই অন্যের পেট ভরে না। কাজেই আমাদের ন্যায় অংশের দাবি তুললেই কি করে এবং কোন বিবেকের বলে আপনারা আমাদের স্বার্থপর বলে অভিহিত করেন? আর আপনারা যখন কেবল নিজেদের অংশই ভোগ করছেন না, আপনাদের ভাইদের অংশও গ্রাস করছেন, তখন অনোরা আপনাদের কি বলে অভিহিত করবে? যাহোক, আমরা কেবল আমাদের নিজেদের অংশই দাবি করছি, আপনাদের অংশ নয়। আমরা আপনাদের সঙ্গে সমান অংশীদার হিসেবে বাস করতে চাই, শোষক হিসেবে নয়।

চতুর্থত, আমরা যদি আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশী পাই, তাহলে আমাদের অংশ থেকে আপনাদের জন্য কিছু ছেড়ে দিতেও পারি। অতীতে আমরা সেরূপ দিয়েছিও। আপনাদের কি তা, স্মরণ নেই? দয়া করে স্মরণ করে দেখুন :

১। প্রথম গণ-পরিষদে আমাদের প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৪৪ এবং আপনাদের সংখ্যা ছিল ২৮। যদি আমরা ইচ্ছে করতাম, তাহলে গণতান্ত্রিক উপায়েই কেন্দ্রীয় রাজধানী এবং তিনটি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান কার্যালয় পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা করিনি।

২। প্রকৃত ভাত্সুলভ অনুভূতি এবং সমতাবোধের দরজন আমার পূর্ব পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানীদের ভোটে ৬ জন পশ্চিম পাকিস্তানীকে গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করে দিয়েছি।

৩। সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে আমরা বাঙলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করে নিতে পারতাম। কিন্তু আমরা বাঙলা এবং উর্দু উভয় ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছি এবং তা গ্রহণ করেছি।

৪। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের অনুকূলে একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করে নিতে পারতাম।

৫। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগের সম্ভাব্য জটিলতা দূর করার জন্য আমরা আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে বলি দিয়েছি এবং সংখ্যাসাম্য নীতি গ্রহণ করেছি আপনাদের কাছ থেকে এই আশ্চর্ষ পেয়ে যে, আপনারা সকল ক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে চলবেন।

পঞ্চম, পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইদের মনে এই বিশ্বাস জনানোর জন্য উপরোক্ত কথাগুলোই যথেষ্ট যে আমরা, পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা প্রকৃতই ভাত্সুলভ সমতাবোধ নিয়ে আপনাদের প্রতি আচরণ করতে আগ্রহী, যদ্বারা আমরা সম্মান ও গৌরবের মধ্যে বাস করতে চাই। অতীতে একথা ও প্রমাণিত হয়েছে যে, আপনাদের প্রয়োজনে আমাদের নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করার মত সামর্থ্য আমাদের আছে। পূর্ব পাকিস্তানে যদি রাজধানী স্থাপিত হত, তাহলে আমরা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে একটা সত্যিকারের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করতাম এবং এই রাজধানী কেবল তামাশার বস্তু হত না। আমরা কখনো সেই সুবিধাজনক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতাম না এবং জোর করে কখনো সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অফিস আমাদের অধিকারে রাখতাম না। আমরা তুলা বোর্ড, পাকিস্তান শিল্পোন্নয়ন সংস্থা, রেলওয়ে বোর্ড, পোর্ট ট্রাস্ট, উয়াপদা (পানি এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা) ইত্যাদি সংস্থার চেয়ারম্যানের পদের মত পশ্চিম পাকিস্তানের যাবতীয় উচ্চ ও লাভজনক পদ অধিকার করতাম না।

আমরা আপনাদের অঞ্চলের গভর্নরের পদ অধিকার করার কথাও চিন্তা করতাম না। তার পরিবর্তে আমরা ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কেন্দ্রীয় রাজস্ব ব্যয়ের ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম। আমরা আঞ্চলিক ও প্রাদেশীক স্বায়ত্তশাসনকে সঙ্কুচিত করার পরিবর্তে প্রসারিত করতাম। আমরা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কিংবা আর্থনীতিক ক্ষেত্রে কোন বৈয়ম্য সৃষ্টি হতে কখনো দিতাম না।

আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সংখ্যাগুরু, সরকারের কার্যালয় আমাদের এখানে, কাজেই আমরা পাকিস্তানের থ্রু-এ জাতীয় অনুভূতির সৃষ্টি হওয়ার মত কোন কাজই আমরা কখনো করতাম না। তার চেয়ে বরং আমরা প্রতিটি কাজ এমনভাবে করতাম যাতে আপনারা বুঝতে সক্ষম হতেন যে, এই দেশ চিত্তা ও কর্মে উভয় দিক দিয়ে আপনাদের এবং আমাদের। আমরা আপনাদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সমানভাবে ভাগ করে নিতাম।

আমরা বিশ্বাস করি যে, অবিমিশ্র সমতার এই অনুভূতি, আন্তঃপ্রাদেশিক ন্যায়বিচারের এই চেতনা এবং পক্ষপাতশূন্যতা হল পাকিস্তানী দেশাভিবেদের ভিত্তি। একমাত্র তিনিই পাকিস্তানের নেতা হওয়ার যোগ্য, যিনি এহেন দেশাভিবেদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উৎসর্গীকৃত। যে নেতা আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করেন যে, পাকিস্তানের দু'টি শোধা প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দেহের দু'টি চোখ, দু'টি কান, দু'টি নাসারঞ্জ, দুই সারি দাঁত, দু'টি হাত এবং দু'টি পায়; যে নেতা অনুভব করেন যে পাকিস্তানকে সুস্থ ও শক্তিশালী করতে হলে এর উভয় অংশকে সমানভাবে সুস্থ ও শক্তিশালী করতে হবে; যে নেতা আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করেন যে, পাকিস্তানের অঙ্গ দু'টির যে কোন একটিকে দুর্বল করলে সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানকেই দুর্বল করা হয়; যে নেতা অতি আগ্রহের সঙ্গে এই মত পোষণ করেন যে, যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বা ইচ্ছাপূর্বক পাকিস্তানের যে কোন অঙ্গকে দুর্বল করে, সে দেশের শক্তি; এবং যে নেতা এ ধরনের শক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সে নেতাই পাকিস্তানের জাতীয় নেতৃত্বের দাবি করতে পারেন। পাকিস্তান একটি মহান দেশ, যার দিগন্তপ্রসারী সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ রয়েছে। যিনি এর যোগ্য নেতা হতে চান, তাকে অবশ্যই দিগন্তপ্রসারী অসাধারণ দৃষ্টিসহ মহান হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে।

ষষ্ঠত, আমি বিনীতভাবে পঞ্চম পাকিস্তানী ভাই ও বোনদেরকে শ্রদ্ধণ করিয়ে দিতে চাই যে, যখন আমরা বাঙলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার জন্য দাবি করেছিলাম, তখন আপনারা এটাকে পাকিস্তানকে ধ্বংস করার আদোলন বলে দোষারোপ করলেন। পুনর্চ বিশেষ করে ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিত্বের বেলায় আপনাদের সংখ্যা-সাম্যনীতির দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন যুক্তনির্বাচন দাবি করেছিলাম, তখনও আপনারা এই মর্মে আমাদের নিম্না করেছিলেন যে, আমরা সীমান্তের ওপার থেকে অনুপ্রেণা পেয়েছি। এ দু'টি দাবিই এখন স্বীকৃত হয়েছে; কিন্তু সেগুলো স্বীকৃত হওয়ার পর পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যায়নি। এতে কি আপনাদের লজ্জা হয় না যে, অনিচ্ছুক বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে বলপূর্বক কিছু সুবিধা আদায় করে নেওয়ার মত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি ন্যায়সঙ্গত দাবি আপনাদের কাছ থেকে চৰম মূল্য দিয়েও দুঃখজনক সংঘাত করে আদায় করতে হবে? এতে কি

আপনাদের মর্যাদা বাড়ে? দয়া করে এ ধরনের ঘনোভাব চিরদিনের জন্য পরিহার করুন। দয়া করে আপনারা আমদের শাসক না হয়ে নিজেদেরকে আমাদের ভাই হিসেবে মনে করুন। আমি যে ফর্মুলা তুলে ধরেছি তা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখার জন্য আমরা দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন করছি। তাহলে তাঁরা বুবাতে পারবেন যে, আমার ছয় দফা কর্মসূচীর কোন দফাই অন্যায়, অবাস্তব কিংবা দেশের সংহতি বিনাশকারী নয়। আমি আশা করি, আমি সাফল্যের সঙ্গে এই সংক্ষিপ্ত ভাষণে একথা বুবাতে পেরেছি যে, এই দফাগুলো স্বীকৃত হলে পাকিস্তান কিছুতেই দুর্বল হবে না, বরং তা আরো অধিক শক্তিশালী হবে।

কিন্তু কামেরী স্বার্থবাদী ঘহল সুস্পষ্ট কারণেই আমার ছয় দফা স্বীকার করবে না। তারা তাদের নিজস্ব পথে সবকিছুর বিচার করে থাকে। তাদের কাছে কেবল অবিরাম ও চিরস্থায়ীভাবে শোষণের কাজ চালিয়ে যাওয়ার অর্থই হল সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব। এই শোষণের কাজে যিনি ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন কিংবা ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য হঢ়কি দেবেন, তাদের কাছে তিনি দেশদ্বারী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অতীয়মান হবেন। এটা কোন নতুন কিংবা আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। জনাব ফজলুল ইক ও সোহরাওয়ার্দির মত আমাদের পূর্ববর্তী মহান নেতৃবৃন্দ এ ধরনের কামেরী স্বার্থবাদী মহলের শিকার হয়েছিলেন।

শোষিত জনগণের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামে যিনি এগিয়ে আসবেন, তাঁকে এ ধরনের নিন্দাবাদ ও কারাবরণের জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। অতীতে আমার ভাগ্যে এ ধরনের বহু বিচার ও দুর্দশা জুটেছে। আমার মুকুবিদের দেয়া, আমার সহকর্মীদের সাহচর্য এবং আমার দেশবাসীর প্রতিপূর্ণ সমর্থনের জন্য অসীম কর্মসূচীয় আল্লাহ আমাকে এই সমন্ত উৎপীড়ন সহ্য করার মত যথেষ্ট সাহস ও ধৈর্য দিয়েছেন। আমার দেশবাসীর এই সীমাহীন প্রীতি নিয়ে, যা আমার কাছে মূল্যবান সম্পদ, আমি তাঁদের সেবায় যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। আমার দেশের অগণিত লোকের মুক্তির তুলনায় আমার মত একজন লোকের জীবন কিছুই নয়।

আমি জানি লাখ লাখ শোষিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের চেয়ে আর কোন মহত্ত্ব সংগ্রাম থাকতে পারে না। আমার রাজনৈতিক গুরু জনাব সোহরাওয়ার্দির কাছ থেকে আমি তা শিখেছি। আমাদেরকে নির্দেশ দেয়ার জন্য তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আমি তাঁর এই উপদেশকে আজীবন অনুসরণ করতে এবং তাঁর আদর্শের প্রতাকাকে উজ্জীয়মান রাখতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। দেশ এখন তাঁর সবচেয়ে সক্ষতময় কালের মধ্য দিয়ে চলছে। এমন সক্ষতময় মুহূর্তে আওয়ামী জীগ কাউন্সিল এর সভাপতিত্বের গুরুদায়িত্ব অতিরিক্ত বোকার মত আমার কক্ষে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে আমি কর্তব্যপরাঙ্গমুখ নই। আমি কাজকে ডয় করি না।

কাজেই আমি বিনয়ের সঙ্গে এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছি। আমার লোকদের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। আমি একথাও জানি যে, রাতের গাঢ়তম আঁধারের মুহূর্তটি উভার আগমনের ইঙ্গিত দেয় মাত্র। আমার প্রিয় দেশবাসী, আল্লাহর নিকট এই দোয়া করবেন যেন তিনি আমাকে সব সময় মানসিক শক্তি ও দৈহিক যোগ্যতা দান করেন, যাতে আমি তাঁদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংযোগে আমার বাকী জীবন উৎসর্গ করতে পারি, যে অধিকার তাঁদের কাছ থেকে বলপূর্বক ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

## পরিশিষ্ট-৩

পূর্ব পাকিস্তান সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ১১ দফা দাবি :

- ১। ক) প্রাদেশিককৃত কলেজগুলোকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে।
  - খ) স্কুল ও কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
  - গ) প্রাদেশিক কলেজগুলোতে নেশ ক্লাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
  - ঘ) ছাত্র-বেতনের শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করতে হবে।
  - ঙ) শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এবং সমস্ত অফিসের কাজে বাঙ্গলা ভাষাকে চালু করতে হবে।
  - চ) ছাত্রাবাসের ব্যয়ভারের শতকরা ৫০ ভাগ সরকারকে বহন করতে হবে।
  - ছ) শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।
  - জ) অট্টম শ্রেণী পর্যন্ত ঐবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
  - ঝ) একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং মেডিক্যাল কাউন্সিল অর্ডিন্যাস প্রত্যাহার করতে হবে।
  - ঝঃ) পলিটেকনিক ছাত্রদের জন্য সংক্ষিণ কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে।
  - ট) হাসকৃত ভাড়ার রেল ও বাস ভর্মণের সুযোগ দিতে হবে।
  - ঠ) চাকুরির সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা দিতে হবে।
  - ড) বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যাস বাতিল করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্ত্বাসন দিতে হবে।
  - ঢ) জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও হামুদুর রহমান রিপোর্ট বাতিল করতে হবে।
- ২। সার্বজনীন প্রাণবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করতে হবে।
  - ৩। ক) যৌথরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার চালু করতে হবে এবং তাতে ব্যবস্থাপক সভার সার্বভৌমত্ব থাকবে।
    - খ) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবল প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রায় সীমাবদ্ধ থাকবে।
  - ৪। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বাসনসহ বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম

- সীমান্ত প্রদেশ ও সিঙ্কুকে নিয়ে একটি উপ-যৌথরাষ্ট্র গঠন করতে হবে।
- ৫। ব্যাংক, ইন্সুরেন্স কোম্পানী ও বৃহৎ শিল্পগুলো জাতীয়করণ করতে হবে।
  - ৬। কৃষকদের উপর ধার্যকৃত যাবতীয় কর ও নাজস্বের হার কমাতে হবে।
  - ৭। শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য বেতন ও বোনাসের ব্যবস্থা করতে হবে।
  - ৮। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বন্যা-নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত কর্মপদ্ধা গ্রহণ করতে হবে।
  - ৯। যাবতীয় জরুরী আইন, নিরাপত্তা আইন এবং অন্যান্য নিবারক আদেশ তুলে নিতে হবে।
  - ১০। সিয়াটো ও সেটো চুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে এবং পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করতে হবে।
  - ১১। আগরতলা ঘড়্যন্ত মামলার আসামীসহ বিনাবিচারে আটক সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

## পরিশিষ্ট-৪

বাংলাদেশ সরকার সংকলিত বাঙলাদের সংগ্রামের কালানুক্রমিক ঘটনাপাইঞ্জি :

১৯৪৭ জুন, ২০ বাঙলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ ৫৬-২১ ভোটে প্রদেশটিকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আগস্ট, ২৫ বন্যার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে মারাওক খাদ্য পরিস্থিতির উন্নত হয়।

১৯৪৮ মার্চ, ১১ রাষ্ট্রভাষার দাবিতে বিক্ষেপ মিছিল পরিচালনার দায়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেফের করা হয়।

আগস্ট, ১৪ পূর্ব বাঙলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন।

১৯৫০ অক্টোবর, ৬ আজিজুল হক খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটির রিপোর্টের নিন্দা করেন এবং বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রস্তাবিত যৌথরাষ্ট্রের আড়ালে তাঁর একনায়কতৃ প্রতিষ্ঠার ঘড়্যন্ত করছেন।

নভেম্বর, ২৪ মুসলিম লীগ পরিষদীয় দলের ১৩ জন সদস্য একটি যুক্তিবৃত্তি প্রচার করেন এবং তাতে পূর্ব বাঙলার জন্য স্বায়ত্ত্বাসন দাবি করেন।

১৯৫২ ফেব্রুয়ারী, ২১ মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে বাঙলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা না দেয়ায় এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাঙলা বিক্ষেপে ফেটে পড়ে। পুলিশের গুলিতে ১৯ জন ছাত্র এবং আরো অনেকে নিহত হয়।

১৯৫৪ মার্চ, ১৫ প্রাদেশিক আইন পরিষদের অবসান ঘটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২-ক ধারা জারি করা হয়।

মার্চ, ১৯ আওয়ামী লীগের এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দি এবং কৃষক-শ্রমিক দলের এ, কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুজফুন্ট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতাসহ প্রাদেশিক নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে।

মে, ১৭ প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী পূর্ব পাকিস্তানের গোলমালকে ‘বিদেশী ঘড়্যন্ত’ বলে অভিহিত করেন।

মে, ১৯ যুজফুন্ট সরকারকে বরখাস্ত করা হয়। গভর্নরের শাসন জারি করা হয় এবং ইক্সান্ডার মির্জাকে পূর্ব বাঙলার গভর্নর হিসেবে ঢাকায় পাঠানো হয়।

আগস্ট, ৪ পূর্ব পাকিস্তানে অভূতপূর্ব বন্যার প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া যায়। তাতে লাখ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৫৮ জুন, ২৪ পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্টের শাসন বলবৎ করা হয়।

সেপ্টেম্বর, ২০ আদেশিক পরিষদের স্পীকারকে মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ বলে ঘোষণা করা হয়। ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

অক্টোবর, ৭ পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

অক্টোবর, ১২ মুজিবুর রহমান, মওলানা তাসানী এবং খান আবদুল গফফার খানকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫৯ মে, ৮ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী মনসুর আলীকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬০ সেপ্টেম্বর, ১২ ঢাকায় মুজিবুর রহমানকে ফৌজদারী অসদারচনের দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় এবং দু'বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

অক্টোবর, ১০ পূর্ব বাংলার উপকূলবর্তী এলাকায় চরিশ ঘন্টা ব্যাপী ঘূর্ণিবাড়ের আঘাতের ফলে তিন হাজারেরও অধিক লোক নিহত হয়।

অক্টোবর, ৩১, আরেকটি ঘূর্ণিবাড়ের ফলে বিশ হাজারেরও অধিক লোক নিহত হয়।

১৯৬১ মে, ৯ পূর্ব পাকিস্তান পুনরায় ঘূর্ণিবাড়ের কবলে পড়ে যার ফলে দু'হাজারেও অধিক লোকের আগ বিনষ্ট হয়।

সেপ্টেম্বর, ২১ ঢাকায় আইয়ুব বিরোধী শ্বেগানরত বিক্ষোভকারী ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। শত শত ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়।

সেপ্টেম্বর, ২৪ সোহরাওয়ার্দি গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি করেন।

১৯৬২ এপ্রিল, পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন চলে। বহু নিরস্ত্র লোক নিহত হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার চারজন বাঙালী সদস্য পদত্যাগ করেন।

জুন, ৯ সামরিক আইন তৈলে নেয়া হয়। 'মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নতুন শাসনতন্ত্র দেয়া হয়।' পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা এর বিরোধিতা করে।

১৯৬৬ ফেব্রুয়ারি, মুজিবুর রহমান আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বাসনের জন্য তাঁর ছয় দফা কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন।

১৯৬৬ মার্চ, ২০ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দলীয় কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়।

মার্চ, ২৭ মুজাফফরগড়ে চার জন বিরোধী মুসলিম লীগ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

জুন, ৭ পূর্ব বাংলার সর্বত্র আইয়ুব-বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়। পুলিশের

গুলিতে হাজার হাজার নিরস্ত্র লোক নিহত হয়। স্বায়ত্ত্বাসনের দাবির সমর্থনে ৭ই জুনের আতুত সাধারণ ধর্মঘট ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও তেজগাঁ দাঙ্গাহাঙ্গামায় পরিষ্ঠত হয়।

জুন, ১৭ আওয়ামী লীগ, জাতীয় আওয়ামী দল, কৃষকশ্রমিক দল এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশালের খ্যাতনামা নাগরিকগণ পূর্ব বাংলায় একটি 'ছায়া সরকার' গঠনের জন্য একটি ছয় দফা কর্মসূচী অনয়ন করেন।

১৯৬৭ ফেব্রুয়ারি, ২ পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বাসন লাভের উদ্দেশ্যে একটি যুজ্বলন্ত গঠন করেন।

এপ্রিল, ২৭ 'অনিষ্টকর বঙ্গুত্তা' দানের জন্য মুজিবুর রহমানকে ১৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

ডিসেম্বর, ৩ আইয়ুবের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সংঘায় করার জন্য 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' (পি,ডি,এম) গঠন করা হয়।

ডিসেম্বর, ১৭ আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কে শাহাবুদ্দিনের রিপোর্ট জাতীয় পরিষদে পেশ করা হয়।

১৯৬৮ জানুয়ারি, ৫ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার বৈষম্যকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

জানুয়ারি, ৬ পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টার অপরাধে সেনাবাহিনীর কয়েকজন জুনিয়র অফিসারসহ ২৮ জন লোককে গ্রেফতার করা হয়।

জানুয়ারি, ১৮ শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে আগরতলা যড়যত্র মামলায় জড়ানো হয়। ভারতের সাহায্যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টার অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়।

জুলাই, ১৮ পূর্ব পাকিস্তানের ১৭টি জেলা ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পতিত হয়। হাজার হাজার লোক নিহত হয়।

ডিসেম্বর, ৭ ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর এবং পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য শহরে আইয়ুব-বিরোধী বিক্ষোভ দেখা দেয়। পুলিশের গুলিতে বহু লোক নিহত হয় এবং ৫০০ লোককে গ্রেফতার করা হয়।

ডিসেম্বর, ১৪ চট্টগ্রামে পুলিশের গুলিবর্ষণে বহু লোক নিহত হয়। আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন খুবই জোরাদার হয়ে উঠে এবং তাঁর পতনকে আসন্ন করে তোলে।

১৯৬৯ মার্চ, ২৫ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারি করেন এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলো ভেঙে দেন।

মার্চ, ২৬ ইয়াহিয়া খান ওয়াদা করেন যে, তিনি দেশে 'সুস্থ পরিবেশ' এনে দেয়ার পর জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

মার্চ, ২৮ শেখ মুজিব একটি ঘোষণাপত্রীয় সংগঠনের জন্য তাঁর পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।

মার্চ, ২৯ জাতীয় আওয়ামী দলের নেতা মওলানা ভাসানীকে কাগমারীস্থ তাঁর প্রামের বাড়িতে অভ্যর্তীণ করা হয়।

মার্চ, ৩০ মওলানা ভাসানী একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবি জানান।

এপ্রিল, ১০ ইয়াহিয়া খান প্রাণবন্ধক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করেন।

নভেম্বর ২৮ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পষিদের নির্বাচনের তারিখ ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর ধর্য করেন।

১৯৭০ জানুয়ারি, ১ রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মতৎপরতার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।

এপ্রিল, ১ ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভেঙে দেয়ার আদেশ দেন।

সেপ্টেম্বর, ২ পূর্ব পাকিস্তানের ঘূর্ণিঝড়ের জন্য ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়।

ডিসেম্বর, ৭ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যথাক্রমে আওয়ামী লীগ এবং জেড, এ ভূট্টোর পিপল্স পার্টি প্রধান দল হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

ডিসেম্বর, ৯ শেখ মুজিব দাবি করেন, যে, নতুন শাসনতন্ত্র তার ছয় দফার ভিত্তিতে প্রশীত হবে, যাতে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত্বাসন অর্জিত হয়।

ডিসেম্বর, ১০ মওলানা ভাসানী স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব পাকিস্তানের দাবি উত্থাপন করেন।

ডিসেম্বর, ১২ পূর্ব পাকিস্তানের আরো তিনটি দল এই স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করে।

১৯৭১ জানুয়ারি, ১৪ ইয়াহিয়া খান মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করেন।

জানুয়ারি, ২৯ ঢাকায় মুজিবুর রহমান ও জেড, এ ভূট্টোর মধ্যে যে শাসনতাত্ত্বিক আলোচনা চলে, স্বায়ত্ত্বাসনের প্রশ্নে তা পড় হয়ে যায়।

ফেব্রুয়ারি, ১৩ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনের তারিখ তৃতীয় মার্চ ধর্য করেন।

ফেব্রুয়ারি, ১৫ ভূট্টো এই মর্মে হ্যাকি দেন যে, মুজিবুর রহমান যদি শাসনতন্ত্র থণ্ডয়নে তাঁর মতামত গ্রহণ না করেন, তাহলে তিনি পরিষদের অধিবেশন বর্জন করবেন।

ফেন্স্যারি, ১৬ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ পরিষদে দলের নেতা নির্বাচিত হন।

ফেন্স্যারি, ১৮ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, বাংলা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য ইসলামকে বাবহার করা হবে না।

ফেন্স্যারি, ২১ ইয়াহিয়া খান তাঁর মন্ত্রিসভা ভোগে দেন।

ফেন্স্যারি, ২৮ ভূট্টো জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন মূলতবি রাখার দাবি জানান।

মার্চ, ১ ইয়াহিয়া খান পরিষদের অধিবেশন মূলতবি ঘোষণা করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস-অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এস, এম, আহসানকে বরখাস্ত করেন। পরিষদের অধিবেশন মূলতবি ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য মুজিবুর রহমান ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট আহবান করেন।

মার্চ, ২ ঢাকায় এবং অন্যান্য স্থানে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মত প্রচন্ড গণবিক্ষেপ দেখা দেয়। সেনাবাহিনীর লোকেরা তাদের কাজে নেমে পড়ে এবং সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

মার্চ, ৩ আওয়ামী লীগ অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে ইয়াহিয়া খানের বৈঠকের প্রস্তাব মুজিবুর রহমান প্রত্যাখ্যান করেন।

মার্চ, ৫ আওয়ামী লীগের শেছাসেবক ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর কর্ম্যবস্থা গ্রহণের ফলে ৩০০ লোক নিহত হয়।

মার্চ, ৬ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে।

মার্চ, ৭ মুজিবুর রহমান জনগণকে কর পরিশোধ করতে নিষেধ করেন এবং তাঁর কাছ থেকে আদেশ নেয়ার জন্য সরকারি কর্মচারীদেরকে নির্দেশ দেন। তিনি পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করেন। ইন্ট বেঙ্গল রাইফেল্স বাহিনীর লোকেরা বাঞ্ছালী বিক্ষেপকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করতে অঙ্গীকার করে।

মার্চ, ৮ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়।

মার্চ, ৯ পূর্ব পাকিস্তানের বিচারপতিগণ লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানকে গভর্নর হিসেবে শপথ করাতে অঙ্গীকার করেন।

মার্চ, ১৪ কেন্দ্রীয় সরকার ১৫ই মার্চের মধ্যে সরকারী কর্মচারীদেরকে কাজে যোগদানের জন্য চৰম আদেশ জারি করে।

মার্চ, ১৫ মুজিবুর রহমান একপক্ষীয় স্বায়ত্ত্বাসন ঘোষনার কথা এবং পূর্ব বাঞ্ছালীর লোকদের প্রতি ৩৫টি নির্দেশ প্রচার করেন। ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আগমন করেন।

মার্চ, ১৯ ইয়াহিয়া ও মুজিবের মধ্যে শাসনতাত্ত্বিক আলাপ-আলোচনা শুরু হয়।

মার্চ, ২১ ভৃট্টো ঢাকা আগমন করেন, পঞ্চম পাকিস্তানের দলগুলোর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সলাপরামর্শ করেন। শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে একটি অনিধারিত বৈঠকে মিলিত হন।

মার্চ, ২২ ইয়াহিয়া খান পুনরায় জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন মূলতবি ঘোষণা করেন।

মার্চ, ২৫ আওয়ামী লীগ ইঙ্গিত দেয় যে, সেনাবাহিনীর হাতে আরো লোকের নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে বলে শাসনতাত্ত্বিক আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পঞ্চম পাকিস্তান থেকে আরো সেনাদলের আগমন ঘটে। ইয়াহিয়া, ভৃট্টো এবং অন্যান্য নেতা রাওয়ালপিণ্ডির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। গণহত্যা শুরু হয়।



অ্যাসুনী মাসকারেণহাস (১৯২৮-'৮৬) জনাসুত্রে ভারতীয় গোয়ানীজ খন্স্টান, বসবাস সুত্রে পাকিস্তানী। করাচীতে সাংবাদিকতা পেশায় ১৯৪৭ সনে 'রঘটার'-এ যোগ দেন। পাকিস্তান সংবাদ সংস্থা, এপিপি এবং নিউইয়র্ক টাইমস, টাইম/লাইফ সাঙ্গাহিকীর ১৯৪৯-'৫৪ পর্যন্ত সংবাদদাতা ছিলেন। করাচীসহ "দি মর্নিং নিউজ" এর চীফ রিপোর্টার, পরে সহ-সম্পাদক পদে ১৯৬১ সন থেকে ১৯৭১ সনের মে মাস পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। একান্তরের এপ্রিল মাসে ঢাকা সফরকালে গণহত্যার তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং বিলোতে পালিয়ে গিয়ে 'সানডে টাইমস' (১৩ই জুন '৭১) পত্রিকায় গণহত্যার তথ্যাদি প্রকাশ করে বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তা'ছাড়া উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী অন্তরঙ্গ আলোকে প্রত্যক্ষ করে সাংবাদিকের স্বভাবসূলভ ভঙ্গিতে তা বর্ণনা করেন। 'দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ' এবং 'বাংলাদেশ রক্তের ঝণ' গ্রন্থ দু'টি সেই আলোকেই বিচার্য। ১৯৮৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর অ্যাসুনী মাসকারেণহাস হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জনবাসন শাম নিষ্পাস ত্যাগ করেন।